আবদুল রশিদ মতিন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ইসলামী প্রেক্ষিত

আবদুল রশিদ মতিন

অনুবাদ

এ কে এম সালেহউদ্দিন

সম্পাদনা

এম আবদুল আযিয

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রকাশকের কথা

সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ। তাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান জাগতিক মতাদর্শ নিয়ে জাগতিক প্রয়োজনে রচিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচিত সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নৈতিক মূল্যবোধের কোন প্রতিফলন না থাকায় মানবজাতির পারলৌকিক কল্যাণ দূরের কথা, ইহজগতের সার্বিক কল্যাণেও ব্যর্থ হচ্ছে প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সার্বিক কল্যাণে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্র' আসলেই কীরূপ হওয়া উচিত সেই ব্যাপারে নতুন নির্দেশনা আমাদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন নন্দিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবদুল রশিদ মতিন।

তিনি সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের গতিধারাকে উপলব্ধি করার জন্যে এ গ্রন্থে ইসলামী সভ্যতার তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি উপনিবেশবাদীতার স্বরূপও যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি 'ইসলাম ও রাজনীতি'র অবিচ্ছেদ্ধ সম্পর্কটিকেও যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি তিনি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রায়গিকতাকে সফলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই বইটি যে কোন সচেতন নাগরিক, রাজনীতিবিদ সহ সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য একটি উপযোগী গ্রন্থ। এছাড়া বইটি দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, গবেষকদের জন্য রেফারেন্স হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য।

বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এম জহুরুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা

সূচি

মুখবন্ধ

ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগ চলছিল, তখন ইসলামী সভ্যতা চরম শিখরে পৌঁছেছিল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে পশ্চিম আফ্রিকা হতে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত মুসলিম জাহান দখল করে নেয়ার পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপরীত ধারা সূচিত হয়। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়। স্বাধীনতা লাভের পর এসব মুসলিম দেশের শাসনভার পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক চক্রের হাতে পড়ে হয়।

মুসলমানগণ দীর্ঘদিন যাবত এই দুঃসহ অবস্থাটি ভাঙ্গার চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে থাকে যাতে তারা সামষ্টিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ইসলামের অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করতে পারে। কেউ পাশ্চাত্যের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে, কেউ শরীয়াহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের এবং কেউ কেউ ইসলাম, জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয়ে রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের প্রস্তাব করে। এর প্রতিটি ধারণার উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এগুলো ছিল একপেশে ও একদেশদর্শী; এসব লেখকগণ 'প্রাচ্যবিদ' নামে অভিহিত। আপোষকামী কিছু পণ্ডিত মুসলিম সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে ভিত্তিহীন অভিযোগ সমূহের জবাব প্রদান করেন এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও উম্মাহর আশা-আকাংখার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। অনেক ধর্মতাত্ত্বিক উলেমাবৃন্দ তাদের জড়বুদ্ধি ও গোঁড়ামীর কারণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে যুগ সমস্যার সমাধান করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে একমত অন্যকথায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত ও অভিনিবেশী ছাত্ররা বিষয়টির সুচারু বিচার বিশ্লেষণে দীর্ঘদিন ধরে দৃষ্টিদানে বিরত থাকেন।

বিশ্বব্যাপী বর্তমানে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিশেষ মহল কর্তৃক ইসলামের নানা অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে; এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে স্বচ্ছ, সঠিক ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনের এক বিরল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে যে বিকৃত ধারণা দেয়ার অপচেষ্টা চলছে তার প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তবতার প্রয়োজনে এবং বিশ্বে বিভিন্ন বৈরী শক্তি ও স্বাভাবিক শক্তিসমূহের মধ্যে বর্তমানে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সঠিক বিচার বিশ্লেষণের সময় এসেছে। কাজটি করতে হবে ইসলামীদের নিজেদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা এবং ইসলামের মর্মবাণী,

নীতিমালা, জীবন, সংস্কৃতি ও এর সুবিন্যস্ত কাঠামোর সঠিকভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে। Political Science : An Islamic Perspective গ্রন্থটি সে উদ্দেশ্যে প্রণীত।

ইসলামী চিন্তাবিদের ধারণা-দর্শনের উপর আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা না করে এ গ্রন্থে ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্কসূত্র, ইসলামের প্রয়োগ পদ্ধতির উপকরণ সমূহ, ইসলামী আইনের ধরন ও প্রকার, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা, এবং বর্তমান বিশ্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন সমূহের কৌশল ও পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি অনুযায়ী এ গ্রন্থের গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচন করা হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াবলীর মৌলিক বিষয়ের উপর ধারণা-দর্শন সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য বিচার বিশ্লেষণে দু'টি মুখ্য উৎসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে :

প্রথমটি আল্লাহর বাণী সম্বলিত ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন; দ্বিতীয়টি নবী করীম (সা)-এর বাণী, কার্যাবলী, আচরণ ও সাহাবীদের কার্যে সমর্থন বা মৌনতা অবলম্বনের ঘটনা সমষ্টি- যা সুন্নাহ নামে অভিহিত।

দ্বিতীয়ত শুরু হতে ঐতিহাসিক ধারাক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আল কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কতটুকু বিচ্যুতি ঘটেছে তাও এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অন্তর্বৈশিষ্ট্য তথা তাদের মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক মূল্যমান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমানগণ যেহেতু নবী করিম (সা)-এর লৌকিক উত্তরসূরী চারজন খলিফাকে সঠিক পথে পরিচালিত বলে মনে করা হয় তাই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয় আলোচনার সময় খোলাফায়ে রাশেদার যুগকে আদর্শ যুগ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত আব্বাসীয় আমল থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইসলামী রাজনৈতিক ও আইনশাস্ত্রীয় যে সব লিখা, আলাপ আলোচনা আবর্তিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক ধারাক্রম ও ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিসর ব্যাপক, তাই অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রকে ক্লাসিক্যাল ও সমকালীন যুগের প্রখ্যাত সুন্নী তাত্ত্বিকদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। যে সব চিন্তাবিদের বক্তব্য আলোচিত হয়েছে তা কিছুটা বর্তমান গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পছন্দ, কিছুটা অন্যান্য ইসলামী পণ্ডিতবর্গের লিখার উপর নির্ভর করেছে।

সর্বশেষে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার সময় পাশ্চাত্যের সমধর্মী ধারণাসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে, ইসলামী ধারণার সাথে তাদের তুলনা করা হয়েছে এবং পরিশেষে ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবে কি বোঝাতে চায় ও বাস্তবায়ন করতে চায় তার চিত্র অংকন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন প্রকার ও মুসলিম সমাজে তার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারণা দর্শন প্রধান উপকরণ হিসাবে সমগ্র আলোচনায় স্থান পেয়েছে এবং মুসলিম সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ী প্রভাব গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে স্বার্থবাদী দেশী মহলের যোগসাজস কিভাবে রচিত হয়েছিল; কেন ও কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং এই ধর্মনিরপেক্ষ আধিপত্যবাদ কিভাবে মুসলিম সমাজের ক্ষতিসাধন করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃত স্বরূপ উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করতে হলে ঐ ঐক্যসূত্রটি বুঝতে হবে যে, ইসলাম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা জীবনের সকল বিষয়কে পরিব্যাপ্ত করে আছে কেবলমাত্র ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদান করা যায়। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামী রাজনীতি যে অবিভাজ্য তা ইসলামের কতিপয় আনুষ্ঠানিক আচার পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে; যথা সিয়াম, সালাত, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি।

অতঃপর এ অধ্যায়ে নবী করিম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদার সময় যে সব মহান, পবিত্র ও কল্যাণকর বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুনের সাথে একমত যে, উমাইয়া খিলাফতের সময় ব্যাপক নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছিল যাতে ইসলামের সু-শাসনের অমোঘ ও পবিত্র নীতিমালা হতে শাসন ব্যবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। যোগসূত্রের নেতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও শাসকবর্গ কখনো ইসলামের সাথে রাজনীতির অমিলের কথা জনসম্মুখে ঘোষণা করার সাহস পায়নি, যারা চেষ্টা করেছে তারা তাদের ধ্বংসই ডেকে এনেছিল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ পাশ্চাত্য রাজনীতির সাথে ইসলামী রাজনীতির বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সূত্রাবলির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের নিজস্ব ধরন ও আদলে পাশ্চাত্য রাজনীতির আদর্শগত মানচিত্র প্রণীত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে ঐশী প্রত্যাদেশ ও যুক্তিবোধকে দ্বৈত উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। এভাবে এ অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি কুরআনের কতিপয় মৌল ধারণার সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত- যথা তাওহীদ, রিসালাত, খিলাফত ইবাদত, আদল ইত্যাদি। এ অনুসিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যাদেশের জ্ঞানের সীমারেখার মধ্যে ইসলাম বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, যুক্তিতর্ক ইত্যাদির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার

করা হয়। ইসলামী মূল্যবোধের সার্বজনীনতা দ্বারা ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান রচনা করা সম্ভব ইসলামে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের আইনগত রূপ শরীয়াহ, যা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী, বিষয়ের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ আলোচনায় শরীয়াহকে পশ্চিমা মূল্যবোধ বিবর্জিত আইন হতে ভিন্ন আদর্শিক আদলে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী আইন বা ফিকাহ এবং শরীয়াহও যে পশ্চিমা মূল্যবোধের সম অর্থ বহন করে না তা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। শরীয়াহ যে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম আইন তাও আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়ার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, এর বিকাশ ও সমাজের উপর এবং প্রভাব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, স্বাধীন চিন্তা চর্চার স্বাধীনতা না থাকলে ইজতিহাদ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকে পুনর্গঠন ও পরিবর্তন করা যায় না। ইজতিহাদ বা গবেষণাকে সঠিক মর্যাদা দানের জন্য সমাজের নৈতিক ও বস্তুগত সংস্কার সাধন করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'উম্মাহ ঃ ইসলামী সমাজব্যবস্থা' চতুর্থ অধ্যায়ের বর্ধিতাংশ। সামাজিক অনুমোদন ছাড়া আইন কল্পনা করা যায়, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। পাশ্চাত্যে সমাজ বলতে কি বোঝায় এবং ইসলামের সাথে এ সমাজ ব্যবস্থার কোন মিল রয়েছে কিনা? কুরআনে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মুসলিম চিন্তাবিদ ও আইন শাস্ত্রবিদগণ এটাকে কিভাবে দেখেছেন এবং মহানবীর (সা.) -এর সময় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে বিকাশ লাভ করেছিল? বিশ্বব্যবস্থায় উম্মাহর রাজনৈতিক ভূমিকা কি এবং ইসলামী সমাজের অন্তর্গঠনশৈলী কিরূপ এর উপর-এ অধ্যায়ের আলোক সম্পাত করা হয়েছে। সর্বশেষে উম্মাহর ধারণার সাথে জাতীয়তাবাদের ধারণার তুলনা করা হয়েছে এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে ও মুসলিম বিশ্বে এ রাষ্ট্র ধারণা প্রয়োগের অবকাশ অথবা সামঞ্জস্যশীলতা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারণা দর্শনের বিষয়টি এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ধরনের ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার একত্ব বা বহুত্ব রয়েছে কিনা, আইনের প্রকৃতি কিরূপ, ক্ষমতার উৎস কি এ অধ্যায়ে এসব প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি গণতান্ত্রিক হতে পারে, হলে কিরূপ? পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধারণার সাথে ইসলামী গণতন্ত্রের ধারণার কি মিল রয়েছে?

এ অধ্যায়ে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল আলোচনা করা হয়েছে; আল্লাহর একত্ব, ন্যায়বিচার, সমতা ও স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক আলোচনা বা শূরা প্রভৃতির আলোকে একে চিহ্নিত করে এর গঠন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা হিসাবে ইসলামে শাসকের জবাবদিহিতার প্রশ্নটি পর্যালোচনা করেছে। এটি জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতার সীমারেখা অংকন করে দিয়েছে। সরকার গঠনের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, শাসকের আইনের অনুবর্তী হওয়া, জনসাধারণের শাসকের অবৈধ আদেশ প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত সব লেখকের বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শাসকের আদেশের বৈধতার নীতিমালা, শাসকের শরিয়াহর নীতির প্রতি আনুগত্য ও সংহতি, বড় ধরনের অবহেলা ও অসদাচরণের ক্ষেত্রে শাসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতিমালা আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণ ও চলমান ইসলামী আন্দোলন সমূহের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহ কি বিরাজমান বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, নাকি এটি স্বতঃ উৎসারিত বিষয়? দেখা যায় সমস্ত আন্দোলন সমূহের মধ্যে মৌলিক কতগুলি বিষয়ের মিল রয়েছে, তবুও বিশেষ কোন আন্দোলনের স্বাতন্ত্রিক সমৃদ্ধি তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী, ভারতে জন্ম নেয়া তাবলীগ জামাত আন্দোলন, ইরানের ইসলামী বিপ্লব কৌশল ও পদ্ধতি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। এসব আন্দোলন সমূহ বহুত্বের মাঝে একত্বকে নির্দেশ করে এবং ঐশী একত্বের পতাকাকে সমুন্নত করে তুলে ধরে।

এ গ্রন্থটি ব্যাপক অর্থে কোন বিস্তারিত পাঠ্যপুস্তক নয়। ইহা ইসলামী রাজনৈতিক সমীক্ষা ও ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী অভিজ্ঞ বিজ্ঞজন, ছাত্র, শিক্ষক ও সর্বশ্রেণীর সুধীমহলের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সাধারণভাবে কতিপয় মৌল বিষয়ে উপর গ্রন্থটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচিত বিষয়সমূহ যুগপৎ ঐতিহাসিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে ইসলামী রাজনীতির সাংঘর্ষিক সম্পর্ক, বর্তমান মুসলিম বিশ্বব্যবস্থা এবং চলমান ইসলামী আন্দোলন সমূহের মূল চেতনা ও পদ্ধতি অনুধাবনে সহায়কে হবে বলে আশা করি।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া

আবদুল রশিদ মতিন

উপক্রমণিকা

ইসলাম, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং মুসলিম বিশ্ব

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এ মতাদর্শকে মুসলিম দেশসমূহে শাসন-পদ্ধতির মানদণ্ড রূপে পরিবর্তন করার প্রয়াস চলছে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শকে জোড়ালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কৃতি তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিদ্বেষ প্রসূত আক্রমণ ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিমণ্ডলে অবক্ষয়ী ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে।

পাশ্চাত্য আচার আচরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্ধ অনুকরণ সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব নতুন সহস্রাব্দের স্বনির্ভর প্রবৃদ্ধির দোরগোড়ায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। আর মুসলিম জাতি পরিণত হয়েছে নিজের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্মৃতপরায়ণ এক জনগোষ্ঠিতে। স্বকীয় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চেতনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রকৃতি, ইসলামের সাথে এর বৈপরীত্য, যে সব সামাজিক শক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শ বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে তার বিশ্লেষণ, মুসলিম জীবন পদ্ধতি ও চিন্তাধারার উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শের আক্রমণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির পরিসর ও প্রকৃতির বিষয়ে মূল্যায়ন বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ প্রতিবেশের কারণে উৎপত্তি উৎস, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ধর্মরিপেক্ষতাবাদী মতাদর্শ নানা সৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ কারণে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মার্কসবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, তৃতীয় বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মডেল হিসাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করা সমীচীন হবে।

পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধারণাটি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র থেকে চার্চের পৃথকীকরণ বোঝায়। ক্যাথলিক দেশে পুরোহিততন্ত্র বর্জিত মতবাদ (Laicism) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে যাজকশ্রেণী হতে সর্বসাধারণের পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[১] আসলে উভয় শব্দই একই জিনিসের দু'টি দিক এগুলো চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ প্রসংগে ব্যবহৃত হয়েছে।

একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ১৮৪৬ সালে জ্যাকব হলিওক ইংল্যান্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণার প্রবর্তন করেন।[২] বহুলভাবে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ ইহজগতমুখীনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদার নৈতিকতাবাদ।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানবজাতির পরম লক্ষ্য শুধুমাত্র জাগতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিৎ। ধর্ম বা পরকালীন জীবনের সাথে জাগতিক জীবনকে জড়িয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই। পশ্চিমা বিজ্ঞান কার্য ও কারণ সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে এবং সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিউটনের পদার্থবিদ্যা কার্যকারণ সম্পর্ককে সার্বজনীনতার রূপ প্রদান করেছে। এভাবে ঐশী প্রত্যাদেশ, ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ধারণা এবং কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৩]

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 'উদার নৈতিকতাবাদের' ভিত্তি রচিত হয়েছে মাবতাবাদের ধারণার উপর। মানবতাবাদ ব্যক্তি মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের অনুসন্ধান ও তা লাভ করা মানুষের জন্মগত অধিকারের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

উদারনীতিবিদদের দাবির মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় আপোষহীনতার উপাদান লক্ষ্য করা যায়। তাহলো নিজের বিবেক অনুসারে যে কোন ধারণা ও বিশ্বাস অনুসরণের অধিকার। তারা মনে করে এ হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের সহজাত ও চূড়ান্ত অধিকার। জন স্টুয়ার্ট মিলের ভাষায়, এ পৃথিবীর মহৎ চিন্তাবিদগণ মুক্তি ও স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তি মানুষের বিবেকের স্বাধীনতাকে তার অবিভাজ্য অধিকার বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য স্বীয় বিবেক ছাড়া অন্য কোন সত্তার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।[৪]

জেফারসনের ভাষায়, ব্যক্তি মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উদারনৈতিক মতবাদ 'রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে পৃথকীকরণের একটি দেয়াল' সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ দাঁড়ায়, এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে একটি ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্মকে অধিক গুরুত্ব প্রদর্শন করা হয় না, সেখানে একটি ধর্মের বিপরীতে অন্য ধর্মের অনুকূলে কোনরূপ শিক্ষা বা সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হয় না, এমন একটি রাষ্ট্র যা ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচর্চাকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করে না।'[৫]

উল্লেখ্য, নির্বাচন, প্রচারমাধ্যম, সরকারের তিন অংগ তথা আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মডেলকে রাজনৈতিকভাবে কার্যকর করা হয়।[৬]

বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট পদে জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে উপযুক্ত লোক নির্বাচনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে। পত্র পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমের কাজ হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও প্রতিফলনের মাধ্যমে

'গণ-বিবেক' হিসাবে কাজ করা। সরকারের তিনটি অংগ, শাসন, বিচার ও আইন বিভাগের কাজ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সকল অংশের মতামত প্রতিফলন নিশ্চিত করা।

এরূপ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন। এর বৈশিষ্ট্য হলো স্বনির্ভর প্রবৃদ্ধির ক্ষমতা অর্জন করা। এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম, নৈতিকতা বা নন্দন তত্ত্বের প্রতি এক ধরনের অনাগ্রহ বা নিরাসক্তি প্রদর্শন করা হয়।[৭]

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিচালিকা শক্তি হিসাবে উদারনৈতিকতা, মানবতাবাদ ইত্যাদি হিসাবে অভিহিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধর্মনিরপেক্ষ সংজ্ঞায় বর্ণনা করা হলেও এ সব প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞার মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম, দর্শন ও মূল্যবোধের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ডব্লিউ সি স্মীথ স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন ঃ গণতন্ত্রের ধারণার উৎসস্থল দু'টি ঃ গ্রীক এবং ইহুদী-খ্রিস্টান দর্শন ও ঐতিহ্য। পশ্চিমা গণতন্ত্র অত্যন্ত প্রবলভাবে খ্রিস্টান ধ্যান-ধারণা পুষ্ট।[৮]

এসব তথ্য হতে বলা যায়, ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের তত্ত্ব সত্ত্বেও খ্রিস্টান ধ্যানধারণার প্রতি রাষ্ট্র ছিল অনুকূল। অন্যকথায় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতে খ্রিস্টান ধ্যান ধারণা জড়িত। তাই পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্টানধর্মের প্রতি কোনরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করা সম্ভব ছিল না।

হলিওকের ভাষায়, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল পরস্পর নিরপেক্ষ। অনেক উদারনীতিবাদী নিজদের খ্রিস্টান চিন্তাধারা হতে প্রভাবমুক্ত করতে অপারগ হয়েছেন। বস্তুত তারা তাদের রচনায় ধর্মযাজক সেইন্ট অগাস্টিনের কল্পিত স্বর্গরাজ্যের ধ্বংস সাধন করে পুরান ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন মালমসলা দিয়ে পূর্বতন চিন্তাচেতনাকেই পুনর্নির্মাণ করেন।[৯] অষ্টাদশ শতকের এ ঐতিহ্য বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসছে।

মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ভালো সমর্থন লাভ করে। আধুনিকতা অর্জনের জন্য কতিপয় মুসলিম শাসকবর্গ এ ধর্মনিরপেক্ষ মডেল প্রয়োগ করেন। কেউ কেউ এজন্য উদারপন্থা আবার কেউ স্বৈরতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করেন। ১৯২০ এর দশকে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে আমূল পাশ্চাত্যকরণনীতি তান্ত্রিকতার উদাহরণ। তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পাশ্চাত্য পোশাক ও রোমান বর্ণমালা বাধ্যতামূলক করা হয়। মাজার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ সব নীতির কোনরূপ বিরোধিতাকে নিপীড়ন বা মৃত্যুদণ্ড দ্বারা দমন করা হয়। তিউনিশিয়ার হাবিব বরগুইবা ব্যাপারে অধিকতর নমনীয় পন্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামের নাম অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মহিলাদের পর্দাপ্রথা (হিজাব) নিষিদ্ধ করেন। ১৯৬১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার নামে তিউনিশীয় জনগণকে রমজান মাসে রোজা পালন না করার আহ্বান জানান। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ

উষর ভূমিতে পতিত হয়। অর্থাৎ কোন কিছু ভালো ফলোৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। বিগত দু'দশকে দেশ দু'টিতে সক্রিয় ও সংগঠিত ইসলামী আন্দোলনের উত্থান তার প্রমাণ।

মার্কসবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের কারণে পশ্চিমা বিশ্বে বস্তুগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। পশ্চিমের অগ্রগতির এসব ফলাফলের তাৎপর্য কার্লমার্ক্সের চেয়ে কেউ এতবেশী অনুধাবন করতে পারেনি।

কার্লমার্ক্সের ভাষায়

বর্জুয়া সভ্যতা মানুষে মানুষে নগ্ন স্বার্থপরতা আর অর্থকড়ির লেনদেন ছাড়া কোন বন্ধন অবশিষ্ট রাখেনি। এ বর্বর সভ্যতা সৎ ও শুভ উদ্দেশ্যের পরম আনন্দ ও পবিত্রতা, শুভবুদ্ধি ও পৌরুষদীপ্ত উদ্দীপনা, নিষ্কলুষ অনুভূতিরাশিকে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হিসাব-নিকাশের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্য বর্জুয়া সভ্যতা চরিত্রের শুদ্ধাচারিতার মানবিক বৈশিষ্ট্যের উপর স্থান দিয়েছে অর্থকে. ।

পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে যে স্নেহ-মমতা ও সৌহার্দ্য বিরাজ করে, তা ছিঁড়ে ফেলে তথায় শুধু অর্থের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। [১০]

পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর্যুক্ত বীভৎসতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে কার্লমার্ক্স আর্থ-সামাজিক মতবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, ইতিহাসের গতিধারায় সমাজ বিবর্তনের মধ্যদিয়ে একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হবে। কার্লমার্ক্স তার মতবাদের বিজয়ের অনিবার্যতার বিষয়ে একধরনের ধর্মীয় অনুভূতির মত বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি তার মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত তত্ত্ব বা মতবাদটি মার্ক্সবাদ নামে অভিহিত। 'উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত বিভিন্ন প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে মার্ক্সবাদই সবচেয়ে শক্তিশালী মতবাদ।'[১১]

মার্ক্সবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলতঃ পাশ্চাত্য ইতিহাস, সমাজ সংগঠন ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি হতে সৃষ্টি হয়েছে। এ মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পশ্চিমা জগত হতে এসেছেন। এ মতবাদের সমগ্র দর্শন পাশ্চাত্যের বর্জুয়া উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছে।

মার্ক্সবাদী মতাদর্শ মৌলিকভাবে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে পাশ্চাত্যেরই বিদ্রোহ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে মার্ক্সবাদী ধর্মনিরপেক্ষবাদের মৌলনীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমুখীনতা ও মানবতাবাদ ইত্যাদি) অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মডেলের সাথে অভিন্ন।

মার্ক্সবাদের সাথে অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মডেলগুলির তেমন কোন গুণগতপার্থক্য নেই। শুধুমাত্র উভয়ের সাধারণ উপাদানগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে একটির উপর

অন্যটিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আরো একটি পার্থক্য হলো মার্ক্সবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী অন্যান্য মডেলের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে বর্জুয়া সভ্যতার কুফল হতে মুক্তিলাভের সুনির্দিষ্ট পন্থার দিকে দিক নির্দেশ করেছে। কার্লমার্ক্স বর্জুয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি, সংগঠন ও উৎপাদন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে উল্লেখ করেছেন যে, বর্জুয়াতন্ত্র মানবিক মূল্যবোধকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। অপরদিকে খ্রিস্টীয় মতবাদের সমালোচনা করে কার্লমার্ক্স বলেছেন যে, খ্রিস্টধর্ম আত্মনিগ্রহ, কাপুরুষতা, নতজানুনীতি, ক্ষয়িষ্ণুতা, আত্ম অবমাননা, জীবনবিরোধী বৈরাগ্যবাদ তথা মানবেতর সমাজের সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলো প্রচার করে থাকে।[১২]

মার্ক্সবাদের বক্তব্য গভীরতা ও তীব্রতার দিক থেকে ধর্মীয় চরিত্রের ন্যায় অনমনীয়। অন্যান্য পশ্চিমা মতবাদসমূহ ধর্মকে পরোক্ষভাবে মোকাবেলা করেছে। অপরদিকে মার্ক্সবাদ ধর্মকে সরাসরি আক্রমণ করেছে। কার্লমার্ক্স তার ডক্টরেল থিসিসের ভূমিকায় বলেছেন, 'এক কথায় আমি সব ধরনের ঈশ্বরকে ঘৃণা করি।' মার্ক্সের মতে ধর্ম হচ্ছে অবাস্তব। ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে কার্য ও কারণ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিয়ম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা হতে। বহিঃজগতে ও অন্তর্জগতে মানুষের দাসত্ব ও বিচ্ছিন্নতার জন্য ধর্ম দায়ী। ধর্ম মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতাকে রুদ্ধ করে মনুষ্যত্বের মৌলিক গুণ হতে মানুষকে বঞ্চিত করে। ধর্ম তাই অবাস্তব এবং অনাকাংখিত।

কার্ল মার্ক্সের অভিমত অনুযায়ী

ধর্ম হচ্ছে মানুষের কাল্পনিক সুখের অন্বেষা। তাই প্রকৃত সুখ লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে এসব তথাকথিত ধর্মের অবসান। বাস্তব জগত সম্পর্কে সকল প্রকার কল্পনা বিলাসের অবসান করতে হলে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সব অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে যা এরূপ ধর্মান্ধ কল্পনাবিলাসের জন্ম দেয়।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ঘটনাচক্রের প্রতি সচেতন প্রতিবাদ হতে কার্লমার্ক্সের নিরীশ্বরবাদের জন্ম। ঘটনাপুঞ্জসমূহ হচ্ছে পৈত্রিক ইহুদীধর্মের কারণে কার্লমার্ক্সের শৈশবকালে তাঁর প্রতি সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের অভিঘাত, প্রেমিকার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় যাজকশ্রেণীর কুপমন্ডুক বিরুদ্ধাচরণ, তাঁর পিতাকে লুথার প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণে বাধ্যকরণ।[১৪]

মার্ক্সবাদ সর্বপ্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয় এবং অতঃপর পরিবর্তিত রূপে বাস্তবায়িত হয় গণচীনে। নিরীশ্বরবাদী মার্ক্সবাদ প্রবর্তনের জন্য এসব দেশে প্রচলিত ধর্মসমূহকে সমাজ ও প্রগতি বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে সরকারীভাবে দমননীতি পরিচালনা করা হয়। এভাবে সব মার্ক্সবাদী বামপন্থী সমাজে বাম মতাদর্শের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিরাজ করে।[১৫] এর অর্থ এসব বামপন্থী মার্ক্সবাদী শাসনকর্তৃত্ব সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে মার্ক্সবাদী নিরীশ্বরবাদী মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহত জোরদার প্রচারণা চালিয়ে যায়। এ তুমুল প্রপাগান্ডার জোয়ারে

এমনকি মুসলিম বিশ্বের কেউ কেউ এ তথাকথিত নব্য হিব্রু নবী কার্লমার্ক্সের কথাকে ঐশীগ্রন্থের মত ভক্তি করতে থাকে। কালমার্ক্সের ধ্যানধারণাকে তারা অবিচল শ্রদ্ধা সহকারে ঐশী প্রত্যাদেশের মত নির্ভুল হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাঁকে এমন এক ঈশ্বর রূপে তারা পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করছে যে, ঈশ্বর অন্যান্য সকল ধরনের ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।

তৃতীয় বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

অন্যান্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর মত পাশ্চাত্য জগত থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শকে তৃতীয় বিশ্বে আমদানী করা হয়েছে। একে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত মুসলিম দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, নিরীশ্বরবাদী মার্ক্সবাদের ত প্রশ্নই উঠে না, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে দেয়াল রচনার প্রচেষ্টাও এসব প্রাচ্যদেশের গভীর ধর্মানুরাগী জনগণের কাছে প্রত্যাখাত হবে। তাই এসব দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শকে রূপ ও রং বদলাতে হয়েছে। কৌশল হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথিত ইতিবাচক গুণাবলীর প্রশস্তি গাওয়া শুরু করেন। ভারতের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি মনীষী গজেন্দ্র গদকারের ভাষায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বস্তুতপক্ষে মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্যরূপে স্বীকার করে।... ভারতীয় সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভারত প্রতিপালিত সকল ধর্মমতই সমান স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও প্রতিরক্ষার অধিকারী।[১৬]

ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধরে নিলে এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্ম জনজীবনের কোন অঙ্গন হতে অনুপস্থিত থাকবে না। সরল অর্থে রাষ্ট্র সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করবে। সকল ধর্ম সমান রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমাজ জীবনে অংশগ্রহণের সমান অধিকার লাভ করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারত বা অন্যকোন দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সুন্দরভাবে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ লালন বা চর্চা করে না। এ ধরনের 'ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের' ধারণাটি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত, ঘোষিত ও লালিত হয়েছে। অপরদিকে দেখা যায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণাটিকে শুধু স্বীকৃতিই প্রদান করেননি বরং রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম হিসাবে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভূমিকায় স্থান দিয়েছেন। তিনি রেডিও-টেলিভিশনের কর্মসূচির প্রারম্ভে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হতে পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের অন্তর্নিহিত ইসলামী চেতনা, ঐতিহ্য ও চরিত্রের প্রেক্ষিতে এ ঘোষণা মুসলিম জন-মানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করে। ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে বাতিল করে দেশের সংবিধানে ইসলামী রূপরেখা প্রদান করেন।

মুসলিম দেশসমূহ যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে উদাহরণ হিসাবে তারা হচ্ছে গিনি, গাম্বিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, সেনেগাল ও তুরস্ক। যদিও এসব দেশগুলির অধিকাংশই সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেনি তবুও এসব দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সুস্পষ্ট। নাইজেরিয়ার ১৯৭৯ সালের সংবিধানের দশম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাষ্ট্র কোন ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে গ্রহণ করবে না।' যদিও শব্দচয়নের দিক থেকে উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদটি সুস্পষ্ট নয় তবুও দেশটিতে যেভাবে ধর্মীয় বিষয়াবলীকে দেখা হয় তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, এসব দেশের সংবিধান প্রণেতা ও প্রয়োগকারীরা ভারতীয় সংবিধানের ধারণা ও ভাষ্যকেই গ্রহণ করেছে।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তাই এমন এক মতবাদ যার উৎসস্থল এমন কিছু হিসাবে বিবেচনা করা যায় যা ঐশ্বরিক নয় বরং এ মতাদর্শ সম্পূর্ণভাবে মানব রচিত। এর দার্শনিক ভিত্তি মানুষ ও স্রষ্টার পৃথকীকরণের মধ্যে নিহিত। পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক। এর ভিত্তি হচ্ছে স্রষ্টার ইচ্ছা ও আদর্শের অভিব্যক্তি আল কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ। এর প্রেক্ষিত হচ্ছে সর্বব্যাপী এককেন্দ্রিক এক বিশ্বাসের বৃত্ত যা জীবনের সর্বক্ষেত্রকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। একই সাথে সৃষ্টি জগতের সকল প্রকাশ ও বিকাশ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের একতা বা তৌহিদের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত। আল্লাহর একক সত্তা বা সার্বভৌম অস্তিত্বের বাস্তবতা ব্যতীত আর কোন সত্ত্বা নেই। আল্লাহর প্রবল পরাক্রমশালী শক্তির বাইরে কিছুই নেই। এসবই হচ্ছে ইসলামের মর্মকথা।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যতা প্রদর্শনের জন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি কষ্টকর প্রয়াস চালিয়েছেন। যুক্তি হিসাবে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সার্বজনীন কল্যাণ ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে উন্নত চিন্তাসমৃদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।[১৭] যেহেতু ইসলাম এ ধরনের উদ্বুদ্ধকরণে বিশ্বাসী, তাই ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে অভিহিত করা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইসলাম সত্যে উপনীত হবার লক্ষ্যে যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইসলাম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে ইজতিহাদ বা গবেষণার অধিকার দিয়েছে। জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে। বিশ্বাসীদের সৎকাজ করার এবং অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ঈমানদার ব্যক্তিবর্গকে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছে। প্রজ্ঞা ও যুক্তিপূর্ণ উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে

বিশ্বমানব সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা পরিচালনা করা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। এ সার্বিক পর্যালোচনা ও দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ইসলামে ধর্মান্ধতার কোন ছোঁয়া নেই। এর অর্থ এ নয় যে ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন মিল রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদিও সকল আদর্শবাদ ও মরমী মতবাদকে অস্বীকার করে, তবুও এর ধর্মনিরপেক্ষ আবরণের মধ্যে ধর্মের সাথে সমার্থক কতিপয় প্রাচীন আদর্শবাদী ধারণাকে অনুপ্রবেশ ঘটানোর বা সন্নিবিষ্ট করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[১৮]

অবশ্য এর ফলে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে কোন রূপ মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি (১.১ নং ছক দ্রষ্টব্য)। *ইসলাম মানবজীবনকে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক জীবন হিসাবে পৃথক করে না। ইসলাম ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের সকল অঙ্গনে অনুশাসন করে। ঈমানদারদের জীবনের স্বরূপ এবং মৌলিক কেন্দ্রবিন্দুকে ইসলাম বিদ করে দেয় এবং একই সাথে সমাজের প্রতি তার আনুগত্যের মানদণ্ডকেও নির্ধারণ করে দেয়। তৌহিদ বা একত্ববাদ হচ্ছে ইসলামের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ তৌহিদ স্রষ্টার একত্ব এবং তাঁর একক সার্বভৌমত্বকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। ইসলামী বিশ্বাসের সামগ্রিকতা ও বিশ্বজনীনতা এ ঐশী বিধানের অন্তর্নিহিত সারবস্তু। আল্লামা ইকবালের ভাষায়, "ইসলামের চূড়ান্ত বাস্তবতার স্বরূপ হচ্ছে আধ্যাত্মিক। পক্ষান্তরে অন্তর্মুখী ইসলামী জীবন তার ডালপালা ছড়িয়ে রাখে জাগতিক কর্মকাণ্ডে। ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ ঘটে প্রকৃতি, বস্তুনিচয় এবং বৈষয়িক বিষয়সহ সবকিছুতে। ফলে বৈষয়িক বিষয়সমূহ তার সত্তার মূলের দিক থেকে পূত পবিত্র।[১৯]

তাই সর্বশেষে ওয়াটার হাউজ এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভ্রান্তি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ক্ষেত্রে নয় বরং এর জ্ঞানগত বিষয়ে নিহিত।[২০]

ছক. ১.১ ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	ইসলাম
উৎসমূল ঃ সম্পূর্ণভাবে মানব রচিত এবং ইহজতমুখী;	ইহজগতমুখী উৎসমূল ঃ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ,
যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে;	ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্বারোপ করে;
বল্গাহীন প্রবৃত্তির ইচ্ছাভিত্তিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী;	শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে ঐশ্বরিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী;
ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে রাখে।	রাজনীতি ও ধর্মকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করে

অপরদিকে ইসলাম ধর্মের মতে একটি কাজ বিষয়ের দিক থেকে আপাত দৃষ্টিতে যতই বৈষয়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ মনে হোক না কেন, কাজটির প্রকৃত স্বরূপ কর্তা ব্যক্তির নিয়ত বা মনের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্ণিত হয়। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির কাজ বস্তুগত স্বার্থপরতাপূর্ণ পূতপবিত্রতাহীন হিসাবে অভিহিত ও চিহ্নিত হবে যদি উক্ত ব্যক্তি জীবন প্রবাহের পশ্চাতে যে অসীম ঐশ্বরিক বৈচিত্রতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা সচেতন না থাকে। আবার সে কাজই গভীর আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্জীবিত হবে যদি ঐ ব্যক্তি বিপুল ঐশ্বরিক চেতনা প্রবাহের বৈচিত্রের অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে।[২১]

খ্রিস্টীয় মতবাদ মনে করে যে, চার্চ (ধর্ম) ও রাষ্ট্র একই বাস্তব বিষয়ের এপিঠ ও ওপিঠ। এ চিন্তাধারাকে সঠিক বলে অভিহিত করা যায় না। কেননা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ক্ষেত্রে দেখা যাবে হয় এ পিঠ সঠিক অথবা অন্যপিঠ। এর কারণ নিম্নের যুক্তি পরম্পরায় নিহিত রয়েছে ঃ

স্থান-কালের প্রেক্ষিতে বস্তুই মননে পরিণত হয়। যে সত্তা মানুষ নামে অভিহিত তাকে দেহসত্তা বলি যখন সে বহির্জগতের সাথে ক্রিয়াশীল থাকে। আবার সেই ব্যক্তি সত্তাকেই আমরা আত্মা নামে অভিহিত করি যখন ঐ ব্যক্তি ঐশ্বরিক পরমসত্তার 'জাত' ও 'সিফাতের' বিভূতির মাঝে ফানা বা বিলীন হয়ে যায়।[২২]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের গঠনপ্রণালী প্রক্রিয়া

ইউরোপীয় মহাদেশে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধারা প্রবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উন্মেষ ও গঠনপ্রণালী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রেঁনেসা, চিন্তাজগতের পুনর্গঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব-এ সবই ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাচেতনার জন্ম দিয়েছে।[২৩] এ বিবর্তন ধারায় খ্রিস্টান ধর্মের চিন্তা চেতনার অবদানও কম নয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বীজ লুকায়িত ছিল খ্রিস্টীয় জগতের এই চিন্তাধারার মাঝে যে, 'সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও আর খোদার প্রাপ্য খোদাকে দাও।'

এ চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করলে অর্থ দাঁড়ায় যে, মানব সমাজ পৃথক দু'টি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব দ্বারা পৃথকভাবে অনুশাসিত হবে এটা ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে। খ্রিস্টীয় চিন্তাধারায় কোন সত্তাই একই সাথে জাগতিক সাম্রাজ্য ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খ্রিস্টীয় জগতের এ বিশ্বাস যে, মানব ইতিহাস ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম হবে। এ উভয় খ্রিস্টীয় চিন্তাধারা যুক্তভাবে বিশ্বের জাগতিক ঘটনা প্রবাহসমূহ সংগঠন ইন্দন যুগিয়েছে। খ্রিস্টীয় ধর্মের আধুনিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে নব্য ব্যাখ্যা ও আপোষকামী সমন্বয় ও ঐক্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউরোপে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী চার্চ

ও রাষ্ট্র বিতর্কের পরিসমাপ্তি টানা হয়। ইমানুয়েল কান্ট, সেইন্ট সিমন, আগস্ট কঁমের লেখনী হতে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ খ্রিস্টধর্ম বা এর কোন ভার্সন বা প্রকরণকে আধুনিক প্রগতি চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত বা রূপান্তর করেছে। এভাবে খ্রিস্টানধর্ম আধুনিক ইউরোপীয় মানসগঠনে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে কাজ করেছে।

অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার উদ্ভব ও উত্থানের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মের অবদান এবং ইউরোপীয় অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান শুধুমাত্র এ উত্থানের কারণ নির্ণয়ে আংশিক উত্তর মাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী উত্থানের মুখ্য কারণ খুঁজতে হবে ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। পূর্বসূরী ইহুদী ধর্মের মত খ্রিস্টধর্মও নিজকে অন্যান্য ধর্ম হতে শ্রেষ্ঠতর ধরনের এ ধারণা হতে উদ্ভূত ঘৃণা ও ভয়ের পরিবেশে জন্ম লাভ করেছিল। ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রিস্টধর্মের বিদ্বেষ ছিল চূড়ান্ত। ইসলাম কেবল মানব ধর্মের বিশ্বজনীতাকেই চ্যালেঞ্জ করেনি, বরং কুরআনের ১১২ সূরা নাসের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় ত্রিত্বমতবাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর পরই শুরু হলো ইতিহাসের নজীরবিহীন ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং ব্যাপকভাবে খ্রিস্টানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খ্রিস্টীয় চরিত্রের একক সংহতি বিনষ্ট হলো এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হলো।[২৪] প্রতিক্রিয়া হিসাবে খ্রিস্টীয় সমাজের সমস্ত প্রতিভা ইসলাম ধর্ম, তার নবী ও পবিত্র গ্রন্থের বিকৃতি ও কুৎসা রটনায় সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।[২৫]

পরবর্তীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অন্যান্য জ্ঞানে সজ্জিত হয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সেনাবাহিনী ও বাণিজ্য কোম্পানীসমূহ মুসলিম বিশ্বকে পরাজিত করে উপনিবেশবাদ, আধা উপনিবেশে পরিণত করল। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ইতিহাসের একই ধারাবাহিকতার ফসল। 'যীশুর জন্য পৃথিবীকে জয় কর'- পাশ্চাত্য সভ্যতার এ মিশন আধুনিকতার পতাকাবাহী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ক্যাথলিক ইনস্টিটিউটের ব্যারন কারা দ্য ভক্স ১৯০১ সালে ঔপনিবেশবাদীদের অভিযানের উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদের মিশন মুসলিম বিশ্বকে ভেঙ্গে বিভক্ত করে দেয়া, এর নৈতিক সংহতিকে বিনষ্ট করা, এ সবের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও জাতিসত্তাগত বিভেদকে চূড়ান্ত করা... তাই আমাদের মুসলিম বিশ্বের এই বিভেদ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে হবে যাতে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসার লাভ করে এবং বিভিন্ন মুসলিম জাতিসত্ত্বার মধ্যে অভিন্ন ইসলামী উম্মাহর চেতনা বিনষ্ট হতে থাকে। আমাদেরকে রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, বৃটিশ শাসিত মিশরকে ফরাসী শাসিত সুদান বা মুক্ত আরব উপদ্বীপ হতে সুস্পষ্টরূপে ভিন্ন সত্ত্বা হিসাবে রূপ দান করতে হবে। মিশরকে আমাদের আফ্রিকান ইসলাম ও এশীয় ইসলামের মধ্যে বাধার দেয়াল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এক কথায়

ইসলাম ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও মুসলমানদের ভিতরকার ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠী এবং সুফীবাদপন্থী উভয় সম্প্রদায়কে ব্যবহার করতে হবে।[২৬]

রাশিয়ার চিন্তাবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ইউজিন ডি রবার্ট বলেন যে, 'ইউরোপকে মুসলিম বিশ্বের অভিজাত ও চিন্তাশীল সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে... ইসলামী বিশ্বে রেলওয়ের ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলামী বিশেষ ভূখন্ড ও শিল্পকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ঔপনিবেশিক শিকলে আবদ্ধ করতে হবে... প্রধান মুসলিম বিশ্বশক্তি অটোমান সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে।' [২৭]

ঔপনিবেশবাদ এবং অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও উত্থান

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো মুসলমানদের নিজস্ব ভাবমূর্তি এবং আপন সাংস্কৃতিক পরিচয়। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রগতি এবং 'নবজাগরণ' নামধারী ঔপনিবেশিক নীতির মাধ্যমে, যাকে 'খ্রিস্টান' ও আধুনিক শিক্ষা' এ শব্দদ্বয়ের সমার্থক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হলো। বৃটিশ শিক্ষাবিদ লর্ড ম্যাকলে অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, উন্নতমানের একটি ইউরোপীয় লাইব্রেরীর এক শেলফ পুস্তক আরব উপদ্বীপ ও ভারত উপমহাদেশের সমগ্র দেশীয় সাহিত্য ও দর্শন হতে উন্নততর। এই উক্তি বৃটিশ শিক্ষানীতির চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করল যা প্রাচ্য শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইংরেজী শিক্ষা চালু করল।[২৮] আফ্রিকা বিশেষ করে নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে লর্ড লুগার্ড অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন। সেখানে একইরূপ শিক্ষানীতি চালু হলো। দেশীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংক্রমণ ঘটানোর মাধ্যম হিসাবে শিক্ষানীতিকে ব্যবহার করা হলো। এ শিক্ষানীতির লক্ষ্য স্থির করা হলো বৃটিশ রাজ্যের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে দেশীয় সমাজের মধ্য হতে একদল কেরানী, অনুগত সহযোগী ও দালাল শ্রেণী সৃষ্টি করা যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির শিকড়কে আরো বিস্তৃত করা যায়। লর্ড ম্যাকলে বৃটিশ রাজ্যেকে শিক্ষানীতির লক্ষ্যকে এভাবে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন যে, 'এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি কর যারা বৃটিশ শাসকশ্রেণী ও লক্ষকোটি দেশীয় শাসিত শ্রেণীর মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে, যে শ্রেণীটি রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, চিন্তাচেতনা, নৈতিকতা, ধ্যানধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে হবে ইংরেজ মানসিকতা সম্পন্ন।[২৯]

দেশীয় ধর্মীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রথা বা প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত সকল আইন-কানুন, আচার আনুষ্ঠানিকতার দেশজ ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা হলো। ঔপনিবেশিক সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োজনের মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার আগ্রাসন নীতি অনুসরণ করা হলো ও চাপিয়ে দেয়া হলো।[৩০]

ঔপনিবেশিক এই নীতি খ্রিস্টীয় যাজক শ্রেণী, উদারমতাবলম্বী এবং উপযোগবাদীদের নিকট হতে সার্বিক সমর্থন লাভ করল। ভারতে এ ধরনের শীর্ষস্থানীয় পাদ্রী ব্যক্তিত্ব

ছিলেন চার্লস গ্রান্ট, নাইজেরিয়ায় রেভারেন্ড ওয়াল্টার মিলার। ওয়াল্টার মিলার এবং লর্ড লুগার্ড যৌথ উদ্যোগে 'জারিয়া প্রকল্প' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রকল্প চালু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর নাইজেরিয়ার জারিয়া অঞ্চলের গোত্র প্রধানদের পুত্র সন্তান ও 'মাল্লাম' নামধারী শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখিত শিক্ষাক্রম চালু করা।[৩১] ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক সহায়তায় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত ও ক্রমান্বয়ে ইসলামী শরীয়া ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলো। কোথাও যদি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুমোদন দেয়া হতো, তা হতো সরকারী অর্থানুকুল্য ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে। যেখানে সরকারী অর্থ অনুদান প্রদান করা হতো, সেখানে আনুষ্ঠানিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের নামে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাক্রম চাপিয়ে দেয়া হতো।

সভ্যতার ধারক-বাহক রূপে পরিচিত খ্রিস্টবাদ, বাণিজ্য ও উপনিবেশবাদ এই ত্রয়ী[৩২] শক্তির সাফল্য প্রতিভাত হলো মুসলিম সমাজের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে। উপনিবেশিক শক্তি শাসিত মুসলিম সমাজ নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে লজ্জা ও হীনমন্যতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত ও পরাভূত হয়ে বিজাতীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবোধকে বরণ করে নিলো। মুসলিম সমাজ উপনিবেশবাদীদের অনুকরণে তাদের জীবনধারার অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হলো। পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদীদের সমাজ মডেলের অনুসরণে নিজেদের সমাজ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় মেতে উঠল। এ পরিস্থিতিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু : বিজিত ভারতীয়দের জীবনের চরম উচ্চাশা হিসাবে স্থির হলো বিজয়ী ইংরেজদের চোখে সম্মানিত হিসাবে পরিগণিত হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজদের কাতারে একটু স্থান করে নিতে পারা। সমরাস্ত্র বা কুটনীতির চেয়েও ভারতে বৃটিশদের এটাই সবচেয়ে বড় বিজয়।[৩৩] সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত বক্তব্যটি আফ্রিকা ও মুসলিম বিশ্বের জন্য সমভাবে সত্য। মুসলিম সমাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক বিদঘুটে মিশ্রণে পরিণত হলো- ফলে বহিঃবিশ্বের কোথায়ও সে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না এবং স্বদেশে হলো পরবাসী।

একজন মুসলমান যতবেশী পশ্চিমা আদলে নিজকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলো, সে প্রকৃতপক্ষে ততবেশী বর্বরে পরিণত হলো। তার জীবন পরিণত হলো তার অতীত হতে বিচ্ছিন্ন শিকড়ে, পাশ্চাত্যের আচার আচরণের বিকৃত জগাখিচুড়ীতে। তার পরিণতি হলো না ইসলামী, না পশ্চিমা- যাকে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক বর্বরতার জলজ্যান্ত নজীর হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[৩৪]

প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীই সার্বিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল- বাকী বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব শুধুমাত্র সামান্য প্রলেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যুগ যুগান্তরের পিরামিড সদৃশ কৃষক সমাজের বিশাল ভিত্তিতে পাশ্চাত্য প্রভাবের কোন ছোঁয়া লাগে নি। প্রথম থেকেই

মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গকে উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হতো এবং তাদের ঔপনিবেশিক আইন ও নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হতো। পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা একদল নব্য অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলা হল। ইংরেজী শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক নেতৃত্ব শ্রেণীকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়া হলো। আইন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ উলেমা শ্রেণীকে পাশ্চাত্য আইন শাস্ত্রে শিক্ষিত দেশীয় শ্রেণীবর্গ দ্বারা উৎখাত করা হলো। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও লালিত স্থানীয় নেতৃত্ব শ্রেণীকে সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো। এরাই কালক্রমে উপনিবেশবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী উত্তরসূরীর ভূমিকা পালন করে। এই শ্রেণীই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুসলিম সমাজের পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যবর্তী অস্ত্রে পরিণত হলো। উল্লেখিত শ্রেণীর সমাজে উদারনৈতিক চিন্তার বীজ বপন ও সমধর্মী প্রতিষ্ঠান সমূহের গোড়াপত্তন করে। এসব চিন্তাচেতনা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোকে তারা সংবিধানের মাঝে অঙ্গীভূত করে। আরো যেসব বিষয়ে তারা সামাজিক বুনিয়াদ তৈরী করল তা হলো ঃ

ক. জাতীয়তাবাদী নীতিমালা ব্যক্তি মানুষকে সার্বিক ও শর্তহীনভাবে সমাজ কাঠামোর মূলে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানায় ;

খ. জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার প্রবর্তন এবং এর ভৌতকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন ;

গ. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসৃত নীতি পরিণামে দেশীয় অর্থনীতিকে পাশ্চাত্য অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করে এবং নির্ভরশীল করে তোলে ;

জাতীয়তাবাদ

ভূখণ্ড, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান মিলে গঠিত জাতীয়তাবাদের ধারণা ইসলামী দুনিয়ায় পরিচিত পরিভাষা হিসাবে স্থান পায়নি। এক মানবজাতি হিসাবে মানুষে মানুষে যে প্রকৃতিগত গভীর বন্ধন রয়েছে তাকে জাতীয়তাবাদ ছিন্ন করে দেয়। জাতীয়তাবাদ মানবজাতিকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে। একই ধর্ম বিশ্বাস উম্মতকে খণ্ড খণ্ড করে উপস্থাপন করে। কৃত্রিম সীমান্ত রেখা গড়ে তোলে। এতদসত্ত্বেও ঔপনিবেশবাদের পথ ধরে জাতীয়তাবাদ মুসলিম বিশ্বে ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব বিস্তার করে এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিতরাই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয়। কেননা এ তত্ত্ব তাদের কিছু উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক ছিল। "একটি সমাজের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষ ধরনের অভিজাত শ্রেণীগোষ্ঠীর জন্য এই লক্ষ্য পূরণ ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।"[৩৫] মুসলিম বিশ্বকে খণ্ড বিখণ্ড করা ও ইসলামের ধর্মীয় একত্বকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার জন্য জাতীয়তাবাদ ছিল ঔপনিবেশবাদীদের হাতের শক্তিশালী অস্ত্র। পশ্চিমা ধ্যান ধারণাপুষ্ট স্থানীয় নেতৃত্ব

দ্বিধাবিভক্ত প্রভাবশালী শ্রেণীসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি ও গণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য জাতীয়তাবাদী ধারণাকে ব্যবহার করে। জাতীয়তাবাদ এভাবে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমান্ত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, অন্য রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজস্ব স্বার্থ বলয় গড়ে উঠল। এ ধরনের রাষ্ট্রসমূহ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক বা যোগাযোগ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সঙ্গতির কোন তোয়াক্কা না করেই বেঙের ছাতার মত বেড়ে উঠল। ফলে একই সমাজভুক্ত একই জাতিসত্তার মুসলিম জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিভক্ত হয়ে পড়ল। এভাবে আফ্রিকার হাউসা ও ফুলানী মুসলমানরা নাইজার, নাইজেরিয়া, শাদ রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হলো। এর পরিণতি দাঁড়াল মানুষ তার জাতিগোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। জাতিসমূহ ঘন ঘন সংঘর্ষ ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি নিঃশেষিত হতে লাগল। এসব মুসলিম রাষ্ট্রের অস্থিতিশীলতা, দুর্বলতা ও সার্বক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা এ সাক্ষ্যই বহন করে যে, এসব দেশ দেশজ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তি ছাড়াই কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী এ সব জাতীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত রেখা জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কোন যৌক্তিকতা বহন করে কিনা এ প্রসঙ্গে কখনো কোন আত্মসমীক্ষা বা প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। অভ্যন্তরীণ শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী বহিঃশক্তির সমর্থনের মধ্য দিয়ে এসব জাতীয় রাষ্ট্রের কোনটিই তাদের জনগণের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। বরং বৃহৎশক্তিবর্গের আধিপত্যবাদের এ যুগে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তৃতীয় শ্রেণীর করদরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

এসব রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর প্রধান কর্মকাণ্ড ও লক্ষ্য থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা নির্বাচন পদ্ধতি, প্রচার মাধ্যম ও সরকারের তিনটি অঙ্গের পুনরাবৃত্তিক পরিচালনা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিচালনার মধ্য দিয়ে স্বীয় স্বার্থ হাছিল করা। এটা সবাইর জানা যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল স্তম্ভের মত এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোকে ইউরোপ হতে এনে উপনিবেশসমূহে স্থাপন করা হয়েছে। এসব জবরদখলকৃত উপনিবেশগুলিতে স্থাপিত পাশ্চাত্যের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহে চাপিয়ে দেয়া, ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলের প্রতিস্থাপন হাস্যকর অনুকরণের জলন্ত নমুনা মাত্র। উপনিবেশসমূহে কখনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। ভোট প্রদানের অধিকার ছিল সীমিত, নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায়শই নির্দিষ্ট দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য কারচুপি করা হতো।

সমগ্র আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল একটি সুপরিকল্পিত প্রতারণা... বিচার ব্যবস্থা ছিল এমন যা সমস্ত স্বাধীনতাকে গলাটিপে হত্যা করত।... প্রশাসনিক বস্তুনিষ্ঠতা ছিল

উপনিবেশবাদীদের নিজ দেশে জনগণের অধিকারের গ্যারান্টি। এ গ্যারান্টি উপনিবেশসমূহে পরিণত হয়েছিল জনগণের পায়ের শিকলে। যে গণমাধ্যম উপনিবেশবাদীদের নিজ দেশে জনমত প্রকাশের বাহন তা তাদের অধিকৃত উপনিবেশ সমূহে বিজিত বুদ্ধিজীবী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।[৩৬]

ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেচ্ছ ব্যবহারে দীক্ষা লাভ করে নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গ উপলব্ধি করল যে, এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই তাদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার রক্ষাকবচ নিহিত রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাথে শাসকবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বিধায় এসব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টা তাদের পক্ষ হতে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতো। ফলে এসব ঔপনিবেশিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ নব্য স্বাধীন দেশসমূহে ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার হিসাবে আবারো জাঁকিয়ে বসল।

মুসলিম দেশসমূহে নির্বাচন একটি দুষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক পক্ষ বিরোধীদলকে দমিয়ে রাখে, জনগণের উপর দমননীতি পরিচালনা করে ও নিজেদের প্রার্থীদের ভোট প্রদানে বাধ্য করে, রাজনৈতিক সভায় গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়, ভোট কারচুপি ও বাক্স ছিনতাইয়ের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থীদের জিতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে ভোটের রায় পাল্টে দেয়ার জন্য সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। আলজেরিয়ার সাম্প্রতিক নির্বাচন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। পশ্চিমা গণতন্ত্রে কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে যে প্রক্রিয়া ও মনোভাব রয়েছে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম দেশসমূহের বর্তমান শাসকবর্গের নিকট হতে প্রত্যাশা করা যায় না। ফলশ্রুতিতে নির্বাহী বিভাগের উপর আইনসভার যে নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা তা লক্ষ্য করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য পার্লামেন্টের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অথবা সামরিক শাসকদের মনমত লোকদের নিয়ে পার্লামেন্ট গঠন করা হয়। সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠিত হয়, সে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এতই সীমিত যে তাকে শুধুমাত্র শাসকবর্গের সিদ্ধান্তসমূহকে অনুমোদনের রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এসব দেশে নাগরিক অধিকার বিপুলভাবে খর্ব করা হয়েছে। সংবাদপত্র সেন্সরশীপের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত সমালোচনা করার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। সংবাদ পত্রের উপর খড়গহস্তের নীতিতে অবাধ সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায়। শ্বেতশুভ্র উইগ পরিহিত বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দকে শাসকবর্গের যে কোন নীতি ও সিদ্ধান্তকে আইনসঙ্গত হিসাবে রূপ দেয়ার জন্য উদ্বিগ্ন দেখা যায়। সরকার এ শ্রেণীর বিচারকদেরকে স্বীয় স্বার্থে পৃষ্ঠপোষকতা করে। শাসকবৃন্দ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এতবেশী শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে যে জনগণের কল্যাণের জন্য স্বল্প সময়ই অবশিষ্ট থাকে। জনগণ বহুস্তর বিশিষ্ট এবং স্বীয় স্বার্থকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রের মোকাবেলায় অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করে। এ শাসন

পদ্ধতি সর্বব্যাপ্ত ক্ষমতার মদমত্ততায় বিনা চ্যালেঞ্জে অগ্রসর হতে থাকে। জনগণের জন্য রাজনীতির এই পাশাখেলা সামান্যই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনীতিতে শাসক শ্রেণী পশ্চিমা মডেলকেই অধিক পসন্দ করে। এ অর্থনীতির মোদ্দা কথা হচ্ছে শিল্পোন্নয়ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জন কিন্তু মানুষের বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে এ অর্থনীতির অবদান সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি।

৫২টি মুসলিম দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের পরিসংখ্যান মুসলিম বিশ্বের দুর্দশার চিত্রই তুলে ধরেছে। বৃহৎ আরববিশ্বের ১৪ মিলিয়ন কিলোমিটার ভূখণ্ড ও আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহের ৫.৮ মিলিয়ন কিলোমিটার ভূখণ্ড নিয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বমোট ভূখণ্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ মিলিয়ন কিলোমিটার ভূমি। অথচ বর্ণিত এ মুসলিম দেশগুলোর সামষ্টিক জিএনপি এবং জিডিপি এর হার হচ্ছে যথাক্রমে ৭৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৭৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাদের বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ মাত্র ১০০০ মার্কিন ডলার যা অনুন্নত দেশের পর্যায় ভুক্ত। আরব, এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহের ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার শ্রমশক্তির পরিমাণ যথাক্রমে ১৭%, ৫৩% এবং ৩৩%। এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষিতে কাজ করে। কোন মুসলিম দেশই প্রকৃত অর্থে শিল্পোন্নত দেশ নয়। আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহে শিল্পক্ষেত্রে গড়ে ১০% এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে গড়ে ২০% লোক শিল্পক্ষেত্রে কাজ করে। অর্থনীতির আন্তর্জাতিক স্তরবিন্যাসে অধিকাংশ মুসলিম দেশকে মাথাপিছু স্বল্প আয়ের দরিদ্র দেশ হিসাবে অভিহিত করা যায়। এসব দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কম প্রবৃদ্ধির হার, উচ্চ নিরক্ষরতার হার, স্বল্প গড় আয়ুর অবস্থা বিরাজ করে এবং দেশগুলি নগরায়নের দিক থেকে মাঝামাঝি মাত্রার (পরিশিষ্ট-সি দ্রষ্টব্য)।

সাধারণভাবে বলা যায় স্বাধীনতা লাভের তিন দশক পরেও মুসলিম দেশসমূহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। অপরদিকে দারিদ্র্য বেড়েছে, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে, কৃষিখাত ধ্বংসের মুখে এবং ক্রমবর্ধমান হারে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়েছে এবং জৈবিক অনাচার বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যে উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তা বস্তুত নগরকেন্দ্রিক অপরাধ।

পতিতাবৃত্তি, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অন্যান্য অবক্ষয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায় মুসলিম জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র দারিদ্র্য দ্বারাই পীড়িত হয়নি বরং তারা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শিকড় হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উৎসাহব্যঞ্জক শুধু এটুকু

যে, তারা তাদের দুর্দশা সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে এবং তথাকথিত এ আধুনিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করছে।

উপসংহার

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এখন ক্রমেই সচেতন আক্রমণের মুখে। মুসলিম দেশসমূহ ক্রমেই ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে মোহমুক্ত হয়ে উঠছে। তারা উপলব্ধি করছে যে এ ধরনের বিজাতীয় আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ মুসলিম সমাজের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না। মুসলিম সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমর্থ হয়নি। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির যথার্থতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ যে শুধুমাত্র গভীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, ঐতিহ্যবাহী জীবন যাত্রায় ভাঙ্গন ও আধ্যাত্মিক মুসলিম মানসে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে সে উপলব্ধির জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমে পশ্চিমা মডেল ও ধ্যানধারণার অনুকরণ একটি ক্ষুদ্র এলিট বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যারা ক্ষমতায় আরোহন করে সে অন্ধ অনুকরণকে জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে এবং এভাবে তারা পশ্চিমা শক্তির তাঁবেদারে পরিণত হয়ে বৃহত্তর সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে। এ স্বার্থভোগী এলিটশ্রেণী পশ্চিমা শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী চলতে গিয়ে মুসলিম জাতিসত্তা, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি চেতনা সকল কিছুকে অবক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের সম্মুখে আজকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিজের স্বকীয়তাকে পুনঃ চিহ্নিত করা এবং নিজের ভাগ্যকে পুনঃ নির্মাণ করা। এজন্য প্রয়োজন মুসলমানদের নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিশ্বাসের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও পুনঃ আস্থা স্থাপন। এজন্য আজকের প্রয়োজন পশ্চিমা ধ্যান ধারণায় সৃষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে শরিয়ার আলোকে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নতুন সমাজ বিপ্লব সংগঠিত করা। ১৯৯৪ সালে তুরস্কের মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে মুসলিম পার্টি ও আলজেরিয়ার সংসদ নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের বিজয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়ার সাম্প্রতিক উদাহরণ। একইভাবে মধ্য এশিয়ায় ইসলামী শক্তির উত্থান কমিউনিজমের ব্যর্থতা এবং কমিউনিস্ট চিন্তাধারা কর্তৃক 'আফিম' বলে আখ্যায়িত ধর্মের বিজয় ঘোষিত হয়েছে।

ডোনাল্ড ই. স্মীথের মতে সামাজিক, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে মুসলিম সমাজ একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা। এরূপ সমাজে ধর্ম স্বাতন্ত্রিক স্বায়ত্ত্বশাসিত কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্ম প্রবিষ্ট হয়।[১] কিন্তু মুসলিম অঞ্চল হতে উপনিবেশিক শক্তিসমূহের বিদায়ের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হতে দেখা যায় যে, এসব দেশে বাস্তবে মানুষের বস্তুগত জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে অথবা এ ধরনের বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রকাশিত সমীক্ষাসমূহে ইসলাম ও রাজনীতির মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান তার গুরুত্ব উৎঘাটন করে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং কি অপরিবর্তিত রয়েছে তা নির্ণয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতির অর্থ, ধরন, প্রকৃতি কি রূপ তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

রাজনীতির সংজ্ঞা

'পলিটিক্স' বা রাজনীতি শব্দটি গ্রীক শব্দ 'পলিসি' হতে এসেছে, যার অর্থ নগর। রাজনীতির উপর আলোচনা রাষ্ট্রের উপর বিধায় এর নানা অর্থ ও তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থার কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে "শূন্যতাকে ঘিরে পাহাড় প্রমাণ উপাত্ত" বলে অভিহিত করতে ই. ই. সাটস্নেউডার প্ররোচিত হয়েছেন।[২] অনেকে রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের উপযোগিতার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, কেননা রাজনীতির সংজ্ঞা এর প্রাসংগিকতার মধ্যেই নিহিত আছে। তাদের মতে রাজনীতি হচ্ছে রাজনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যা বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে বার্নার্ড ক্রীক্স-এর প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য হচ্ছে 'রাজনীতি হচ্ছে রাজনীতি।'[৩] সংজ্ঞার বিষয়ে এই অনীহার ঐতিহ্য সত্ত্বেও অনেকে অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আওতাভুক্ত মৌল বিষয়ের উপর আলোচনা করেছে।

নীতি নির্ধারকগণের যে নৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দরকার মূলতঃ সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্লেটো ও এরিস্টটল রাজনীতিকে দেখেছেন। তাদের মতে রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো সাধারণ কল্যাণ, সামাজিক শুভবোধ ও নৈতিক পূর্ণতা সাধন। এরিস্টটলের মতে 'রাষ্টবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন।'[৪] রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও, এরিস্টটল রাজনীতিক সংগঠন পদ্ধতির গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজ কর্মচারীদের কিভাবে নির্বাচিত করা হয়, কিভাবে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয়, কর্মচারীদের উদ্দেশ্যের প্রকৃতির স্বরূপ

ইত্যাদি বিষয়ে এরিস্টটল সবিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন।[৫] সাম্প্রতিক সময়ে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তারা সুন্দর জীবন কি এ নিয়ে যে মতবিরোধ তাকে 'রাজনীতির মৌলকেন্দ্র' রূপে অভিহিত করেছেন।[৬] যদিও সুন্দর জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণায় স্বাধীনতা ভোগ থেকে স্বাধীনতা ও শুভবোধের সমন্বয়-এর মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়[৭], এর পরও তারা রাজনীতিকে একসাথে কাজ করা ও বাঁচার কৌশল হিসাবে অভিহিত করেছেন।

রবার্ট-এ ডাহল রাজনীতি সম্পর্কে এরিস্টটলের সংজ্ঞাকে খুব সংকীর্ণ মনে করেছেন, কেননা এতে রাজনীতিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তিনি রাজনীতির সংজ্ঞা পুনর্নির্মাণ করে বলেছেন যে, 'ইহা একধরনের অনঢ় মানবিক সম্পর্কের প্রকৃতি যা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতা, শাসন বা কর্তৃত্বের সাথে সংযুক্ত থাকে।'[৮] কল্যাণকর জীবন যাপনে রাষ্ট্রযন্ত্রই যথেষ্ট, এরিস্টটলের এই মতবাদকে ডাহল সমালোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতিসত্তার সহঅবস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনীতির সম্পর্কের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করেছেন। তিনি জটিল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'পদ' বা 'ভূমিকা'র সংজ্ঞা নির্মাণে এরিস্টটলকে অনুসরণ করেননি।

ডাহলের বক্তব্যকে ডেভিড ইস্টন আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'রাজনৈতিক কর্ম সমাজে কর্তৃত্বের সাথে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে' মর্মে তার অভিমত অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে 'গতানুতিক মতবাদে' পরিণত করেছে।[৯] ডাহলের ন্যায় তিনি রাজনীতিকে মানবিক সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন, তবে তিনি একে সমগ্র সমাজের মাঝে 'কর্তৃত্বশীলতার বণ্টনের' মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। উপরন্তু ইস্টন সমাজের সীমিত সম্পদের বণ্টননীতির পরিবর্তন আনয়নের মধ্যে নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তিনি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এলান সি আইজ্যাকের মতে এ বক্তব্যটি 'একটি আপোষমূলক অবস্থান, যা অতিসংকীর্ণও নয় আবার অতি বিস্তৃতও নয়।'[১০]

বণ্টনপদ্ধতি এবং তার উপর গুরুত্বারোপ হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের লেখাতেও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে রাজনীতির সংজ্ঞা হচ্ছে, 'কে কি পাচ্ছে, কখন পাচ্ছে এবং কিভাবে পাচ্ছে।'[১১] লেসওয়েলের সংজ্ঞাটি পরিধির দিক থেকে ব্যাপক, যা একজন পর্যবেক্ষককে রাষ্ট্রযন্ত্রসহ সমাজ বিন্যাসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে রাজনীতিকে অবলোকন করার সুযোগ করে দেয়। এ সংজ্ঞা যুগপৎ কর্তৃত্বশীলতার সম্পর্ক এবং বন্টন পদ্ধতিতে ক্ষমতা ও দ্বন্দ্বের প্রভাবকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ইস্টন ও ল্যাসওয়েলের ধারণার পার্থক্য মূলত: তুলনামূলক গুরুত্বারোপের উপর ঃ প্রথমজন সমগ্র রাজনীতিক ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন এবং দ্বিতীয়জন ক্ষমতার সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে ল্যাসওয়েল সাধারণভাবে রাজনীতিকে 'ক্ষমতার আকার নির্ধারণ ও তার অংশীদারীত্ব বণ্টন' হিসাবে অভিহিত করেছেন।

স্পষ্টতই বিষয়বস্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো হতে সীমিত সম্পদ বণ্টনের বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তিত বা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অধিকন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাবাদী ঐতিহ্য ক্লাসিক্যাল বা মধ্যযুগীয় ভালো সমাজ ও তৎসম্পর্কিত আচরণ বিধির-ধারণাকে অপসারিত করে দেয়। বর্তমানে ক্লাসিক্যাল বা আধুনিক রাজনীতির সংজ্ঞার ক্ষমতা ও দ্বন্দ্বের ধারণাও বদলে গেছে। ক্ষমতার নৈতিক ও আদর্শিক ধারণাটি বর্জিত হয়েছে এবং সে স্থান দখল করে নিয়েছে– বিজয়ী বস্তুবাদ ও বস্তুগত আচরণবিধি।

'যেকোন মূল্যের বিনিময়ে ক্ষমতাধারীর আনুগত্যের কাছে অন্য সবাইকে নতিস্বীকার করান'– এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষমতা সর্বগ্রাসী ও সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে।[১২] এই ধরনের ক্ষমতার মানবীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাথে সহঅবস্থান সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এমন নজীরবিহীনভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে তা মানুষের অধিকার, চিন্তা, সংস্কৃতিকে দলিত করে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে।[১৩] আইজ্যাক ডি ইসরাইলীর ভাষায় রাজনীতি তাই "প্রতারণার মাধ্যমে মানব জাতিকে শাসন করার কৌশলে" পরিণত হয়েছে।[১৪]

ইসলামে রাজনীতি

পশ্চিমা রাজনীতির সাথে ইসলামী রাজনীতির কোন সামঞ্জস্য বা মিল নেই। তবে রাজনীতির অর্থ যদি হয় কল্যাণময় জীবন-যাপন এবং একমাত্র আল্লাহ পাকের আরাধনা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জীবনচর্চা তবে সে রাজনীতি ইসলামের মূল বিষয়। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চারটি স্তম্ভ যথা নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব 'ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে'।[১৫] ইসলামের এ স্তম্ভগুলোর উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন নয় বরং এর আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক তাৎপর্য রয়েছে। এ সব স্তম্ভসমূহ মানুষের আচরণ ও কার্যকলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বাসীদের জন্য যে নামাজ ফরজ করা হয়েছে (৪ঃ১০৩), জামায়াতের সাথে যা আদায় করা বিধেয়, সে নামাজের মাধ্যমে একজন ঈমানদার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যাতে রয়েছে চিন্তন, আবেগগত অনুপ্রেরণা ও শারীরিক সঞ্চালন। নামাজে বিশ্বাসী মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়, নামাজ আদায়ের জন্য একজনকে ইমাম নির্বাচিত করা হয়, ইমামকে নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়, তাঁর কোন ত্রুটি হলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে নামাজীরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু, আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও'। নামাজের প্রার্থনার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে কল্যাণময় জীবনের নীতিমালা, সামাজিক সমতা ও ঐক্য, নেতৃত্বও আনুগত্য, দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব সচেতনতা এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। একই ধরনের গুণাবলী সম্বলিত নিয়াবলী ইসলামের

অন্যান্য স্তম্ভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সামাজিক জীবনে এই স্তম্ভগুলির পরিচর্চা এক ধরনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রশিক্ষণ। সাইয়েদ আ'লা মওদূদীর ভাষায়, 'যত নিয়মানুবর্তিতার সাথে আমরা এই প্রশিক্ষণ অনুসরণ করব, তত ভালোভাবে আমরা আদর্শের সাথে বাস্তব জীবনের মিলন ঘটাতে পারব।'[১৬]

রাজনীতিকে যদি সরকার পরিচালনার সীমাবদ্ধ সংজ্ঞায় ধরা হয় তবে রাজনীতি ইসলামের অন্যতম প্রধান বিষয়। 'সৎ কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ নিষেধ কর' কুরআনের এ আহ্বান; ন্যায়বিচার ও অন্যান্য ঐশী গুণাবলী ও নির্দেশনা প্রভৃতি সমুন্নত রাখার জন্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। কুরআনে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাকে নিন্দা করেছে (২ ঃ ২০৫) এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সমাজে সংগঠন ও কর্তৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একইভাবে দ্বিতীয় খলিফা ওমর একজন ইমাম (নেতা) ব্যতিরেকে সংগঠিত সমাজ গঠন সম্ভব নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং আরো মন্তব্য করেছেন যে আনুগত্য ছাড়া নেতা নির্বাচিত হওয়া যায় না।[১৭] খোলাফায়ে রাশেদা ও তাঁদের সাথীগণ এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা বাস্তবায়নের যে ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার দায়ভার যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় শুভবোধ দ্বারা এমনভাবে অভিষিক্ত ছিল যে তাঁরা রাজনীতি, আইন ও সমাজকে ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হিসাবে দেখতেন। হযরত কাব এর সূত্রে ইবনে কুতায়বা বলেন : 'ইসলাম, সরকার ও জনগণ হচ্ছে তাবু, দণ্ড, রজ্জু ও পেরেকের মত। ইসলাম হচ্ছে তাবু, সরকার হচ্ছে তাবু ধারণকারী দণ্ড, আর জনগণ হচ্ছে রজ্জু ও পেরেক। একটি ছাড়া অন্যটির কোন কার্যকারিতা নেই।[১৮]

ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে রাজনীতি ইসলামের আরো মৌলিক বিষয়। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তৌহিদ ঘোষণার জন্য প্রয়োজন সমস্ত তাগুতী শক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়া অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা দখল করতে হবে যাতে পৃথিবী থেকে সকল জুলুম, অন্যায়, অবিচার অপসারণ করা যায়। ইসলামের কাংখিত তৌহিদী সমাজে কোন আপোষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নেই। সকল মিথ্যা দেবতাদের মিথ্যা পূর্জাঅর্চানকে বিতাড়ন করে দেয়ার জন্য ইসলাম উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে, এসব মিথ্যা দেবতাদের ধারক বাহকদের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ন্যায়পরায়ণ ধর্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে এবং ভালোর উপর মন্দকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। কুরআনের নির্দেশেই নবী মোহাম্মদ (সা) নির্জনতা হতে বেরিয়ে এসে রিসালত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর মদীনায় হিজরতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। একইভাবে সকল পূর্ববর্তী নবীগণও ঐশী বাণী প্রচার করেছেন এবং সকল বিশ্বাসীদের তাগুতী শক্তি নস্যাৎ করে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। (১৬ ঃ ৩৬)

ইসলাম তাই ক্ষমতার সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত, যে ক্ষমতার সাহায্যে সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী জগতকে রূপান্তর করা যায়। 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর রাহে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা) তাই ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়ন প্রচেষ্ঠার অন্য নাম। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ক্ষমতা দখলকে কুরআনে এত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, কুরআন জিহাদকে ঈমানের কষ্টিপাথর হিসেবে অভিহিত করেছে।

ব্যক্তিগত সামষ্টিক স্বার্থ হাছিলের জন্য ক্ষমতা দখল ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম ক্ষমতাকে একটি নৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। এ ক্ষমতা দখল আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম মাত্র, যাতে চির শান্তিময় অনন্ত জীবন লাভ করা যায় এবং মানবতার জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার উৎস হিসাবে যাতে এই রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের তত্ত্ব ও প্রায়োগিক রাজনৈতিক ক্ষমতার ধর্ম, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের রূপরেখাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাল্টে দেয়।

উপরের আলোচনা হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের নির্দেশনা এবং একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। স্রষ্টাও সীজারের মধ্যে একজনকে বেছে নেবারও অবকাশ ইসলামের নেই। ইসলামে সীজারের কোন অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু মহান আল্লাহর সার্বভৌম অস্তিত্ব। শরীয়াহ (ইসলামী আইন) বস্তুগত জীবনের সাথে আধ্যাত্মিক জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করেছে। ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধ রাজনীতির নির্দেশনা ও গতিপথ নির্ধারণ করে দেয় এবং রাজনৈতিক আচরণ বিধি ইসলামের আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হতে উৎসারিত। তাই রাজনীতির মুখ্য বিষয়সমূহ তথা রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা, ন্যায়পরায়ণদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, মন্দের শিকড় উৎপাটন করে কল্যাণকর জীবন প্রতিষ্ঠা-এসব কিছুই ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং ইসলাম এসব কিছুকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ইসলাম কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রদান করে, তবে পার্থক্য এটুকু যে, এ সমস্ত কিছু তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ও বিস্তৃত কাঠামোর ভিতরে সংঘটিত হতে হবে। ধর্ম ও রাজনীতি তাই 'একই ইসলামী মুদ্রার দু'পিঠ'-নয়।[১৯] তাদেরকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যায় না যে, একটি স্বাধীন সত্তা এবং একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। ইকবালের ভাষায় প্রকৃত সত্য এই যে, 'ইসলাম হচ্ছে দ্ব্যর্থহীনভাবে একক বাস্তব সত্যতা, যা সুস্পষ্টভাবে এক ও অভিন্ন, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন।'[২০]

ইসলাম ও রাজনীতি ঃ একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

ধর্ম ও রাজনীতির সবচেয়ে আদর্শিক সম্পৃক্ততার উদাহরণ হচ্ছে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা), যাকে কুরআন সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে (উসওয়াহ হাসানা ৩৩

ঃ ২১)। অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে তাঁর মদীনায় হিজরতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ক্ষমতা-সম্পর্কের পুনর্গঠন করে ঐশী ইচ্ছার অনুবর্তী করা। এখানেই ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রধান ছিলেন মহানবী মোহাম্মদ (সা)।

তিনি নামাজের ইমামতি করতেন, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন, বিচারক হিসাবে কাজ করতেন এবং জননীতি নির্ধারণ করতেন। সঠিক পথে পরিচালিত খোলাফায়ে রাশেদা তাঁদের শাসনকালে মহানবী (সা) কে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেছিলেন। উম্মাহর নেতা হিসাবে তিনি শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতেন, ধর্মীয় আদর্শ পূর্ণভাবে সংরক্ষণ ও সমুন্নত এবং এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখতেন। তৃতীয় খলিফা উসমানের সময় ইসলামী সভ্যতা 'প্রাচ্য হতে পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগরের তীর' পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।[২১]

পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সকল মুসলমান সমাজের গ্রহণ ও অনুসরণের জন্য আদর্শ স্বরূপ। উমাইয়া খিলাফতের আবির্ভাবের সাথে মুসলিম ইতিহাসে বংশানুক্রমিক শাসনের এক নতুন ধারা যুক্ত হলো, যা কখনো কখনো বল্গাহীন রাজতন্ত্রে পরিণত হতো।[২২] জাগতিক কমকাণ্ডে তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বেচ্ছাচারী। তবুও তাদের ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিরক্ষাকারী, ইসলামের সম্মানের সংরক্ষক, ইসলামের বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী যোদ্ধা হিসাবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু তারা দম্ভমুক্তভাবে শরীয়াহকে অবজ্ঞা করার কোন ক্ষমতা বা সাহস রাখত না।

যে আন্দোলনের মাধ্যমে খিলাফতের ক্ষমতা উমাইয়াদের হাত হতে আব্বাসীদের হাতে হস্তান্তরিত হয় ঐ আন্দোলনের সাথে মহানবী (সা.) এর আত্মীয়-স্বজন জড়িত ছিলেন। ক্ষমতা দখল করে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ মোতাবেক শাসন পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন, যা তাদের শাসনক্ষমতাকে শক্তিশালী বৈধতা দান করে। তাঁরা খিলাফতের ধর্মীয় দিকগুলিকে উচ্চাসন প্রদান করল এবং জনগণের সামনে শরীয়াহর পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করল।

ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রমাণ হিসাবে অধিকাংশ আব্বাসীয় শাসকগণ নামের শেষে আল্লাহ বা 'দ্বীন' (ধর্ম, জীবন বিধান) শব্দ ব্যবহার করতেন যথা আল-মুনতাসীর বি-আল্লাহ, আল-কাহির বি-আল্লাহ, সালাহ আল-দ্বীন, মুহয়ী আল-দ্বীন ইত্যাদি। যদিও পরবর্তী খলিফাগণ শরীয়াহর সাথে সম্পর্কহীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করত, রাজনীতি ও ইসলামকে পৃথক করে রেখেছিল, তবু তারা লাগামহীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারত না এবং অন্ততঃ প্রকাশ্যে ঈমান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যকার সম্পর্কের কথা স্বীকার করতেন। যাহোক মুসলিম শাসক শ্রেণী কর্তৃক রাজনীতি ও শরীয়াহর কার্যত পৃথকীকরণ এ যুক্তি দাঁড় করাতে পারে না যে ইসলাম এ পৃথকীকরণকে অনুমোদন করে। ইসলামের অবস্থান মূল্যায়ন করতে হবে এর মূলনীতির

৩—

সাহায্যে, শাসকবৃন্দের বিচ্যুতি দ্বারা নয়। দরবেশের মত সাধারণ জীবন যাপনকারী ও শরীয়াহ অনুযায়ী শাসনকারী উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ ব্যতীত মুসলিম ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জনগণের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনা করা হতো না। এ পরিস্থিতি মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে তিনটি ধারার জন্ম দিল। সুফী শ্রেণীর লোকজন (অতিন্দ্রীয়বাদী) জনজীবন হতে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নির্জনবাস শুরু করলেন। হানাফী আইনশাস্ত্রবিদ আবু লয়দ আল-সমরকন্দী আনাসকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'উলামা বা ইসলামী পণ্ডিতগণ হচ্ছেন মহানবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের উত্তরাধিকার, কিন্তু তারা যখন শাসক শ্রেণীর নিকট যান এবং পার্থিব বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন তখন তারা মহানবী (সা.) এর আদর্শ ভুলে যান।'[২৩] জাগতিক সকল বিষয় হতে সুফীদের নিজেদেরকে প্রত্যাহার বস্তুত আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটিয়েছিল। হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে কিছু সুফী তরিকা জন্ম নেয় যা অদ্যাবধি বর্তমান আছে। তাদের বিশ্বাস, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এগুলোর মধ্যে কিছু অনৈসলামিক উপাদানও ঢুকেছে। এগুলো তরিকাসমূহের মধ্যে বিভ্রান্তির জটাজাল বিস্তার করে। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে সুফীগণ ইসলামের মূল্যবান মূল্যবোধসমূহ সংরক্ষণ ও বৈরী শক্তির প্রভাব হতে ঈমান আকিদা রক্ষায় মহান অবদান রেখেছেন।

দ্বিতীয় ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন ঐসব চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞগণ যারা উম্মতের ঐক্য, সংহতি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে কার্যতঃ মেনে নিয়ে সমর্থন করেন। স্বরিরোধী হলেও তাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্র হতে নিজেদের দূরে রেখেছেন, শাসন কর্তৃত্বের কোন পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, বলপূর্বক আনুগত্য গ্রহণের রীতিকে অনুমোদন করেননি, এবং যে সব বিদ্রোহী শাসন কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফিকাহ শাস্ত্রের চারটি ধারার প্রবর্তকগণ (মাজহাব) শাসকশ্রেণীর সাথে সম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু সে সম্পর্ক সৌহার্দমূলক ছিল না। ম্যানফ্রেড হলপার্ন তাঁদের এ নীতিকে 'প্রতিবাদী সহযোগিতা' বলে অভিহিত করেছেন;[২৪] যে ভূমিকার জন্য তারা নানা ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁদের অন্যতম ইমাম আল-শাফীঈ প্রায় মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসব মুসলিম চিন্তাবিদগণ স্থিতাবস্থা সমর্থন করেছিলেন এই জন্য নয় যে এই শাসকবর্গ ইসলামী আদর্শের প্রতীক ছিলেন বরং তারা নৈরাজ্য ও বিশৃংখল অবস্থা হতে উম্মতকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তারা শাসকবর্গকে মান্য করার পরামর্শ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জনগণকে পাপাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য না করে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত ধর্মরিপেক্ষতাবাদকে মেনে নেবার শামিল এবং এর ফলে বিশ্বাসীদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাস্তববোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে তাঁরা উম্মতের দুঃখদুর্দশা ও শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শাসকদের অবস্থা মেনে নিয়েছিলেন।

তৃতীয় ধারাটির প্রতিনিধিত্ব করেন 'উলেমাবৃন্দ' যারা 'রাষ্ট্রীয় অসহযোগিতা ও সামাজিক অস্থিরতার মাঝে ইসলামের পতাকা বহনের' গুরুত্বদায়িত্ব স্কন্ধে ধারণ করেন।[২৫] তারা জনগণের চরিত্র সংশোধনে নিয়োজিত থাকেন এই আশায় যে এ প্রচেষ্টা এক সময় ইসলামের আলোকে সমাজ বিবর্তন ঘটাবে। তাদের কর্ম প্রচেষ্টার বৃহদাংশ নিয়োজিত থাকে কুরান-সুন্নাহ অনুযায়ী ঈমান আকিদার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনে। তাঁরা সত্যনিষ্ঠ, আন্তরিকতা, সত্যবাদিতা, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, সহনশীলতা ও ধৈর্য ইত্যাদি আত্মিক গুণাবলী প্রচার করেন।

এটা স্বীকৃত যে খোলাফায়ে রাশেদার সামনে মুসলিম সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতার প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকাও জটিল হয়ে পড়ে। আইন শাস্ত্রবিদ, সুফী ও উলেমাগণ যে সমাজে কাজ করেছেন সে সমাজ ব্যবস্থারও বিপুল পরিবর্তন ঘটে। বস্তুগত জগত ও আধ্যাত্ম জগতের মধ্যে দৃশ্যত যে বিভাজন পরিদৃশ্যমান হয় তার অর্থ এই নয় যে দু'টি ধারা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। যদিও কতিপয় সুফী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন, প্রখ্যাত কয়েকজন তাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাঝে সম্মিলন ঘাটিয়েছেন। তাঁরা বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন যাপন করলেও রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত হতেন, শাসকবর্গের সাথে তাদের সংঘাত হতো এবং শেষতক তাঁদের প্রচেষ্টা শক্তিশালী সমাজ, রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে ইমাম গাজ্জালীর দার্শনিক শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে তুমারৃত তার উদাহরণ।[২৬] তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব ও দর্শনের ভিত্তিতে মুওয়াহিদ সাম্রাজ্যের (হিজরী ৫২৪-৬৬৭ সন/ ১১৩০-১২৬৯ খ্রি.) পত্তন ঘটে। এটি ইসলামী সাম্রাজ্যের পুরো পশ্চিমাঞ্চল দখল করে 'প্রায় দু' প্রজন্ম যাবত শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারা বজায় রাখে, যা রোমানদের সময়ের পর আর দেখা যায়নি।'[২৭] ধর্মযোদ্ধাদের প্রার্থনা ও বাসগৃহ হিসাবে পরিচিত 'রিবাত' ধর্মগৃহে বসবাসকারী মুওয়াহিদের পূর্বসূরী 'আল-মুরাবিতুন'রা সফল জিহাদ পরিচালনা পূর্বক 'আল-মুরাবিত' সাম্রাজ্য (হিজরী ৪৪৮-৫৪১ সন/ ১০৫৬-১১৪৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সেনেগাম্বিয়া হতে আলজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২৮] সাম্প্রতিক সময়ের উদাহরণ হচ্ছে তুর্কিস্থানের নকসবন্দীয়া আন্দোলন, সুদানের মাহদিয়া আন্দোলন এবং আরো অন্যান্য।

একইভাবে 'উলেমা' সম্প্রদায়ের যারা স্থিতিবস্থা মেনে নিয়েছিলেন, তারা একে কখনো ইসলামী মনে করেননি। তারা বাস্তবজীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐক্যকে ইমাম গাজ্জালীর ভাষায় 'ধর্ম ও বস্তু জীবন হচ্ছে যমজ' এ ভাবে মনে করতেন। গাজ্জালীর মতে রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে, 'মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ সাধন করা'।[২৯] ইসলামী আইনজ্ঞ (যথা আল মাওয়া'র্দী ও আল-গাজ্জালী), দার্শনিক (যথা নসর আল দ্বীন আল-ফারাবী ও ফখর আল-দ্বীন আল-রাজী) ও গ্রন্থের লিখক (যথা নিযাম আল-মুলক ও হুসাইন ওয়াইজ কাশফী)[৩০] দের মতে আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে যেখানে

কল্যাণময় জীবন যাপনের জন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে– আল্লাহপাক নির্দেশিত আধ্যাত্মিক সাধনা ও শরীয়া'র বিধান মান্য করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বস্তুগত জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্য নিজেদের যেখানে গড়ে তুলতে পারবে।[৩১] এমনকি ইবনে খালদুন প্রাচ্যবিদরা যাকে ধর্মনিরপেক্ষ ধরনের পর্যালোচনার জন্য উর্ধ্বে স্থান প্রদান করেন, তিনিও আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পৃক্তিকরণের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আল-মাওয়ার্দীর মত তিনিও ধর্মরক্ষণ ও শাসন কার্য পরিচালনার জন্য খলিফার ভূমিকাকে 'মহানবী মোহাম্মদ (সা) এর উত্তরাধিকারী বা বিকল্প হিসাবে' বর্ণনা করেছেন।[৩২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নীতিগতভাবে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনীতিতে কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্র পরিব্যাপ্তকারী ধর্ম হিসাবে ইসলাম কখনো সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে এর পরিসীমার বাইরে রাখতে পারে না। তবু যেসব ধারা উপরে আলোচিত হয়েছে তা হতে ক্ষমতা ও সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে স্ববিরোধী ধারণার জন্ম হয়েছিল। মুসলিম অঞ্চল সমূহের উপর উপনিবেশবাদী শাসন এ অবস্থাকে আরো দুর্বিষহ করে তুলে।

পাশ্চাত্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মুসলিম রাজনীতি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজেদের সভ্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণ এবং সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপত্র তিনটি ধারার জন্ম দেয়, খুরশীদ আহমেদ এগুলোকে আধুনিকপন্থী, সনাতনপন্থী ও তাজদীদপন্থী রূপে অভিহিত করেছেন।[৩৩] এ তিনটি ধারাকে ভন হাদ্দাদ সংস্কৃতায়নবাদী, আদর্শবাদী ও নব্য আদর্শবাদ রূপে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৪]

ক্যান্টওয়েল স্মীথের মতে আধুনিকপন্থীরা হচ্ছে পাশ্চাত্যপন্থী মুসলিম, তারা বিজাতীয় মূল্যবোধকে বৈধতা দানের জন্য ঐসব মূল্যবোধ দ্বারা ইসলামকে অসার জাকজমক দ্বারা আবৃত করতে চেয়েছে অথবা ঐসব মুসলিম ব্যক্তি যারা ইসলামের ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্যমূল্যবোধ আমদানী করে সংমিশ্রণ করতে চেয়েছে।[৩৫] এ চিন্তাধারার প্রতিনিধিরা হচ্ছেন স্যার সাইয়েদ আহমদ খান (হিজরী ১২৩২-১৩১৬ সন/১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রি.), জামাল আল-দ্বীন আসাদাবাদী বা আল-আফগানী (হিজরী ১২৫৪-১৩১৫ সন/১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রি.), তাঁর ভাবশিষ্য শেখ মোহাম্মদ আবদুহ (হিজরী ১২৬০-১৩২৩ সন/ ১৮৪৫-১৯০৫ খ্রি.) এবং অন্যান্যরা। তারা তকলীদকে (অন্ধভাবে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য অনুসরণ) অগ্রাহ্য করেন, পশ্চিমা জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণের আহ্বান জানান, এবং ইসলামী চিন্তাধারার মূলকেন্দ্রে যুক্তিবাদকে স্থাপন করতে চান। ঐতিহ্যবাদী ইসলামী ধারণায়

যুক্তিবাদ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, তবে এটা মননশীলতা হতে ভিন্ন।[৩৬] মূলত: কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে আধুনিকতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার উৎসকেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবচেয়ে সরব ও মুখ্য প্রবক্তা হচ্ছেন শেখ আলী আবদ-আল-রাজিক (হিজরী ১৩০৪-১৩৮৪ হিজরী/ ১৮৮৮-১৯৬৬ খ্রি.); তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন এবং কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও অর্থনীতির উপর পড়াশুনা করেছিলেন। ই.আই.জে রজেনআলের মতে আল-রাজিক প্রণীত গ্রন্থ 'আল-ইসলাম-ওয়া উসুল আল-হুক্‌ম' (ইসলাম ও সরকারের নীতি) রাষ্ট্রের জাগতিক কর্মকাণ্ড হতে.... ধর্মকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করার তাত্ত্বিক ভিত রচনা করে।[৩৭] আবদ আল-রাজিক রাজনীতিও রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সবকিছু বর্জন করে ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করেন যে, নবী করিম (সা) ছিলেন একজন রাসূল প্রত্যাদেশ বাহক), যার শাসন করার বা রাষ্ট্র গঠনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না।[৩৮] ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং মোহাম্মদ (সা) ছিলেন অবিসংবাদিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা, যাঁর 'রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিকরণ' ছিল নিছক ঘটনাচক্র মাত্র এবং এর সাথে তাঁর নবুয়তী মিশনের কোন সম্পর্ক ছিল না।[৩৯] কুরআন বার বার রাসূলুল্লাহ (সা) কে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে তিনি কারো প্রতিনিধি *(উকিল)*, অভিভাবক *(হাফিজ)* বা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব *(মুসেয়তীর)* না করেন, কেননা তাঁকে শুধু সতর্কবাণী উচ্চারণ, প্রজ্ঞা, সুন্দর ভাষণ ও যুক্তিযুক্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে উপদেশ প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।[৪০] সংক্ষেপে ইসলাম ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে যোজনব্যাপী ব্যবধান এবং উভয়কে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে।

উপর্যুক্ত মতামত অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহও ইজমা (মুসলমানদের ঐক্যমত) অনুসারে খিলাফতের কোন ধর্মীয় বৈধতা থাকেনা এবং 'ক্রুরশক্তির' ভিত্তিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নির্যাতনের মাধ্যমে তা বহাল রাখা হয়। খলিফারা 'ধর্মের নামে' মুসলমানদের 'রাষ্ট্র বিজ্ঞানের চর্চা' করার অধিকার হরণ করেন..... এই ভয়ে যে তাতে তাদের ক্ষমতার ভিত ধ্বংসে পড়বে।[৪১] আবদ আল-রাজিক জনগণের কল্যাণ ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন ধর্মে কোন বিশেষ ধরনের সরকারের কথা বলা হয়নি, ইহা 'যে কোন ধরনের' হতে পারে– স্বৈরতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা বলশেভিকীয়।[৪২] সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে বিচার বিবেচনা মোতাবেক, যুক্তি ও রাজনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী।[৪৩] মুসলমানদের অবশ্যই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাধুনিক তত্ত্বানুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

আল-রাজিকের গ্রন্থ *'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুক্‌স'* প্রবল প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্ড কাউন্সিল এ গ্রন্থের তীব্র নিন্দা করে। গ্রান্ড

কাউন্সিল গ্রন্থকারের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমা বাতিল করে এবং তার বিচারক পদ প্রত্যাহার করে নেয়। আলী আবদ আল-রাজিককে যে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এতে কোন ভুল নেই যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে নবুয়তী মিশন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঘোষণা করেছিলেন, যে মিশনের লক্ষ্য শুধুমাত্র একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনই নয় বরং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনও ছিল। আধুনিক ধর্মনিপেক্ষতাবাদী চিন্তার ভিত্তি যুক্তিবাদ। আধুনিক আচরণবাদ ও বিজ্ঞানপন্থীরা ইসলামী বিশ্বাস ও মতাদর্শের মৌলিক স্তম্ভগুলিকে যে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে তা উপর্যুক্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বর্তমান ধারা

আধুনিকতাবাদ ধর্মীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে আর এর উপাঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন হতে ধর্মের প্রভাবকে নির্বাসিত করতে চেয়েছে। পশ্চিমা মূল্যবোধভিত্তির সামগ্রিক সংস্কৃতিয়ায়ন পরিকল্পনা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু ইসলামের প্রতি বেরী ভাবাপন্ন। নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই নয়া উদ্ভাবন (বি'দাত) কে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা উলেমাদের দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহীতার সামিল। নিন্দা প্রতিরোধ এবং উলেমাদের প্রতিবাদের মুখে জনসমর্থনহীন হয়ে এই পশ্চিমা সংস্কৃতিকরণের প্রচেষ্টা মুসলিম সমাজে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

আবদ আল-রাজিকের ইসলামের কেবল মাত্র ধর্মীয় চরিত্রের উপর গুরুত্বারোপ করে হামিদ এনায়েত দুঃখ করে বলেন যে, বিষয়টি 'মুক্ত ও সত্যাশ্রয়ী বিতর্কের' সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া নৈতিক মূল্যবোধের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছাড়াও অন্য উপাদানের প্রয়োজন আছে কিনা সে মতবাদের বিষয়ে যে বিশ্লেষণ ও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন ছিল সে সুযোগও হাতছাড়া হয়ে গেছে।[৪৪] তিনি আধুনিকপন্থীদের 'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ও অসহনশীল মানসিকতাকে' দোষারূপ করেন যা 'সানতনপন্থীদের এই অভিযোগকে সত্যতা প্রদান করে আধুনিকপন্থীরা যে শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চায়না, বরং তারা ইসলামের সার্বিক নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিমালার বিনাশ সাধন চায়।[৪৫]

আদর্শবাদী 'উলেমাবৃন্দ' বিদেশী সংস্কৃতিকরণ উদ্যোগকে তাদের চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বৈরীতামূলক হিসাবেই দেখেননি উপরন্তু তারা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে দুঃখজনকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতেও ব্যর্থ হন। প্রখ্যাত মুসলিম প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতদের তুলনায় শেখ মোহাম্মদ আবদুহ ও অন্যান্যদের চিন্তাধারার দৈন্যদশা ছিল জাজ্বল্যমান। ইসলামের সামাজিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও ধারণা ছিল ভাসাভাসা। আবদ-আল-রাজিকের সমীক্ষার প্রশংসা করলেও রজেন খান তাঁর চিন্তাধারার অসামঞ্জস্যতা ও বৈসাদৃশ্য

অবলোকন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, 'বিশেষ করে আল ফারাবি, ইবনে সীনা, ইবনে রুশ্দ এবং সাধারণভাবে অন্যান্য "ফালাসিফাহ' বা মুসলিম দার্শনিকদের রাজনৈতিক অভিসন্দর্ভ সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।'[৪৬]

বিদেশী সাংস্কৃতিক বোধ দ্বারা যারা ইসলামী মূল্যবোধকে অভিষিক্ত করতে চেয়েছে সেসব আধুনিকপন্থীদের সম্পর্কে ম্যালকম ক্যার' এর মন্তব্য দ্ব্যর্থহীনঃ 'নতুন তাত্ত্বিকভিত নির্মাণের জন্য তাদের যথোপযুক্ত ও যথেষ্ট আদর্শিক জ্ঞান ছিল না, ছিল শুধুমাত্র পশ্চিমা মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিসম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান'।[৪৭] পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তারা কোন সঠিক ইসলামী কাঠামোগত তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারেননি, এমনকি নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে যে সব জটিলতা বিদ্যমান তাও তারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মোকাবেলায় যে উন্নত ও সমৃদ্ধ চিন্তাধারা উপস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল তা ইসলামে আছে এবং এ কারণে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও মূল্যবোধ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন হচ্ছে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা, যে দায়িত্ব নব্য আদর্শবাদীরা স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন এবং যারা নতুন উদ্দীপনার সাথে আধুনিক মানুষের জন্য ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন। যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাহিত্য তারা উপস্থাপন করেছেন তাতে পাশ্চাত্যের সমন্বয় ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও মূল বিষয়টি হচ্ছে ইসলামের মৌলিক আদর্শিক বাণী, সেই একই মহান বাণী যা শুরুতে প্রদান করা হয়েছিল এবং যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বিশ্বাসের বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন বিন্যাস, নয়া কোন ইসলাম নয়।[৪৮]

ফজলুর রহমান তাঁদেরকে নব্য মৌলবাদী অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। আধুনিক জগতের সাথে ঐশী প্রত্যাদেশ ও শরীয়াহকে সামঞ্জস্যশীলভাবে সম্পৃক্ত ও সমন্বয় না করতে পারার অভিযোগে তিনি নব্য মৌলবাদীদের সমালোচনা করেন। তবে তিনি নব্য মৌলবাদীদের চিত্ত ও চিন্তনের তীক্ষ্মতা অনুভব করতে পেরেছিলেন : 'এটা প্রাণসঞ্জীবনীর ন্যায় জীবন্ত, ক্রোধ ও উৎসাহে স্পন্দিত এটি প্রাণবন্তভাবে সমৃদ্ধ এবং সত্যাশ্রয়ী ক্রোধে পরিপূর্ণ। এর নৈতিক গতিশীলতা প্রামাণিত এবং এর সংহতি ও ঐকতা উল্লেখযোগ্য'।[৪৯] মুসলিম বিশ্বে চলমান ইসলামী আন্দোলনে তারা প্রথম কাতারে আছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (হিজরী ১৩২২-১৩৯৯ সন/ ১৯০৩-১৯৭৯ খ্রি:), সাইয়েদ কুতুব (হিজরী ১৩২৪-১৩৪৬ সন/ ১৯০৬-১৯৬৬ খ্রি:) এবং আরো অনেক সমকালীন পণ্ডিত ইসলামের বিশ্বজনীনতা উপস্থাপন করেছেন।

সাইয়েদ মওদূদীর মতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ আবর্তে আবদ্ধ করে মানুষকে পার্শ্ব প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং একে অন্যের উপর জুলুম ও পাপাচার চালায়। সাইয়েদ কতুবের মতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অজ্ঞ (জাহিলী) সংস্কৃতির নিদর্শন, যাকে গতিশীল ও সমন্বিত ইসলামী ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত

করতে হবে। তাঁদের মুখ্য বিষয় হচ্ছে তাওহীদ আল্লাহ্ পাকের একত্ব ও তাঁর একক সার্বভৌমত্ব, রিসালাত— নবী করিম (সা) এর প্রত্যাদেশের বাণী বহন, খিলাফত— আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধিত্ব। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বিষয়ে তারা আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনের ঐক্যতার মূলসুর ও ধারা হতে তাদের তাত্ত্বিক দর্শন শুরু করেছেন। ইকবালের ভাষায়, 'ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ তার সৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।' 'একটিকে অস্বীকার অন্যটিকে অস্বীকার করার সামিল।'[৫০] 'এ সমগ্র পৃথিবী একটি মসজিদ স্বরূপ'। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইকবাল ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 'যা কিছু ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষ তা মূল ও উৎসের দিক থেকে পবিত্র। কারণ 'বিষয়ের সার্বিক গুরুত্ব অন্তর্চেতনার বিনির্মাণে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।'[৫১]

স্রষ্টার ক্ষেত্র ও সিজারের ক্ষেত্র আলাদা আলাদা মর্মে পাশ্চাত্যে যে তাত্ত্বিক ধারণা রয়েছে ইসলামে তার কোন স্থান নেই। ইসলামে সীজারের কোন অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু আল্লাহর সর্বপ্লাবী অস্তিত্ব, যিনি মহাবিশ্বের প্রভু, স্রষ্টা ও পালনকর্তা। ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করে ঐক্যের উপর– আল্লাহর অবিভাজ্য ঐক্য, বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়গত ঐক্য, সামগ্রিক চেতনায় মানবজীবনের ঐক্য এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের মিলন-জাত ঐক্য। অতীতের ন্যায় সমকালীন ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন ঐক্যের ধারণার উপর স্থাপিত। এটাই হচ্ছে মুখ্য ও বেগবান আদর্শিক ধারা প্রবাহ। এটাই ইজমা মুসলিম উম্মার ঐকমত্য।

উপসংহার

প্রচলিত ধারণায় ইসলামকে যেরূপ মনে করা হয়, ইসলাম আসলে সে ধরনের কোন ধর্ম নয়– ভ্রান্তিমূলকভাবে ইসলাম ধর্মকে মনে করা হয় নিছক আচার অনুষ্ঠান, ভাবাবেগ ও কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি। বরং ইসলাম হচ্ছে একটি জীবন্ত জীবন বিধান, জীবনের সকল অস্তিত্ব ও সমস্ত কর্মপরিসর ঘিরে এর আবর্তন। সমগ্র মানবতার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক নির্দেশনার জন্য ইসলাম একটি সুসমন্বিত ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যশীল একক সমগ্রতা, বিশ্বজনীন নীতিমালার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাপাত ও একটি সামগ্রিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ভাষায় কুরআন শিক্ষা প্রদান করে যে, 'ইসলাম শুধু প্রচারের জন্য নয়, বরং অনুশীলন করে তা বাস্তবায়নের জন্য, সঠিক ভাবে একে উপস্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।' রাজনীতির সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, এটা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইসলাম ও রাজনীতি এ দু'য়ে মিলে হয় এক অবিভাজ্য সত্তা।

বস্তুত এটাই কারণ যে, 'ঐতিহ্যগতভাবে মুসলমানরা কখনো বিচ্ছিন্নভাবে রাজনীতিকে অন্যান্য জ্ঞানের শাখার সাথে অসম্পর্কিতভাবে অধ্যয়ন করে না। রাষ্ট্রের প্রকৃতি,

সরকারের প্রকারভেদ, শাসকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও শাসিতের অধিকার প্রভৃতি সমস্যাকে আদর্শবাদ ও আইনশাস্ত্রের সামগ্রিক নিরিখে আলোচনা করা হয়- সকলই অনাক্রমণসাধ্য ও সুরক্ষিত শরীয়াহ্ দেয়ালের মধ্যে সম্পাদিত হয়।'৫২

আধ্যাত্মজীবনের সাথে বস্তুজীবনের এ যে ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্তিকরণ তা মহানবী (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার জীবনে মূর্তভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিখুঁত ইসলামী রাজনীতির নীতিমালা মদীনা মডেলে উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ক্রম বিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইবনে খালদুল মন্তব্য করেছেন যে, কুরআন ও মহানবী (সা) উপস্থাপিত যে সত্যাশ্রয়ী ইসলামী শাসন পদ্ধতি ছিল, তা হতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা বহুদূরে সরে গিয়েছে। উমাইয়া আমলে মুসলিম ইতিহাসের সকল শাসক তাদের শাসনব্যবস্থায় শুধুমাত্র ইসলামের কতিপয় নীতিমালা বিধিবদ্ধ করেছিল। তবুও এসব বংশানুক্রমিক শাসক প্রকাশ্যে শরীয়তের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে এবং ইসলামের নামে তাদের শাসন ক্ষমতাকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা নিতে হয়েছে। এই অস্থির সময়ে মুসলিম চিন্তানায়কগণ বিশ্বাসীদের মন ও হৃদয়ে ইসলামের সত্যাশ্রয়ী মর্মবাণী জাগরূক রাখা এবং শরীয়ার অনুশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ প্রয়োগের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে বহন করেছিলেন। কার্যকরী সমাজের রাষ্ট্রীয় সংস্কার কার্যক্রম ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড এ দু'য়ের পরস্পর নির্ভরশীল সমৃদ্ধ সম্মিলনে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল।

উনবিংশ শতকে ইসলাম এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়। মুসলিম বিশ্ব সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টবাদের নিকট পরাজিত হয় এবং বিজয়ী পাশ্চাত্য শক্তি মুসলিম ইতিহাসের মর্মমূলে আঘাত হানা শুরু করে। পরিত্রাণের উপায় হিসাবে আদর্শবাদপন্থী নামে পরিচিত দল ইসলামী ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে থাকা ও পাশ্চাত্যকরণ ও প্রক্রিয়া হতে দূরে সরে থাকার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকপন্থীরা ইসলামকে সুরক্ষার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকার কারণে বিকলাঙ্গ ও বিকৃত এক ইসলামী তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। উপরে বর্ণিত দু'ধারার মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে নব্য আদর্শবাদ পন্থীদের হাতে ইসলামের এক জীবন্ত স্পন্দিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়। নব্য আদর্শবাদপন্থীরা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মোকাবেলায় বিকল্প পন্থা হিসাবে ঐশ্বরিক ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সমগ্রতাকে বলিষ্ঠভাবে উত্থাপন করেন।

ইসলামের মূল বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান, বর্তমান পরিস্থিতির সাথে ইসলামী প্রাসঙ্গিকতার শিকড় আবিষ্কার, বর্তমান স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করে তাকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য নীতিমালার আদলে ঢালাই করার প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়, বরং ইসলামের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এ মৌলিক আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন সমূহের নতুন বৈশিষ্ট্য হলো এর ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং মুসলিম বিশ্বের সকল অঞ্চলে কর্মমুখর,

সজীব ও সামঞ্জস্যশীলভাবে ইসলামকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন। মুসলিম বিশ্বের সকল অঞ্চলে এই প্রাণবন্ত ইসলামী আন্দোলন পরস্পর গ্রথিত শিকলের মত সচলভাবে চালু রয়েছে। পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামী, মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড ও অন্যান্য সমকালীন ইসলামী আন্দোলন সমূহের আহ্বান হচ্ছে রাজনীতি, ধর্মসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিক সংস্কার আনয়ন। ধর্মের বিষয়টি ধর্মনিরপেক্ষতার চাপে কিছুদিন সুপ্ত ছিল, তা মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে পুর্নশক্তিতে পুনর্জীবিত হয়ে উঠল।

এ আন্দোলন এতই উদ্দীপ্ত ও শক্তিমান ছিল যে, যে সকল মুসলিম নেতা সারাজীবন ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার প্রবক্তা ছিল তাদের অন্যতম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল এবং বাধ্য হয়ে ইসলামী সমাজকে রাষ্ট্রীক ব্যবস্থার জনপ্রিয় আশা-আকাংখা ও দাবির প্রতি মৌখিক সমর্থন জানাতে হয়েছিল।

জনগণের আশা-আকাংখার শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী, পাকিস্তানের জেড এ ভূট্টোর ক্ষমতার ভিত নড়ে যায় এবং তারা ক্ষমতাচ্যুত ও অপসারত হয়। পরবর্তীতে আয়াতুল্লাহ খোমেনী ও জেনারেল জিয়াউল হকের ক্ষমতার যে বৈধতা আসে তা ইসলাম হতে উৎসারিত। জিয়ার অধীন পাকিস্তান ইরানের পরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ইসলামী ভাবাপন্ন রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ব্রুনাই নিজকে সুলতানাত অব ব্রুনাই দারুস সালাম নামে ঘোষণা করে এবং এভাবে দেশটি নিজকে সরকারীভাবে ইসলামী উম্মাহ হিসাবে উপস্থাপন করে। এমন কি তুরস্ক, যে দেশটি ১৯২৪ সালে মুসলিম বিশ্বের সাথে সকল আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিন্ন করে, সেখানেও মুসলিম পুনর্জাগরণের সূচনা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামকে সাংবিধানিকভাবে কতটুকু গ্রহণ করা হয়েছে এবং কুরআন সুন্নায় বিধৃত মূল্যবোধ ও নীতিমালার কতটুকু মুসলিম সমাজসমূহে গৃহীত হয়েছে তার তারতম্য রয়েছে। তবে শরীয়াহ অনুযায়ী শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করলেই রাতারাতি কিছু ঘটে যাবে না– এর জন্য প্রয়োজন সমগ্র সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন। বিষয়টি রাজনীতিকে ধর্মের আওতায় আনার দাবি করে, যাতে মানুষের রাজনৈতিক জীবন তাদের বৃহত্তর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের কাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই ইমাম গাজ্জালীর ভাষায় রাজনীতি তরান্বিত করতে পারে 'মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি'।[৫৩]

রাজনীতি পরিভাষাটি যা কিছু অর্থ বহন করে সে বিষয়ে সব কিছু সম্যকভাবে জানতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমাদের সেই ধ্যানধারণা, জ্ঞান প্রদান করে থাকে। সে জ্ঞানটি হচ্ছে সুশৃংখল ও পদ্ধতিগতভাবে ধ্যান ধারণা, আচরণ, নীতিমালা এবং সকল পর্যায় ও প্রেক্ষিতে সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া। বিশ্ব মানবিক ও ইসলামী ব্যবস্থা নির্মাণ দাবী করে যে, শরীয়ার কাঠামোর মধ্যে থেকে রাজনীতিতে একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে, যার চরম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইসলামী প্রয়োগ প্রণালী

ইসলামী সভ্যতা ও সমাজে এক সময় ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞান জীবন ও গতি সঞ্চার করেছিল। এখন এটা প্রাচীন মাদ্রাসা ও সনাতন খানকা সমূহের চার দেয়ালে বন্দী হয়ে আছে। পাশ্চত্যের নতুন সমাজ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক চিন্তাধারা আয়ত্ব করে কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী নিছক অনুষ্ঠান ও আচার সর্বস্ব প্রথা, পদ্ধতি ও সংস্কারের যে প্রাচীন ইসলামী ফসিল রয়েছে তা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি যুগোপযোগী প্রয়োগ পদ্ধতি নির্মাণের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সমকালীন ইসলামী আন্দোলন সমূহের প্রাগ্রসরতা এর প্রয়োজনীয়তাকে আরো বেশী অপরিহার্য করে তুলেছে।

এই অধ্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইসলামী প্রয়োগ প্রণালী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সব মৌলিক ধারণাসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় তার দুর্বলতাসমূহ এ অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়। এটা করার প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে পাশ্চাত্যের ধারণা সমূহ হতে মুসলিম মানসকে মুক্ত করা, যাতে মহানবী মদীনায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন সেদিকে মুসলমানগণ ধাবিত হতে পারে।

প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

পশ্চিমা প্রায়োগিক সমাজ এই ধারণার উপর স্থাপিত। পদার্থ বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সূত্রের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার মত সমাজ বিজ্ঞানেও মানুষের আচরণের সামঞ্জস্যশীলতা ও ঐক্যের সাধারণ সূত্র বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।[১] শত বছরের পুরনো ধারণার পরজীবী শিকড়ের?[২] উপর বেঁচে থাকা সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুরনো ধারণাসমূহ বাতিল করে দিয়ে নতুন সমাজ বিজ্ঞানের জীবনের অনুসন্ধানের প্রতি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রযোজ্যতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[৩] মানুষের আধ্যাত্মিক ও আন্তঃমনন অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাকে প্রচলিত পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞান জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করে না। নতুন এই বিজ্ঞানে ভাষাগত দর্শনের সাথে ইতিবাচক যুক্তিবাদকে সমার্থক হিসাবে ধরে নিয়েছে। পরবর্তীতে একটি আন্দোলন জন্ম নিয়েছে যা 'উপাত্তগত বাস্তবতা' এবং 'মূল্যবোধ' এর মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে একে সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করে ফেলেছে।

"বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবারের দর্শন ধারণার প্রভাবে সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিয়েছে যে প্রায়োগিক ও বাস্তব গবেষণার ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক মূল্যবোধ'কে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, না করা সঠিক হবেনা।"[৪]

এ ধরনের গবেণাধর্মী বিজ্ঞান সকল সমীক্ষা হতে ধর্মীয় আবরণের প্রভাবকে মুক্ত করতে চেয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপর ঐশ্বরিক তথা চার্চের অনুমোদন প্রথা বাতিল ঘোষণা করে। সকল জ্ঞানগত সমীক্ষা ও গবেষণাকে সম্পূর্ণভাবে যুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়। যার ফলে মানুষ 'যুক্তিপূর্ণভাবে বিনস্থ' বিশ্বের উন্নয়নের নিয়ম কানুনসমূহ জানতে পারে। এসব বিজ্ঞান নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলিকে বাতিল করে এবং সকল বিষয় বিজ্ঞানকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ করে যাতে মানুষের দৃশ্যমান সকল আচরণ দ্বারা সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায়।[৫] এভাবে এ বিজ্ঞান প্রয়োগ প্রণালী, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীকরণ ও পরিমাপের উপর নিজকে সীমাবদ্ধ করে। অংকশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান হতে গবেষণা কৌশলগুলি আনয়ন বা ধার করা হয়।

এক ধরনের ইতিবাচক বিজ্ঞান বলে অভিহিত শাস্ত্র প্রথমে এর উৎগাতাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্ম দিলেও এটা পরে ভুল ও ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়। উত্তর বিশ্ব ও দক্ষিণ বিশ্বের মধ্যে কাঠামোগত বিপুল বৈষম্য,স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি; লেবানন, গাজা, কাশ্মীর ও পারস্য অঞ্চলে অমানবিক দমননীতি এরূপ নতুন নৈর্ব্যক্তিক সমাজবিজ্ঞানের ভিত নাড়িয়ে দেয়।[৬]

তাই সামগ্রিক সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত আচরণ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাগিদ অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, ইসলাম একটি সামগ্রিক সভ্যতা হিসাবে মানব জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে পর্যবেক্ষণ করে এবং মানুষের সমস্যা ও তার সমাধানকে কোরান ও সুন্নায় বিধৃত নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আদর্শের নিরিখে দেখে। তাই ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মকেন্দ্রিক না হয়ে পারে না। এ দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা ইসলামে ব্যক্তি মানুষের প্রকৃতি ও আচরণ ও তার প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করা হয়।

যুক্তি ও প্রত্যাদেশ

এম.এইচ নসরের মতে প্রকৃতির দিক থেকে পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞান নৃতাত্ত্বিকমূলক যা উচ্চতর সকল আদর্শ ও নীতিকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে বাস্তবতার মাপকাঠি মনে করে। পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞান শুধুমাত্র প্রত্যাদেশ ও যুক্তিকে পৃথকই করে না বরং প্রত্যাদেশকে জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে অস্বীকারও করে।[৭] গ্রীক-রোমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও যুক্তিবাদী দর্শন অনুসারে সমাজ বিজ্ঞান যা কিছু মানববুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে না তাকে অস্বীকার করে। এ মানদণ্ডে যা মানুষকে সর্বোচ্চ বস্তুগত কল্যাণ দান করে তাকে নৈতিক বলে মনে করে।[৮]

পক্ষান্তরে ইসলামী সভ্যতার শিকড় ঐশী প্রত্যাদেশের মধ্যে প্রোথিত। যেহেতু প্রত্যাদেশ ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োগনীতির অন্যতম ভিত্তি তাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে প্রত্যাদেশের সত্যতা যুক্তির মানদণ্ডে বিচার কর যায় এবং তা সবসময় করা হয়ে আসছে। প্রথম থেকে সকল ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিতর্কে প্রত্যাদেশের সাথে যুক্তির সম্পর্ক কেন্দ্রীয় গুরুত্ব লাভ করে আসছে। আল-আশারী (হিজর ২৭০-৩৩০ সন/৮৭৩-৯৪১ খ্রিঃ) কালাম শাস্ত্র বা যুক্তিবাদের ভিত্তি গুড়িয়ে দেন, তিনিও যে কোন ত্বাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে যুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এটা সর্বজনবিদিত যে ইমাম আবু হানিফা, তার বিখ্যাত শিষ্য আলতাহায়ী, আল-মাতুরিদি এবং এমনকি ইমাম গাজ্জালী জ্ঞান লাভের জন্য যুক্তির নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।[৯]

কুরআন সঠিক পথের জন্য সকল কিছুকে যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে দেখার আহ্বান জানিয়েছে (কুরআন ৫৯:২,৭:৮৬)। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী রজেন থালের মতে ঐশী আইন ও মানবীয় যুক্তি পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।[১০] যুক্তি না থাকলে প্রত্যাদেশ কখনো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতো না এবং ঐশী প্রত্যাদেশ বলেই এটা সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করত না। কুরআনের কমপক্ষে ৭৫০ আয়াতে মানব ইতিহাস, সমাজ ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা, গবেষণা, উপলব্ধি, যুক্তি প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে আল-মাতুরিদি মন্তব্য করেছেন যে, মানুষের ইন্দ্রিয় ও যুক্তির অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কখনো কখনো মানবীয় চিন্তার অস্বচ্ছতার কারণেও নানা অন্তঃ ও বহিঃ শক্তির প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান লাভে ব্যর্থ হয়।[১১]

ঐশী প্রত্যাদেশ মানুষকে পরকালীন চিরস্থায়ী জগত এবং একই সাথে এই ইহকালীন জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, বৃহত্তর পরিসরের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ঐশী প্রত্যাদেশ এমন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার আলোকচ্ছটা যে অজ্ঞতা, অপর্যাপ্ত জ্ঞান স্থবির সংস্কৃতি ও আচার পদ্ধতির কুয়াশা বিদীর্ণ হয়ে যায়। ইমাম গাজ্জালী ও ইবনে খালদুনের লিখনী হতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমানগণ প্রত্যাদেশের জ্ঞানের সাথে যুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে আরোহন করেছিল। ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে জোয়ার বর্তমানে প্রবাহিত হচ্ছে তার শিখা আরবের ইসলামী জগত প্রজ্বলিত করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামী সভ্যতার অনন্য অবদান।[১২]

সমাজ বিজ্ঞান বনাম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রাবলী ও তথ্যাবলী সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিভ্রান্তি ও অবিমৃশ্যকারী ফলাফল হচ্ছে, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রায়োগিকতাকে অনেক সময় সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত ও নৈতিক বিষয়ের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধা অর্জন ও বৈজ্ঞানিক নিপুণতা প্রমাণের জন্য অনেক সময় আবশ্যকভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়াদি অন্ধভাবে অনুকরণ করা হয়েছে।[১৩] ব্যবহারিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চাকারীরা এটি করতে গিয়ে কৃত্রিমতার সৃষ্টি করেছেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষের অনিশ্চিত আচরণ ও ব্যবহারকে দুমড়ে মুচড়ে অনেক সময় বিকৃত করা হয়েছে।

"আমরা সামঞ্জস্যশীলতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি অথচ লক্ষ্য করছি না আমাদের আচরণ বিধি সামঞ্জস্যশীল কিনা অথবা আমরা সামঞ্জস্যশীলভাবে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছি কিনা। এর ফলাফল এমন হতে পারে যে আমরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটি ভুল পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছি।"[১৪]

সুতরাং উপসংহার এই যে, সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় সূত্রাবলীর ও ফলাফলের দিক থেকে নিখুঁত হতে হবে এ ভুল মনোভাব ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা বাদ দিয়েই সামগ্রিকভাবে সমাজ বিজ্ঞানমূলক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হবার কথা, এবং তা হলো মহান স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল ও মানবীয় চরিত্রের মৌলিক প্রবণতাকে উৎঘাটন করা। আল কোরআনের আলোকে জ্ঞান তিন প্রকার ঃ অদৃশ্যলোকের সর্বোচ্চ ঐশী জ্ঞান *(হাক্কুল ইয়াকীন)*; সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি নির্ভর জ্ঞান *(ইলম-উল-ইয়াকীন)* এবং জীবন অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক বিবরণ নির্ভর জ্ঞান *(আইনুল ইয়াকীন)*।[১৫]

অতএব দেখা যায় ইসলামে জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি সব কিছুকেই স্থান প্রদান করা হয়েছে। এটা বাঞ্ছনীয় যে জ্ঞানের একটি শাখা হতে জ্ঞানের অন্য শাখা তথ্য আহরণ করে সমৃদ্ধ হবে। তবে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে গবেষণা ও কৌশল পদ্ধতি অনুযায়ী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার স্বাতন্ত্রিক অস্তিত্ব রয়েছে।

রাজনীতির যান্ত্রিক ধারণা

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুকরণের ফলে প্রায়োগিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকে দৃশ্যমান বাহ্যিক আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। রাজনীতির সংজ্ঞা 'কে কি পেল, কখন পেলো এবং কিভাবে পেলো' (ল্যাস ওয়েল) এবং 'মূল্যবোধের কর্তৃত্বমূলক বিতরণ' (ইস্টন) এর সংজ্ঞায় পর্যবসিত হলো। একইভাবে রাষ্ট্রের ধারণাও কতগুলো সাধারণ যৌক্তিকতা তথা জাতীয় আয়, বস্তুগত ও সেবাগত পরিমাণ, উপযোগিতা প্রভৃতি নির্ণায়কের দাড়িপাল্লায় নিরূপিত হলো।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজনীতির যান্ত্রিক ধারণাটি বিশ্বজনীন নয়, বরং বিশেষ সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। পাশ্চাত্যে রাজনীতির যান্ত্রিক ধারণার জন্ম বিধায় শুধু মাত্র সেই সমাজের জন্যই তা প্রযোজ্য হতে পারে। এ কারণে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে ইরানী বিপ্লব, আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন,কাশ্মীরিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যৌক্তিক বলে বিবেচিত হচ্ছে না, কেননা এখানে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ধরনের কোন

উপাদান কাজ করছে না। নীতি বিবর্জিত পাশ্চাত্য রাজনীতি তাই 'নোংরা খেলায়' পরিণত হয়েছে, যেখানে ক্ষমতা লিপ্সুরা স্বার্থবাদী নানা অনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে একে অন্যকে হারিয়ে ক্ষমতার আসন দখল করে।[১৬] কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু ক্ষমতা দখলই যখন রাজনীতির লক্ষ্য হয়, তখন রাজনীতি একটি উন্মুক্ত, নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়।

রাজনীতির যান্ত্রিক ধারণার সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মিল নেই, কেননা ইসলাম একটি উদ্দেশ্যমুখী ও লক্ষ্যভিসারী জীবন বিধান। ইসলাম তাই এই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করে। কুরআন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের নিন্দা করেছে (২:২০৫) এবং নবী করিম (সা) সমাজে সুশৃঙ্খলা ও কর্তৃত্বের উপর জোর দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে ইসলামী পণ্ডিতগণ উল্লেখিত বিষয়ের উপর জোর দিয়ে আসছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের মতে একজন নেতা বা ইমামকে মান্য করা ব্যতীত সংগঠিত সমাজ গঠিত হতে পারে না। ইমাম ইবনে হাম্বল এর সাথে একমত পোষণ করে বলেন ইমামের অনুপস্থিতিতে সমাজে নিশ্চিতভাবে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।[১৭] শীর্ষস্থানীয় মুসলিম চিন্তাবিদ আল মাওয়ার্দী আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন জ্ঞান অর্জন ও সত্য পথে চলার জন্য একজন ইমাম থাকা অত্যাবশ্যক।[১৮]

সংগঠিত কর্তত্বের উপর এরূপ অত্যাধিক গুরুত্বারোপের কারণ হিসাবে ফখর আল দ্বীন আল রাজী (হিজরী ৫৪৩-৬০৬ সন ৫৪৩-৬০৬ খ্রি) বলেছেন যে, রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া মানুষ তার কাংখিত লক্ষ্যে ও অভিষ্ট ভাগ্যে উপণীত হতে পারে না।[১৯] ইবনে তাইমিয়ার (হিজরী ৬৬১-৭২৮ সন। ১২৬২-১৩২৮ খ্রিঃ) মতে রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতিরেকে ধর্মও টিকে থাকতে পারে না।[২০] সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার আসল লক্ষ্য শান্তি বজায় রাখা বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নয়, বরং ইসলামের মূল আকিদা বিশ্বাস সংরক্ষণই এর পরম লক্ষ্য।[২০]

এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সংগঠিত কর্তৃত্বের হাতে কত প্রকার সম্পদ রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা ইসলামের সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।[২১] ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে আদর্শ ভিত্তিক, এর পদ্ধতি হচ্ছে সার্বিক ও সার্বজনীন এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যায়বিচার ও ভালো কর্মের প্রতিষ্ঠা। সংক্ষেপে, ইসলামে রাজনীতি হচ্ছে রাজনৈতিক মানব সংগঠনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা প্রবিষ্ট করে দেয়া।[২২]

তাই দেখা যায় ইসলামে রাজনীতি কোন লক্ষ্য নয়, বরং ইসলামী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনীতি। এরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের কোন অবকাশ রাখে না। বরং এ ধারণা উল্লেখিত উপাদান দু'টিকে সংমিশ্রিত করে, প্রত্যাদেশের আলোকে রাজনীতিকে পরিচালিত করে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ঐশী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে মানুষকে পূণ্যবান করার জন্য তাদের 'সত্য, ও ভালোর দিকে আহ্বান ও মন্দ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করে? (কুরআন ৩ ঃ ১০৪; ৫ঃ৩।

এটাই সে আদর্শ যা প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীরে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত রেখেছে। ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলন ইসলামী আদর্শের বাইরের কিছু নয়। বরং এর কেন্দ্র রয়েছে ইসলামের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ধারণা এবং ঐশী আলোকে ব্যক্তি মানুষ সমষ্টির জন্য যে ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়া আছে তদনুযায়ী জাতির ভাগ্য নির্মাণ করা। পশ্চিমকে এই মুসলিম রাজনৈতিক মানসিকতা বুঝতে হবে, যাতে তারা মুসলমানদের প্রকৃত আশা আকাংখাকে উপলব্ধি করতে পারে।

ইসলামী বিশ্লেষণ কাঠামো

রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উপরের আলোচনা হতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম কৃত্রিম ও খামখেয়ালীপূর্ণভাবে সামগ্রিক জীবনকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ এমন দুই ভাগে বিভক্ত করে না। ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম-সমন্বিত হয়ে রাজনৈতিক-সামাজিক একটি সমগ্রতা নির্মিত হয়। আল ফারুকী মন্তব্য করেছেন যে,

'উম্মাহ হচ্ছে একটি দেহ স্বরূপ যার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের উপর নির্ভরশীল এবং সব অঙ্গ পরস্পর নির্ভরশীল। কোন এক অঙ্গ যখন কাজ করে তখন তা দেহের অন্যান্য অঙ্গের কার্যাদিও সম্পন্ন করে এবং সমগ্র দেহের কাজের প্রভাব আবার প্রত্যেক অঙ্গের উপর পতিত হয়।'[২৩]

নবী করিম (সা) উম্মতকে, 'একটি সুনির্মিত সৌধের সাথে তুলনা করেছেন, যার একটি অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে'এবং আরো তুলনা করেছেন 'একটি দেহের সাথে যার এক অংশ ব্যথা পেলে অন্য অংশেও ব্যথা অনুভূত হয়।'[২৪]

ইসলামী রাজনীতি যেহেতু একটি সামগ্রিক বিষয়, তাই ব্যক্তি মানুষকে শুধু মাত্র তার ব্যক্তি পরিমন্ডল দিয়ে ভোলা যাবে না। ব্যক্তি পরিবারের সহিত সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও কার্যের দিক থেকে, আবার সমাজ ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের সামগ্রিক আবহের মধ্যে থেকে আন্তঃ পরিবার সম্পর্ক নির্মিত হয়। ইসলামে পরিবারের বিশেষ গুরুত্বের কারণ কুরআন পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে; পরিবার একদিকে সামাজিক বিন্যাসের একটি একক, আবার অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের সমষ্টিও বটে। বস্তুত অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ পরিবার ও সমাজকে সমার্থক মনে করেছেন যেহেতু ইসলামী কাঠামো বিন্যাসে একটিকে ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না।

সমকালীন রাজনীতি বোঝার সুবিধার জন্য শতাব্দী ব্যাপী আমাদের ঐতিহ্যগত সামজিক প্রতীক পরিবার প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির ভূমিকা, এবং এর উপর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পশ্চিমা ধারণার প্রভাবে ব্যক্তির ভূমিকা হ্রাস, পিতামাতার ভূমিকার প্রান্তিকীকরণ ও পরিবার ব্যবস্থার বিপর্যয় এবং তার নতুন বিন্যাসের সমকালীন প্রেক্ষাপট সমূহকে

উপলব্ধি করতে হবে। পরিবারে ব্যক্তি কর্তৃত্ব হ্রাসের সংকট উম্মতের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যার প্রভাব সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপরও পড়তে বাধ্য। ফলে রাজনীতির মহলে দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতার প্রশ্নটি উঠে এসেছে, যা দ্বারা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই ইসলামী সমাজ গঠন কাঠামোর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুরু হয় ইসলামী উম্মতের অঙ্গ সংগঠণের সামগ্রিক ধারণার উপর নির্ভর করে যাতে প্রত্যেক অংশ তথা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিন্যাস সব কিছু একে অন্যের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রস্তাবিত সামগ্রিক মডেলটি যুক্তিসঙ্গত কারণে শৃঙ্খলামূলক জ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিসীমা ও পরিধি বৃদ্ধি করে। প্রথমতঃ প্রত্যেক অংশ সামগ্রিক বিষয়ের একটি সম্পর্কিত দিক, যার ফলে পারস্পরিক শৃঙ্খলা, সমন্বয় ও সম্পর্কীকরণ সহজতর হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি অংশকে আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা যায় যা সমীক্ষার বির্নিমাণে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেকটি অংশকে বৃহত্তর সামগ্রিকতার পরিমণ্ডলে স্থাপন করার দ্বারা পরীক্ষণ ও সমীক্ষা সহজ হয় ও জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে যেহেতু ইসলামে ঐশী উদ্দেশ্যে সমাজের প্রত্যেক অংশের সক্রিয়ভাবে নিয়োগ ও প্রয়োগ দাবী করে। সে জন্য সমাজের কতিপয় অংশের মধ্যে সমীক্ষা ও কার্য পরিধি সীমাবদ্ধ রাখা ইসলাম সমর্থন করে না, কেননা অন্যান্য অংশ মনযোগ না পাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাহ্যিক ঘটনা ও মূল্যবোধ

উপরের আলোচনার অন্যতম তাৎপর্য হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র বাহ্যিক ঘটনার উপর নির্ভর করে অধ্যয়ন করা যায় না, কেননা মানুষের আচরণ মৃত কিছু নয় বরং এটি একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া। বাহ্যিক ঘটনা তখনই অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে যখন একে সামগ্রিকতার কাঠামোর মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করা হয়। শুধুমাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড করার মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না কেননা সামগ্রিক ব্যাখ্যা হতে বিচ্ছিন্নভাবে এ হতে কিছু নির্ণয় কর সম্ভব নয়। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেগিন ও মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত অথবা ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রবিন ও প্যালেষ্টাইনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে– এ তথ্য কোন তাৎপর্যপূর্ণ কিছুই বোঝায় না অথবা যা বোঝার তা নির্ভর করছে কোন্ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে তার উপর। ব্যক্তি সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা আপেক্ষিক, কেননা মানুষের আচরণ তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং এ ইচ্ছা তার বিশ্বাস ও নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত। একটি ঘটনা নিজেই নিজকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। গাণিতিক পিয়সে একটি সমীকরণের মত ঘটনা সংঘটিত হয় না। ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয়

করেন ঐ পর্যবেক্ষক যিনি তা অবলোকন করেন এবং তিনি তা নির্ণয় করেন বিশ্বাস পরিস্থিতি এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা তাই মূল্যবোধের গুরুত্ব দাবী করে। থমাস কুইন, সাইয়েদ এইছ, নসর, নকীব আল-আত্তাস ও আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মূল্যবোধ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণাকে চূড়ান্তভাবে নাকচ করে দিয়েছেন।[২৫] এ ধরনের ভান করা আত্মপ্রতারণার সামিল। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা বস্তুত রূপকথা কেননা মূল্যবোধই নির্ধারণ করে দেয় কি বিষয় ও কি পদ্ধতিতে বিষয়াবলী অধ্যয়ন ও নিরীক্ষা করা হবে। তাই কোন বিষয়ে যদি সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হয়, তবে অবশ্যই মূল্যবোধকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রে স্থান দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। কঠোর মূল্যবোধ নিরপেক্ষতার আবরণে বস্তুত অধিকাংশ পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উদার নৈতিক গণতন্ত্রের সপক্ষে পক্ষপাত করে থাকেন, যার লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা ও মুনাফার অংক বৃদ্ধি। সহজভাবে বলতে গেলে, তারা প্রচলিত গণতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার আবরণে চালিয়ে দিয়েছেন।[২৬] ফলে তাদের সৃষ্ট বিষয়গত জ্ঞান নিরপেক্ষ নয় বরং পশ্চিমা সভ্যতার ধ্যান-ধারণার সাথে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সংমিশ্রিত'; ফলে সবাই বিষয়টি বুঝতে না পেরে নিরপেক্ষ জ্ঞান মর্মে ভ্রমে পতিত হয়।[২৭]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কোন না কোন মূল্যবোধ বা আদর্শিক বিবেচনা দ্বারা চালিত হয় এবং সকল তাত্ত্বিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই কিছু ধ্যান-ধারণার বেলায় মানবিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আদর্শগত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়ার কোন বাস্তব পরিস্থিতির সুযোগ নেই।

ইসলামী মূল্যবোধ কাঠামো

পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শগত মূল্যবোধ ও বিবেচনাকে গোপন করে বা বিভ্রান্তমূলক ধারণা সৃষ্ট করলেও, ইসলাম মূল্যবোধের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। 'জ্ঞান ও মূল্যবোধ' এর উপর ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম সম্মেলন ১০টি প্রত্যয়কে চিহ্নিত করে যা ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক মূল্যবোধ ঃ তাওহীদ, খিলাফত, ইবাদত, ইলম, হালাল ও হারাম, আদল, জুলুম, *ইসতিসলাহ,* জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও দা'য়া বা অপচয়।

ইসলামের অপরিহার্য ও প্রথম ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তি একেশ্বরবাদ। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি ছাড়া আর কেউ এবাদতের যোগ্য নয়। তাওহীদ সমস্ত সৃষ্টিলোকের জন্য প্রযোজ্য, ফলে এর তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের একত্ব, ঈমানদারদের একত্ব, জীবনের সামগ্রিকতার একত্ব এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের একত্ব। তাওহীদ একটি মাত্র দিক নির্দেশ করে এবং অনুসারীদের জন্য একক চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মানবজাতিকে প্রজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত ও সমৃদ্ধ করে। তাওহীদের অনুসঙ্গ

হচ্ছে খিলাফত, যার অর্থ পৃথিবীতে মানুষের আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ মুক্ত তবে দায়িত্বসচেতনতা ও আল্লাহ পাকের কাছে জবাবদিহিতা দ্বারা আবদ্ধ। আল্লাহ মানুষ ও জ্বিনকে তার এবাদত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করেননি (কুরআন ৫১ঃ৫৬)। খিলাফতের তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ নিজের প্রতি ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে। এই উচ্চ দায়িত্ব সার্বিকভাবে পালন করার মধ্যে ইবাদতের অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত।

ইসলামে ইবাদতের ধারণা বেশ ব্যাপক। 'এবাদত' অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট প্রার্থনা বা কিছু আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর নির্দেশনার স্মরণ ও আনুগত্য। এবাদত জীবনের সব কর্মকান্ড তথা আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, এগুলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়।[২৯] আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের কার্যাবলী দু'ভাগে বিভক্ত ঃ হককুল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য ও আনুগত্য পালন এবং হক্কুল এবাদ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রতি, অন্য মানুষের প্রতি ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের প্রতি কর্তব্য পালন করা।

কার্যকরভাবে 'ইবাদত' করার জন্য প্রয়োজন ইলম বা জ্ঞান। সামগ্রিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের ধারণা ও পরিধি বিশাল। এর অর্থ ও তাৎপর্য সুফী দৃষ্টিভঙ্গিতে মারিফাত (আত্মপরিচয়) হতে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩০] ইলম বা জ্ঞানকে সাধারণ ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; 'প্রত্যাদিষ্ট ঐশী জ্ঞান, যা আল কুরআন ও সুন্নায় বিধৃত আছে এবং 'বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান' যা পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে লাভ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর জ্ঞান আবার দু'ভাগে বিভক্ত ঃ 'ফরজে আইন' যা সবার জন্য অবশ্যকরণীয় এবং 'ফরজে কেফায়া' যা সমগ্র সমাজের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি সম্পাদন করলে সবার পক্ষ হতে কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়।[৩১]

ইলম বা জ্ঞানের কথা কুরআনে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ৩০ঃ৫৬ আয়াতে ঈমান বা বিশ্বাস এবং ৩ঃ৭১ আয়াতে জ্ঞান যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জ্ঞান বা ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করো মর্মে হাদীস রয়েছে। তবে জ্ঞান চর্চা বা অর্জন তখনি এবাদত যখন তা ইসলামের সীমারেখার মধ্যে করা হয়। পাশ্চাত্যের 'জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানার্জন' বা 'সকল জ্ঞানই মঙ্গলকর' এ ধারণার সাথে ইসলাম একমত নয়। বরং জ্ঞান তখনই কল্যাণকর যখন তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করা হয়।

জ্ঞান মূল্যবোধ ভিত্তিক হতে হবে এবং অবশ্যই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নয় বরং মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সকল জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। মুসলিম পণ্ডিতগণ ইসলামের অনুমোদিত জ্ঞানের অন্বেষণ ও চর্চায় জীবন ব্যয় করেছেন। জ্ঞানকে হালাল ও হারাম দু'টি ভাগ করা

হয়েছে। হালাল ঐসব জ্ঞান ও কার্যাবলী যা ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশের জন্য কল্যাণকর। যে জ্ঞান ও কার্য হালাল তা আদল, সামাজিক ইনসাফ, ইসতিসলাহ বা জনকল্যাণ সাধন করে। আদল তার সর্ব পরিপ্রেক্ষিতে এবং *ইসতিসলাহ* তার সকল ব্যাপ্তিসহ ঐ জ্ঞানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করে যা ক্ষমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা তথা মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতির কল্যাণ সাধন করে।

হারাম বা নিষিদ্ধ গবেষণা হচ্ছে যা শারীরিক, বুদ্ধিবৃদ্ধিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মানুষ ও পরিবেশের জন্য ধ্বংসাত্মক। যে গবেষণা বিচ্ছিন্নতা, অমানবিকতা ও পরিবেশগত ধ্বংস সাধন করে তা গর্হিত তাই স্বাভাবিকভাবেই বর্জনীয়। এ কার্যাবলীসমূহ নিপীড়নমূলক এগুলো অপচয় মূলক। এ শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে হস্তরেখা বিদ্যা, যা রাসূলুল্লাহ (সা) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের ভাগই বেশী। মানুষ হচ্ছে আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যাকে বিবেকশক্তি, প্রজ্ঞা ও বিবেচনা বোধ প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ভালো কাজ করার জন্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার জন্য (কুরআন ২ঃ১৪৮, ১৯৩)।

উপরে জ্ঞান ও মূল্যবোধের যতগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ইসলামের সামগ্রিক চরিত্র গঠন করেছে। এ সব মূল্যবোধের অনুসরণে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচালিত তা সমাজের জন্য যা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর তা নিশ্চিত করতে পারে। এ ধরনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানব জীবনের অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করে, এবং যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ তার উপর আলোকপাত করে। এভাবে ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণহীনতা, পুণ্যময় ও পংকিলতাপূর্ণ এর মধ্যে পার্থক্য করে। মূল্যবাধ বর্জিত কতিপয় ঘটনা ও তথ্য সম্বলিত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান এ ধরনের জীবনবাদী জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারে না।

আদর্শ হিসাবে মদীনার মডেল

মূল্যবোধ ব্যবস্থা হিসাবে, ইসলামী প্রয়োগপ্রণালী শুধু তথ্যনির্ভর নয় বরং মূল্যবোধ ভিত্তিক। 'কোন কিছু কিরূপ' এই ধারণা পৃথক করা যায় না। তাই 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' ধারনাটি 'আদর্শ ব্যবস্থা' এর সমার্থক হওয়ার কথা কেননা দ্বিতীয়টির মানদণ্ড প্রয়োগ ছাড়া প্রথম ধারণাটির তাৎপর্য ফুটে উঠে না। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানও এধরনের একটি 'আদর্শ ব্যবস্থার' প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেনি এবং সে উপলব্ধি হতে সেন্ট-সাইমন, বরার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ার প্রমুখ তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এ ধারায় কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডেরিক এনগেলস্- এর 'শ্রেণীহীন সমাজের' ধারণাটি প্রণিধানযোগ্য।

মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্যের ইউটোনীয় ধরনের তত্ত্বের সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজনী নেই। মুসলমানদের মধ্যে এ ঐকমত্য রয়েছে যে নবী করিম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদা

মদীনায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা পৃথিবীর বুকে নজীর বিহীন ও আদর্শ স্থানীয় এবং তা মুসলমানদের সর্বযুগের জন্য দিক নির্দেশন প্রদান করেছে। সাইয়েদ কুতুবের ভাষায় ঃ এ যুগটি ছিল অনন্য সাধারণ যুগ, পরিশীলিত শীর্ষ যুগ, অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের সমষ্টি ও সমস্যা, একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এটা ছিল মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী ব্যবস্থাপনা, যাতে মানুষের বাস্তবজীবন পরিসীমায় তা বাস্তবায়ন করা যায় এবং মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে ভবিষ্যতে এ মডেল পুনঃ পুনঃ স্থাপন করা যায়।[৩২]

সকল যুগের সকল পরিস্থিতিতে মদীনার মডেলটি আদর্শ স্থানীয় এবং প্রচলিত অবস্থা ও প্রতিষ্ঠানমূহকে মদীনার মডেলটির দাড়িপাল্লায় ওজন করে এর সঠিকতা নিরূপণ করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান হচ্ছে সর্বোচ্চ আদর্শ মানব হিসাবে মহানবী (সা) এবং আদর্শ মডেল হিসাবে মদীনার ব্যবস্থাকে অনুসরণের নিরন্ত প্রচেষ্টা। এই মডেলের স্বর্গীয় স্পর্শে যেকোন রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা জীবন্তভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠে। এটা সর্বজনবিদিত যে মুসলিম পণ্ডিতগণ ইসলামী সীমারেখার মধ্যে থেকে জ্ঞানের সকল শাখা ও ক্ষেত্রে বিচার করেছিলেন। আদি যুগে 'ফুকাহা' বা শাস্ত্রবিদগণ ছিলেন জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার, তারা জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তথা সাহিত্য হতে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রে তাদের বিপুল অবদান রেখেছিলেন। প্রকৃত পেশাজীবী জ্ঞানী মানুষ যারা ইসলামকে কতিপয় আইনের সমষ্টি হিসাবে নয়, বরং জীবনযাত্রার আদর্শ ও তত্ত্ব, চিন্তার ভিত্তি হিসাবে অবলোকন করেছেন, যে জীবনাদর্শ অনুসারী অসংখ্য মানুষ জীবন যাপন করছে।[৩৩]

আদিযুগের পণ্ডিতগণ যে রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করতেন তা ছিল মূল্যবোধ নির্ভর। তারা রাজনৈতিক সম্পর্ক সমূহের তাত্ত্বিক ও বাস্তব সম্পর্কের সূত্র নির্ণয় করতেন। ইসলামী আদর্শ হতে তারা রাজনৈতিক সূত্রাবলী অন্বেষণ করতেন। শরীয়াহ কখনো আদর্শ বিবর্জিত হয়নি। এভাবে তারা তাদের সমগ্র রাজনৈতিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রভূমিতে আদর্শবাদী চেতনাকে স্থান দিতেন।

আদি মুসলিম পণ্ডিতগণের সমুজ্জ্বল অর্জনের কারণ ছিল তারা সঠিক প্রশ্ন ও তার উত্তর উপস্থাপন করতেন। রাজনৈতিক সংগঠন কি এবং তার উদ্দেশ্য কি? তাদের যা কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তা ইবনে খালদুনের (হিজরী ৭৩২-৮০৮ সন/ ১৩৩২-১৪০ খ্রিঃ) সমাজ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। ইবনে খালদুন পর্যবেক্ষণ, তুলনা, যুক্তির সুনিপুণ ব্যবহার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করেছিলেন।[৩৪]

ইবনে খালদুন রাজনৈতিক সংগঠন ও এ সংগঠনের দ্বারা পুরিত উদ্দেশ্য ও মানুষের লক্ষ্যের মাঝে সংযোগসূত্র স্থাপন করতেন। অন্য কথায় ইবনে খালদুন নৈতিক বোধের

উপর আলোকপাত করতেন, যা ইসলামী আদর্শের এই ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করত। মানব সমাজের প্রতি এ হচ্ছে ইসলামের এক অনন্য সাধারণ অবদান। রাজনীতিতে নৈতিকতার অন্বেষণ বস্তুত একটি সমতা ভিত্তিক মানবিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের প্রথম প্রয়াস।

উপসংহার

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানমূলক অনুসন্ধান ও তার ইসলামী বিকল্পের মাঝে যে বৈসাদৃশ্য উপরোক্ত আলোচনায় উন্মোচিত হয়েছে তাতে পূর্বোক্তটির দুর্বলতা ও ত্রুটি সমূহই শুধু উৎঘাটিত হয় নি বরং একই সাথে শেষোক্তটির অন্তর্নিহিত ইতিবাচক কল্যানধর্মী গুণাবলীসমূহও চিহ্নিত হয়েছে। যে চিত্রটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রণালীর দিক থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারাকে অনুসরণ করেছে। পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও প্রণালী হতে আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত চেতনা সমূকে বিসর্জন দিয়ে 'মূল্যবোধ নিরপেক্ষ' এক ধরনের সমাজ বিজ্ঞান নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞান বলে কিছু নেই। বস্তুনিষ্ঠ, মূলবোধ নিরপেক্ষ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ধারণা বলে বর্তমানে কোন কিছু নেই। রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের যান্ত্রিক ধারণা, তাত্ত্বিক গঠন, বাস্তব নিরীক্ষা এ সবকিছুই পাশ্চাত্য খ্রিস্টবাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার রঙ্গে রঞ্জিত, যা আবার মর্মমূলের দিক থেকে সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। এ ধরনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান মুসলিম সমাজে চাহিদা ও প্রয়োজনীতা মেটাতে পারে না এবং তার ফলে এটা মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক শিকড় গড়তে পারে না।

ইসলামী মূল্যবোধের পরিধির মধ্যে থেকে ইসলাম জ্ঞানের অনুসন্ধানের তাগিদ প্রদান করে। এটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণকে সঠিক পন্থা বলে মনে করে না। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্যের ও লক্ষ্যের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সামগ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং সামগ্রিকতা হবে মূল্যবোধের রসে জারিত ও সঞ্জীবিত। কুরআন ও সুন্নায় যা আছে এবং মদীনার রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে মূল বৈশিষ্ট্য ও চেতনা বিদ্যমান, তা ইসলামী রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার ভিত্তি। তার আলোকেই সকল জ্ঞান ও বাস্তব প্রচেষ্টা পরিচালিত হবে। যেখানেই মানবিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, সেখানেই নৈতিক চেতনার প্রশ্নটিও রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাই মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ও বিবর্জিত কিছু হতে পারে না। ইসলাম গুরুত্বের সাথে ঘোষণা করে যে, রাজনীতির নৈতিক লক্ষ্য থাকতে হবে এবং সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন, ব্যক্তি ও গ্রুপের নৈতিক দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে হবে। রাজনীতি ও নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবক্ষয়িত বিশ্বে এ শিক্ষাটিকে ফিরিয়ে আনতে হলে এটিকে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে।

ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে মানবজাতির উপর স্রষ্টার অর্পিত একটি দায়িত্ব ও দান। এ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে প্রত্যাদেশ ও যুক্তি হতে, পর্যবেক্ষণ ও স্বজ্ঞা থেকে, ঐতিহ্য এবং তাত্ত্বিক ভাবনা থেকে। রাজনৈতিক চিন্তনের এ বহুমুখী পন্থা ও পদ্ধতিকে অবশ্যই ঐশী প্রত্যাদেশের চিরন্তন মূল্যবোধের অধীন হতে হবে। জ্ঞানের অনুসন্ধানকে সম্পৃক্ত হতে হবে কুরআন প্রদত্ত ধারণা তাওহীদ, খিলাফত, ইবাদত, ইলম, আদল, *ইসতিসলাহ* বা জনকল্যাণ ইত্যাদির সাথে। ইসলামের চিরন্তন মূল্যবোধের পরিধি কাঠামোর মধ্যে থেকে জ্ঞানের অন্বেষণ করলে তা মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খিলাফতের মর্যাদা ও তাৎপর্য প্রদান করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ এবাদতের পর্যায়ে উন্নীত হয়। অন্যকথায় এসব ইতিবাচক কর্মকাণ্ড অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে হারাম কাজ জুলুম ও দা'য়া বা অপচয়কে পরিহার ও পরিত্যাগ করে।

কুরআনে বিধৃত মূল্যবোধসমূহ ইসলামকে একটি সার্বজনীন চরিত্র প্রদান করেছে। ইসলামী মুল্যবোধসমূহের চিরন্তনতা ইসলামী পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে জ্ঞানের যে অন্বেষা ও অনুসন্ধান পরিচালিত হয় তাকেও বিশ্বজনীন মর্যাদা প্রদান করে। মুসলিম জাতি যাকে ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার ইসলামী কাঠামোর মধ্যে থেকে জ্ঞান চর্চা করা ব্যতিরেকে স্থায়ী কোন শুভ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শরীয়াহ্ : ইসলামী আইনব্যবস্থা

শরীয়াহ হচ্ছে ইসলামের মূল শিকড়, মানুষের জন্য বিধাতার প্রদত্ত জীবন বিধান। এটি হচ্ছে ইসলামের সমাজ-রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণের হাতিয়ার। ঐশী উৎসমূল হতে উৎসারিত শরীয়াহ হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্বরূপ, যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুমোদন ও ভিত্তিমূল হিসাবে কাজ করে। ইহা মুসলমানদের নিজেদের অভিষ্ট লক্ষ্যের ও মন্‌জিলে মকসুদের দিকে সতত ধাবিত করে।[১]

তবে শরীয়াহ্'র ধারণাকে এমনভাবে ভুল ব্যাখ্যা, ভ্রান্তির শিকার ও অপব্যাখ্যা করা হয়েছে যে শুধুমাত্র ইসলাম বিদ্বেষীদের মধ্যেই নয় বরং পাশ্চাত্যকৃত মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজেও এ সম্পর্কে ভীতি, বিদ্বেষ ও বিদ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কাছে শরীয়াহ হচ্ছে সেকেলে ও মধ্যযুগীয়, যাতে অতীত যুগের ধ্যান-ধারণা ও তৎকালীন সমাজ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে এবং বর্তমান যুগের বাস্তবতার সাথে এর কোন সংযোগ ও সামঞ্জস্য নেই; তাই একে বাতিল, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতুন আইন ও বিধি রচনা করতে হবে যা বর্তমান যুগের চাহিদা মেটাবে। পাশ্চাত্য মানসে ক্রুসেডের সময় হতে উদ্ভূত তিক্ত অভিজ্ঞতা, পশ্চিমা মননে শরীয়া বিষয়ে নানা ভুল ধারণা, শরীয়া সম্পর্কে বিরাজিত বিরুদ্ধতা ও বিদ্বেষের জন্য অংশত দায়ী। মুসলিম সমাজে বিদ্যমান অন্ধ গোঁড়ামী ও অপসংস্কারমূলক রক্ষণশীলতা যেমন একদিকে এর জন্য দায়ী, অন্যদিকে মুসলিম ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসকবর্গ কর্তৃক নিজেদের হীনস্বার্থে শরীয়ার অপব্যবহারও এর জন্য সমভাবে দায়ী। তাই সময়ের প্রয়োজন ও দাবী হচ্ছে ইসলামের এই মৌল ভিত্তির ধারণাগত বৈশিষ্ট্য, উৎসমূল, মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী ও চারিত্রিক লক্ষণসমূহকে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা।

প্রধানত: আইন, শরীয়াহ্, ফিকাহ ও ইসলামী অনুশাসনের ক্ষেত্রে অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে এসব পরিভাষার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, সে বিষয়ে এবং বিভ্রান্তিমূলকভাবে এসব পরিভাষাকে সমার্থক ও পরস্পরের বদলিযোগ্য হিসাবে যেভাবে গণ্য করা হয় সে সম্পর্কে বিরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শরীয়াহ্ ও আইন

শরীয়াহকে প্রায়শই মুসলিম-অমুসলিম নির্বেশেষে সবাই চিরকালীন মহাপবিত্র ইসলামী আইন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্যমণ্ডলে 'আইন'কে যে অর্থে ব্যবহার

করা হয়, তার সাথে 'শরীয়াহ'র ধারণাকে জড়িয়ে ফেলা বিভ্রান্তিমূলক। অনেক তত্ত্বের মধ্যে আইন সম্পর্কিত কতিপয় তাত্ত্বিক তত্ত্ব আর উৎস থমাস হবস এবং পরবর্তীতে আরো শক্তিশালীভাবে জন অস্টিন ও ক্যালমেন কর্তৃক উপস্থাপিত হয়ে পাশ্চাত্যে বহুলভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তারা আইনকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির আদেশ ও অনুশাসন হিসেবে দেখে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এহরলিচ এর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় এই ধারণাকে আরো প্রসারিত করে এর মধ্যে শুধুমাত্র রাষ্ট্র যা কিছু প্রণয়ন করেছে তাই নয় বরং রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদিত ও বলবৎ সামাজিক নিয়মনীতি, আচার পদ্ধতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন প্রণয়ন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনের জন্য পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নতা সত্ত্বেও আইনকে 'আচরণ বিধি' হিসাবে দেখা হয়। পাশ্চাত্যের মতে নৈতিকতার সাথে আইনের কোন সম্পর্ক নেই আইন কি রূপ হওয়া উচিৎ সেভাবে নয়, বরং কি রূপে এটা রয়েছে সে নিরিখেই তাকে দেখে থাকে। আইনের এই সংজ্ঞা শরিয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য নয়। কেননা শরীয়ায় আইনগত দিকের চেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইন হচ্ছে স্রষ্টার ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য একটি সামগ্রিক নৈতিক ও সামাজিক নির্দেশনা। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে এটি পরিব্যপ্ত এবং তা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাসহ সামাজিক ও অপরাধমূলক ব্যাপারেও প্রযোজ্য। ইসলামে আইনের মর্মবস্তু হচ্ছে মান নির্ধারক চরিত্রের এবং নৈতিক শিক্ষা ও আইনগত প্রয়োগ হচ্ছে এর লক্ষ্য। মুসলিম পণ্ডিত ও আইনজ্ঞরা একে 'আইন' বলে অভিহিত করেন কারণ তাঁরা ঐশী প্রত্যাদেশকে স্রষ্টার আদেশ বলে ধারণা পোষণ করেন, আল্লাহর খলিফা হিসাবে আল্লাহর আদেশের প্রতি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এ জগতের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব *(আমানাহ)* পালনের ক্ষমতা মানুষকে প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সে তার ঐশীসত্ত্বাকে পূর্ণতা দান করে এবং পরজগতে তার ভাগ্যকে নির্মাণ করে। অন্যকথায় বিশ্বাসভাজন বা আমানতদার হিসাবে মানুষের আচরণ বিচার দিবসে ঐশী বিচারের নিক্তিতে নির্ণয় করা হবে এবং মানবজীবনের কার্যকলাপের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের 'আইনগত' ফলাফল এবং দায়িত্বশীলতা রয়েছে, যা শরীয়ার 'আইনসঙ্গতার' পর্যাপ্ত যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে।

উপরের আলোচনা হতে আইন সম্পর্কে পশ্চিমা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐশী ইচ্ছার প্রতিফলন হিসাবে শরীয়াহ আইনের রূপ পরিগ্রহ করেছে, অন্যদিকে পশ্চিমা আইন মানব-মননের সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত পশ্চিমা আইন ও পদ্ধতি সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জন্মলাভ করেছে এবং সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে আইনেরও পরিবর্তন ঘটে। ইসলামী আইন, যা সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটের উর্ধ্বে,

তা ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজকে পরিবর্তন ও বিন্যস্ত করে। তৃতীয়ত পশ্চিমা আইন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইসলামী আইন অধিকন্তু স্রষ্টার সাথে মানুষের এবং নিজের বিবেকের সাথে সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বশেষে, সামাজিক আচরণের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পশ্চিমা আইনের ভূমিকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তথা রাষ্ট্র, ধর্ম, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এবং এদের দ্বারা সীমাবদ্ধ। পশ্চিমা আইন তাই কার্যত মানব চরিত্র গঠন ও মানুষের সম্ভাবনার বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। ব্যক্তি মানুষকে সমাজের গ্রহণযোগ্য সদস্য হিসাবে পরিণত করতে এবং তাকে সফল মানুষে রূপান্তরের সহায়তাদানে পশ্চিমা আইনের ভূমিকা সীমাবদ্ধ।[২]

পক্ষান্তরে সমাজের উপর ইসলামী আইনের সুদূরপ্রসারী ও সর্বব্যাপ্ত প্রভাব রয়েছে কেননা এটি হচ্ছে আইনগত ও নৈতিকতা সম্পন্ন একটি সার্বিক ব্যবস্থা। শরীয়াহ মানুষের অন্তর্চেতনা দ্বারা চালিত এবং এটি মানুষের বিবেকবোধের উপর কাজ করে।[৩] শরীয়ার কিছু অংশের কার্যকারিতার জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বে অনুমোদন প্রয়োজন হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ দ্বারা চালিত। কার্যকর ও প্রয়োগ করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ না থাকলেও বিশ্বাসী মানুষ শরীয়াহর নৈতিক চালিকাশক্তি দ্বারা চালিত হয়।

শরীয়াহ ও ফিকাহ

'শরীয়াহ'কে প্রায়শই 'ফিকাহ' এর সমার্থক হিসাবে ভুল করা হয়। শব্দ দু'টি যদিও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একই সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবুও ধারণা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৪] উৎসের দিক থেকে শরীয়াহ হলো ঐশী তথা আল্লাহর নির্দেশ আর ফিকাহ হলো কুরআন সুন্নাহের ভিত্তিতে মানুষের রচিত বিধি বিধান: যা ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনগত বিচার বিশ্লেষণ, অবরোহ অনুমান, ক্লাসিকেল আইন শাস্ত্রের (উসুল) অন্যান্য নীতিমালা ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রণীত হয়ে থাকে। অধিক যুক্তিযুক্তভাবে ফিকাহকে প্রায়োগিক শরীয়াহ বলা যায় যেহেতু ঐশী ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত ও প্রায়োগিকভাবে ফিকাহ প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর ঐশী নির্দেশনাকে সাধারণভাবে প্রয়োগের জন্য ফিকাহ হচ্ছে মানব রচিত বিধি বিধান বা কোন বিশেষ ঐশী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রায়োগিক ব্যাখ্যা। দেখা যায় আইনজ্ঞদের প্রণীত অনেক বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপেডিয়াতে শরীয়াহ ও ফিকাহ একই বন্ধনীতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্টিকরণের জন্য যে গুরুত্বারোপের প্রয়োজন, তা হলো ফিকাহ শরীয়াহ হতে বাইরের কিছু নয়, তবে শরীয়াহ ও ফিকাহ অভিন্নও নয়। কুরআন সুন্নায় বিধৃত নীতিমালা, ধারণা ও আইনের সমন্বিত সমাহার 'শরীয়াহ' হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, মহা পবিত্র ও চিরন্তন। মুসলিম আইনজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ শরীয়ার উপলব্ধির ভিত্তিতে রচিত 'ফিকাহ' যুগের সাথে পরিবর্তনশীল এবং এর কোন চিরন্তন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এতদসত্ত্বেও ফিকাহ্ হচ্ছে আইনগত প্রাজ্ঞ বিধি বিধান রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশাল অর্জন যা সব সময় ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্তির উৎস হয়ে থাকবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আইনের দু'টি মৌলিক উপাদান রয়েছে ঃ

ঐশ্বরিক উৎস যা আল্লাহ ও রাসূল (সা) কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ) এবং তা শব্দের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্যে 'শরীয়াহ' হিসাবে বর্ণিত; আর শরীয়াহর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হিসাবে মানব রচিত বিধিবিধান, যা 'ফিকাহ' বা প্রায়োগিক শরীয়াহ হিসাবে আখ্যায়িত।[৫]

এভাবে শরীয়াহ হচ্ছে ঐশ্বরিক, আর ফিকাহ হচ্ছে মানব রচিত; প্রথমটি চিরন্তন এবং শেষোক্তটি পরিবর্তনশীল। ঐশী শরীয়াহ্ হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, আর মানব রচিত ফিকাহ্ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনযোগ্য। এটি শরীয়াহ'র অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

শরীয়ার সংজ্ঞা

শরীয়াহ হচ্ছে একটি আরবী শব্দ যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পানির আধার বা জলাশয়ের দিকে যাবার পথ বা সড়ক। ঐশী বিধান ব্যবস্থার আঙ্গিকে এর অর্থ 'জীবনের উৎসের দিকে যাবার পথ'। বস্তুত ইসলামে এর অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক আল্লাহর রাহের বর্ণনা। এর ধাতুগত শব্দটি হচ্ছে 'শারা' যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "রাস্তা নির্মাণ', তবে ধারণাগতভাবে এটা আইন প্রণয়ন বা একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা বোঝায়। ফলে এর বিভিন্ন ব্যুৎপন্ন শব্দসমূহ যথা 'আ-শরীয়াহ', 'তাসরী', 'শারী' ইত্যাদি অর্থের দিক থেকে প্রণীত আইন, বিধি-প্রবিধি এবং আইন প্রণেতা বা আইন দাতা ইত্যাদি বোঝায়।[৬]

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ দু'টি ভিন্ন, কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত অর্থে সাধারণ শরীয়াহর ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বৃহত্তর অর্থে, শরীয়াহ বলতে আল্লাহ হতে প্রেরিত সকল প্রত্যাদেশ যা সৃজনকারী আল্লাহর সাথে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক, ব্যক্তির নিজের সাথে মানুষের নিজের সম্পর্ক, অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং মানুষের চারপাশের সবকিছু যথা সকল সম্পদ, সমৃদ্ধি ও আশীর্বাদ যা কিছু মানুষের আয়ত্বে প্রদান করা হয়েছে- সামগ্রিকভাবে এসব কিছুর পরিচালনার নিয়মনীতি বোঝায়।[৭]

এটা হচ্ছে মহানবী (সা) এর নিকট নাজিলকৃত ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বাসী মানুষের চিন্তাধারা, কর্ম ও সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রদত্ত আইনগত ব্যবস্থা। এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র এবং সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী সামাজিক ব্যবস্থা। যেথায় কোন বাহুল্য বা অপূর্ণাঙ্গতা বলে কিছু নেই।[৮]

এ হচ্ছে এমন এক 'পদ্ধতি পথ' যা মানব জীবনকে সামগ্রিকভাবে বেষ্টন করে আছে। এ অর্থে কুরআন মহানবী (সা) কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ঃ

অতঃপর আমরা তোমাকে (হে মোহাম্মদ) সকল বিষয়ে (তোমার দ্বীন) পথ (শরীয়াহ) প্রদর্শন করেছি; এই প্রথা অনুসরণ কর এবং যারা অজ্ঞ তাদের পছন্দ-অপছন্দকে অনুসরণ করোনা।

আল কুরতুবী'র মতে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে শরীয়াহ শব্দটি দ্বারা 'তাওহীদ', 'ইবাদত', মুয়ামালাত বা লেনদেন বিধি ও অন্যান্য সকল পূণ্যময় কার্যাবলী সম্বলিত মানব জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে বোঝান হয়েছে।[৯]

শরীয়াহ তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাসী মানুষদের জীবন নিয়ন্ত্রণকারী ঐশী প্রত্যাদেশের সমাহার, যা তার ইহকালীন জীবনের কল্যাণ ও পরকালীন জীবনের মুক্তি নিশ্চিত করে। ইহা ব্যক্তি মানুষের প্রার্থনা-আরাধনার পদ্ধতি প্রদান করেছে এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ও নৈতিকতার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের সামষ্টিক জীবন যাতে রয়েছে পরিবার সম্পর্ক, আর্থ-সামাজিক বিষয়, নাগরিকের কর্তব্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মত বিষয়াদী– যেসব বিষয়ে শরীয়াহ নির্দেশনা প্রদান করেছে।[১০] এটা হচ্ছে সুবিন্যস্ত একটি ব্যবস্থা, একটি সামঞ্জস্যশীল সামগ্রিকতা- যা মানব জীবনের সকল দিককে বেষ্টন করেছে।

এ প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করা যায় যে, 'দ্বীন' ও 'ইসলাম' শব্দদ্বয়ের সাথে শরীয়াহকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দ্বীনের অর্থ আল্লাহপাকের কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য; আল্লাহর আদেশ মনে-প্রাণে গ্রহণ করে মুখে উচ্চারণ করা এবং আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ পূর্ণভাবে মেনে চলা।[১১] আভিধানিকভাবে শরীয়াহ'র অর্থ 'জীবন বিধান' যা বিশ্বাসী মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ পাককে সকল ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতার অধিকারী মনে করে তাঁর কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং জীবনের সকল প্রকার আচরণ ও কার্যকলাপের জন্য তার কাছে জবাবদিহিতায় আবদ্ধ থাকে।[১২] ইসলাম হচ্ছে বর্ণিত এই দ্বীনের নাম, আর শরীয়াহ হচ্ছে ঐ ঐশী জীবন বিধান যার মাধ্যমে কেবলমাত্র আল্লাহপাকের আরাধনা করা হয়। ফজলুর রহমান শরীয়াহকে 'ঐশ্বরিকভাবে স্থিরকৃত পথ' হিসাবে ভাষান্তর করেছেন- এ আলোকে যে শরীয়াহ ঐশ্বরিক উৎস থেকে আগত এর রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিক ও উদ্দেশ্য। বস্তুত কুরআনে 'শরীয়াহ শব্দের চেয়ে 'দ্বীন' ও 'ইসলাম' শব্দদ্বয় অনেক বেশীবার উল্লেখিত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে শরীয়াহ শব্দটির প্রচলন হয়েছে।[১৩] এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কেননা প্রারম্ভিক সময়ে শরীয়াহ বোঝাতে ইসলাম ও দ্বীন শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হত।

শরীয়াহ অনেক সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; যার আওতাধীন বিষয়াদী হচ্ছে ধর্মীয় মতাদর্শ ও আনুষ্ঠানিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়াদি, অপরাধ ও শাস্তি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ব্যবসায়িক আদান-প্রদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ও আচরণবিধি। আল তাবারীর মতে শরীয়াহ সম্পত্তির উত্তরাধিকার, 'হাদ্' শাস্তি, আদেশ ও নিষেধাত্মক

নির্দেশনা সমন্বয়ে গঠিত।[১৪] এসব আইন ও বিধি সংক্রান্ত কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহকে 'আয়াত আল আহকাম' বলা হয়। আধুনিক পরিভাষার আলোকে শরীয়াহর অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি। এগুলো প্রয়োগের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। কুরআনুল করীমে এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা খুব কম। যার সংখ্যা ৫০০ আয়াতের বেশী হবে না। আবদ্ আল- ওয়াহ্হাব-খাল্লাফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনে পারিবারিক বিষয়ে ৭০টি আয়াত, দেওয়ানী বিষয়ে ৭০টি আয়াত, ফৌজদারী বিষয়ে ৩০টি আয়াত এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ে ১০টি আয়াত রয়েছে।[১৫] এ ধরনের সংখ্যা নির্ধারণকে আনুমানিক ধরে নিতে হবে কেননা আল কুরআনের কতিপয় নির্দেশনাবলীর আইনগত তাৎপর্য তর্কসাপেক্ষ ও দ্ব্যর্থবোধক এবং এমন অনেক আদেশ রয়েছে যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।[১৬]

অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলিম-ফিকাহবিদ বা আইনবিশারদগণ এসব 'আহকাম'এর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের সময় শরীয়াহর মৌলিক প্রকৃতিকে বিবেচনায় রেখেছেন। অন্য কথায় এসব আহকামের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই এবং সামগ্রিক ইসলামী জীবন বিধানের প্রেক্ষিতে বহির্ভূতভাবে এসবের মর্ম বোঝা যাবে না বা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি এজন্যই যুক্তিযুক্ত যে চুরির জন্য হাত কাটার কানুনী শাস্তি, ব্যভিচারের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি নির্দেশাবলী বিশেষ শর্তাধীন। জি.এইচ জেনসেন মন্তব্য করেছেন যে, এসব 'শর্তাবলীকে 'অজুহাত' হিসাবে মনে করার কোন কারণ নেই।[১৭] বরং এসব শর্ত শরীয়াহর ঐ মর্মবস্তুকে উৎঘাটিত করে যে চরম লক্ষ্য হচ্ছে উঁচুমানের সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণকে মিথ্যা বা সাক্ষ্যপ্রমাণহীন অসমর্থিত অভিযোগ আনয়ন থেকে বিরত রাখা।

সংক্ষেপে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, শরীয়াহ মানুষের সর্বাধিক আচরণ ও চিন্তাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর আওতাভুক্ত রয়েছে সকল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়াবলী এবং প্রত্যেক কাজের পশ্চাতে মানুষের নিয়ত। আল কুরআনের আয়াত ১৬:৮৯ এ বর্ণিত হয়েছে যে :

'আমরা কিতাব নাজিল করেছি যাতে তোমরা সকল বিষয় সম্যকভাবে বুঝতে পার এবং যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের জন্য ইহা দিক নির্দেশনা, দয়া, ক্ষমা এবং সুসংবাদ।

শরীয়াহ'র উৎস

শরীয়াহ ও ফিকাহ-এর ভিন্নতার প্রেক্ষিতে ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : মুখ্য ও গৌণ।

মুখ্য উৎসসমূহ

কোরআন ও সুন্নাহ্ হচ্ছে শরিয়ার মুখ্য উৎস। এ দু'টি শরীয়ার ভিত্তি ও নির্যাস। বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী (সা) বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ তোমরা এ দুটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক : তা হলো আল্লাহ'র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"[১৮]

কুরআন হচ্ছে শরীয়াহর প্রধান উৎস। কোরআন শাব্দিকভাবে আল্লাহ্ পাকের কথা, মহাপবিত্র, অতুলনীয় ও অননুকরণীয়। কুরআন খণ্ড খণ্ডভাবে নাজিল হয়েছে, যাতে এর অর্থ পূর্ণভাবে অনুধাবন এবং প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা যায়, দৃঢ়ভাবে এর মূল্যবোধ সমূহ আয়ত্ব করা যায় এবং যাতে ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে এর বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।[১৯] প্রত্যাদিষ্ট এই কিতাব আদি আকৃতিতে এর প্রতিশব্দ অবিকল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সর্বকালের দিক নির্দেশনার উৎস হিসাবে সংরক্ষিত রয়েছে। চিরন্তন ও বিশেষ আহ্বান ও আদেশ যা সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট (মুবীন) ও মহিমান্বিত (আ'লী) ও পবিত্র। এসবের সমন্বয়ে শরীয়াহ ইসলামের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেছে। ঐশ্বরিক বিধায় বিশ্বাসীদের জন্য শরীয়াহ চিরন্তন, মহাপবিত্র, শর্তহীনভাবে বাধ্য বাধকতামূলক এবং অপরিবর্তনীয়।

"যে আমার নির্দেশ মেনে চলে সে কখনো বিপথগামী হবে না, সে সমৃদ্ধিহীনও হবেনা। আর যে আমার স্মরণ হতে পরান্মুখ হবে, সে এক সংকীর্ণ জীবন প্রাপ্ত হবে এবং শেষ বিচারের দিন তাকে আমরা অন্ধ হিসাবে উত্থিত করব।" (২০:১২৩-২৪)"

কুরআনে তিন ধরনের নির্দেশ রয়েছে ঈমানের বিষয়াবলী, নৈতিক ও আইনগত অনুশাসন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধিবিধান। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কুরআনের বিষয়াবলীর বৃহদাংশই নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত। আইনগত বিষয়াবলী সমগ্র কুরআনের ১০ ভাগ মাত্র। ফলশ্রুতিতে এভাবে মানবজাতি 'ইজতিহাদ' 'শুরা' ও 'ইজমা'র মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নিষ্পন্নের বৃহত্তর সুযোগ লাভ করেছে।[২০]

মহানবী (সা) এর জীবনের সকল কর্ম, উক্তি, তাঁর মৌন সম্মতির নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সমন্বয়ে সুন্নাহ গঠিত। প্রথম দিকে সুন্নাহ্ ও হাদীস ভিন্ন বিষয় হিসাবে বিবেচিত হত। সুন্নাহ্ বলতে মহানবী (সা) এর কৃত কার্যকলাপ ও আচরণ বোঝাতে আর হাদীস বলতে তাঁর নিকট হতে সাহাবীদের শোনা উক্তি বোঝাত। তবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র সুন্নাহ্ এমন বিস্তৃতভাবে হাদীস রূপে বর্ণিত হলো যে, হিজরী পাঁচ শতকে উভয় শব্দ সম্পূর্ণ সমার্থকে পরিণত হল।[২১] ছয়টি 'সিয়াহ' (নির্ভরযোগ্য) এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে সুন্নাহ্ শরীয়াহর দ্বিতীয় মৌলিক উৎসে পরিণত হল।

ইবনে কাইয়িম আল-জাযিয়াহ সুন্নাহ্ কেন আল কোরআনের তুলনায় গৌণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে :

"কুরআন হচ্ছে চূড়ান্ত ও পরম সামগ্রিক ও বিস্তারিতভাবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বধারী; কিন্তু বিস্তারিত বিশ্লেষণে সুন্নাহ কুরআনের মত চূড়ান্ত, পুংখানুপুংখ সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল নয়-

একে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে অবলোকন করতে হবে। কুরআনের সাথে সুন্নাহর তিনটি সম্ভাব্য সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, সুন্নাহ বিশেষ প্রসঙ্গে হুবহু কুরআনের অনুসরণ করে এবং পরস্পর সমার্থকভাবে বিষয়টি উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুন্নাহ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এবং তৃতীয়ত সুন্নাহ এমন সব বিষয়ে বিধান প্রদান করে যেখানে কুরআনের বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। কুরআনের পরিপন্থি হবার কোন সুযোগ সুন্নায় নেই।"[২২]

সুন্নাহর কর্তৃত্ব উৎসারিত কুরআনের উৎস হতে যে আল কুরআন মহানবী (সা)কে প্রত্যাদিষ্ট রাসূল (সা) রূপে আখ্যায়িত করেছে (৬৩: ৩-৪)। তাঁর উপর মহা দায়িত্বপূর্ণ ভার পবিত্র গ্রন্থ (কুরআন) ও বাণী (ইসলাম) অর্পিত হয়েছে। কুরআন তাঁকে কুরআন মজিদের ব্যাখ্যাকারী ও হিতোপদেশ প্রদানকারী শিক্ষক (১৬ : ৪৪); মহান গুরু ও পথ প্রদর্শক (৩:৪৮); শাসনকর্তা, আইনপ্রণেতা ও বিচারক (৪৪:৫৯) এবং বিশ্বাসীদের জন্যে অনুসরণযোগ্য 'মহা আদর্শিক নমুনা' হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। সুন্নাহ তাওহীদের বাস্তব প্রতিফলন এবং এর ভিত্তি হচ্ছে কুরআনের চিরন্তন বাণী। তজ্জন্যই কুরআন ঘোষণা করেছে," যে রাসূল (সা)কে মান্য করেছে, সে আল্লাহ মান্য করেছে।" (৪:৮০) এবং নবী (সা) তা নিশ্চিত করে বলেছেন, যে আমাকে অনুসরণ করেছে সে আল্লাহকে অনুসরণ করেছে আর যে আমাকে অমান্য করেছে সে আল্লাহকে অমান্য করেছে।"[২৩]

স্পষ্টতই, আল্লাহর আদেশ নির্দেশনা সমূহ মানবজাতির কাছে দু'ভাবে এসেছে : কুরআন ও সুন্নাহ (মহানবী (সা) এর আদর্শ জীবনাচরণ)। সুন্নাহকে 'অন্য' উৎস হিসাবে দেখা ঠিক নয়, বরং তা আল কুরআনে বিধৃত রাসূল (সা) এর নীতিমালার কথা ও কাজের মাধ্যমে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বৃত্তান্ত। কুরআন হচ্ছে আত্মা আর সুন্নাহ তার দেহ; প্রথমটি দিয়েছে নীতিনির্দেশনা আর শেষোক্তটি প্রথমোক্তটির ব্যাখ্যা ও জীবন যাত্রার বাস্তবায়ন। দু'টি মিলে গঠিত হয়েছে সার্বভৌম আল্লাহর সর্বোচ্চ আইন ও বিধান, যাকে ইসলামী পরিভাষায় শরীয়াহ বলা হয়।

গৌণ উৎসসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহয় বিধৃত ঐশী ইচ্ছা অনুধাবন ও কার্যকর করণের জন্য মুসলিম আইনবিদগণ যে সব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার ও অনুসরণ করেছেন তা শরীয়াহর গৌন উৎস। সমকালীন মুসলিম পণ্ডিতগণ এ সমষ্টিকে 'ইজতিহাদ' অভিধায় অভিহিত করেছেন।

'ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ 'প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, বা প্রয়োগ', কিন্তু তাৎপর্যের দিক হতে এর অর্থ হচ্ছে সাধারণ নীতিমালা (কাওয়াইদ) এবং আইনগত সাক্ষ্য প্রমাণের (আদিল্লাহ) সহায়তায় ইসলামের অনুশাসন ও মর্মবাণী অনুধাবনের চূড়ান্ত চেষ্টা। মোহাম্মদ ইকবাল ইজতিহাদকে একজন বিশেষজ্ঞের 'একটি আইনগত বিষয়ের উপর

স্বাধীন বিচারিক রায় প্রদানের' ব্যক্তিগত চূড়ান্ত প্রচেষ্টা মর্মে অভিহিত করেছেন।[২৪] ইজতিহাদের মাধ্যমে উপনীত সিদ্ধান্ত কখনো শরীয়াহর পরিপন্থী হতে পারবে না বা শরীয়াহর স্পষ্টতাকে ঘোলাটে করতে পারবে না এবং কেবলমাত্র যখন কোন প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় কোন নির্দেশনা পাওয়া যাবেনা, কেবল তখনই ইজতিহাদ প্রয়োগ করা যাবে। যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী ইজতিহাদে অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতির বিদ্যমান জ্ঞান (অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ) এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদ উভয় শাস্ত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইজতিহাদী প্রক্রিয়ায় ঐশী প্রত্যাদেশকে যুক্তিবাদের উপরে স্থান দেয়া হয় এবং তার ভিত্তিতেই ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সুসংবদ্ধ নিয়ম নীতি ছাড়া ইজতিহাদ পরিচালনা করা হলে নানা ধরনের মতামত সৃষ্টি হতে পারে। মুসলিম আইন শাস্ত্রবিদগণ তাই ইজতিহাদ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে 'কিয়াস' (সাদৃশ্যমূলক যুক্তিবাদ) নামক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। 'কিয়াস' হচ্ছে ঐশী উৎসে বর্ণিত সমরূপ কোন উদ্ধৃতির আলোকে বিবেচ্য অনুরূপ বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা ও পদ্ধতি।

যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ইজতিহাদ পণ্ডিতবর্গ (উলেমা) অথবা মুসলিম উম্মাহর সাধারণ সম্মতি বা ঐকমত্য অর্জন করে, তখন তা যে মর্যাদা লাভ করে তাকে 'ইজমা' বলে। ইজমা হচ্ছে শরীয়াহর শিক্ষার মনোপলব্ধি, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, যা উম্মাহর সাধারণ ঐকমত্যের মাধ্যমে নির্ণিত হয়। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিশেষভাবে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তের সাথে উম্মাহর সাধারণ ঐকমত্যের সংযোগ সাধন করে। ইজমার দ্বিবিধ তাৎপর্য রয়েছে : প্রথমত: এটা ব্যক্তি মানুষের লাগাম ছাড়া গবেষণার রেশ টেনে ধরে, দ্বিতীয় সৃজনশীল ব্যক্তি গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার গ্রন্থিমোচনে উম্মাহর সাধারণ স্বীকৃতি এনে দেয়।

খুররম মুরাদের মতে যে কোন ঐকমত্য "যা চার খলিফা ও সাহাবাদের সময় হতে ঐতিহাসিক ক্রম বিবর্তনতায় চলে আসছে, তা মান্য করা বাধ্যতামূলক বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।"[২৫]

খোলাফায়ে রাশেদার ধর্মপরায়ণতা, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে তাদের নৈকট্য, শরীয়াহ সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান, কঠোর মোত্তাকী (ধর্মানুসারী) প্রথম চার খলিফার নেতৃত্ব, শরীয়াহ সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান অনুসরণের কারণে ঐ সময়ে যে সব ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও কর্তৃত্বপূর্ণ। খোলাফায়ে রাশেদার যুগের অবসানের পর ঐক্যমত স্থাপনের জন্য শুরা'র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার ভাঙ্গনের ফলে কোন বিষয়ে ইজমা অর্জন কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এসব হলো জোরালো নজীর এবং সমাজ ও মানবিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলি পুন:পরীক্ষার আওতায় আসে। লক্ষণীয় যে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার কতিপয় বিষয়ের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলিম উম্মাহর কোন মৌলিক বিষয়ের উপর এখন আর কোন চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন অনেক বিষয়ের উপরও "আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন মতাদর্শের বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।"[২৬] বিভিন্ন মতাদর্শপন্থী আইনশাস্ত্রবিদগণ নতুন আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা উদ্ভাবন করেছেন। এ সবের উদাহরণ হচ্ছে মূলগ্রন্থে কোন বিষয়ে কোন নির্দেশনামূলক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

ক. ইসতিহসান (আইনগত অগ্রাধিকার) : আইনজ্ঞ কর্তৃক এমন পদ্ধতির অনুসরণ যাকে তিনি সাদৃশ্যমূলক নজীর (কিয়াস) হতে উত্তম বিবেচনা করেন।

খ. ইসতিসলাহ (জনকল্যাণ) বা এমন একটি পথের অনুসরণ যা জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ আনয়ন করবে।

গ. ইসতিসহাব (চলমানতা বা কার্যকারিতা) পূর্বে প্রচলিত একটি আইনগত বিষয়ের ধারাবাহিকতা, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে এর বর্তমানে কোন প্রযোজ্যতা বা কার্যকারিতা নেই, নতুনভাবে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

উরফ (প্রথা বা প্রচলন) : কোন সমাজের প্রচলিত প্রথা যা শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে শরীয়াহর মুখ্য উৎস। কিয়াস ও ইজমা শরীয়াহ'র দ্বিতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃত। সমকালীন মুসলিম পণ্ডিতবর্গ দ্বিতীয় উৎস ও অন্যান্য পন্থাকে ইজতিহাদের শ্রেণীর্ভুক্ত করেছেন। দ্বিতীয় উৎস হতে উৎসারিত আইনসমূহও বৈধ কেননা চূড়ান্ত বিশ্লেষণ উদ্ভূত এসব আইনের শিকড় মুখ্য উৎসে তথা কোরান ও সুন্নায় প্রোথিত।

ইজতিহাদের উত্থান ও পতন

ইকবালের মতে "ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামের গঠনশৈলীতে অগ্রসরতার নীতি।[২৭] ইহা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী বিধানকে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে এবং শরীয়ার সীমারেখার মধ্যে যুগের সাথে ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখে। বস্তুত ইহা শরীয়াহর গতিশীলতার অন্যতম মৌলিক উপাদান।

ইজতিহাদের নীতির উৎস হচ্ছে– কুরআনের বহু পরিচিত এ আয়াত, "এবং যারা চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, তাদের আমরা পথ প্রদর্শন করি।" (১৯:৬১)। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি সুপ্রসিদ্ধ। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) যে বিষয়ে কোরআন-হাদীসে কোন দিকনির্দেশনা নেই সে বিষয়ে মুয়ায ইবনে জাবালের ইজতিহাদ প্রয়োগের ইচ্ছাকে অনুমোদন করেছিলেন।

ইসলামের সীমানা বৃদ্ধির সাথে সাথে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবী এবং পরবর্তীতে সাহাবীদের শিষ্যরা নতুন নতুন পরিস্থিতি এবং সমাজ-রাষ্ট্রীয় নানা নতুন জটিলতা নিরসনের জন্য ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ প্রয়োগ করেছিলেন। ইজতিহাদের নীতি জীবনের প্রগতিশীল পরিস্থিতিতে অপরিহার্য মর্মে উপলব্ধি করে ইসলামী আইনজ্ঞগণ বাস্তবজীবনের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ প্রয়োগ করেন। ইজতিহাদের

বিষয়টি একটি হাদীসে সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এখানে বলা হয়েছে কেউ যদি ভাল সহীহ্ নিয়তে ইজতিহাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তাতে ভুলও করে তবুও আল্লাহ খুশী হন; আর যদি সফল হয়, তবে আল্লাহ দ্বিগুণ খুশী হন।

মহান ইসলামী আইনবিশারদ আবু হানিফাহ (হিজরী ৮০-১৫০ সন/৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.); মালিক ইবনে আনাস (হিজরী ৯৭-১৭৯ সন/৭১৬-৮০১); মোহাম্মদ ইবন ইদরীস আল সাফীঈ (হিজরী ১৫০-২০৪/৭৬৭-৮২০ খ্রি.) আহমাদ ইবনে হানবাল (হিজরী ১৬৪-২৪১/৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) প্রমুখ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন ইতিহাসে তা অতুলনীয়। বিদ্যমান পরিস্থিতি ও উপস্থিত জ্ঞানের আলোকে উম্মতের সমস্যার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা এমন রায় প্রদান করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল সত্যের সমীপে উপনীত হওয়া। তারা বার বার এ কথার উপর জোর দিয়েছিলেন যে তারা সাধ্যমত সঠিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার উপর তাদের ব্যক্তিগত গবেষণালব্ধ মতামত প্রদান করেছেন, কিন্তু "এ রায় কোন মুসলমানের মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়।"[২৮]

সময়ের বিবর্তনে এই সব রায় একধরনের চিরন্তনতা লাভ করে যা ফিকাহ্শাস্ত্রের বিভিন্ন মাজহাবের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে আন্ত:মাজহাব বিতর্ক স্ব স্ব স্থানে অনড় অবস্থানের সৃষ্টি করে। সপ্তম হিজরীর মধ্যভাগে বাগদাদের পতন এবং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা মুসলিম অঞ্চলগুলির দখল এ বিতর্ক অগ্নিতে আরো ইন্ধন যুক্ত করে। নিজ নিজ অবস্থানকে সংরক্ষণের এই অনুভূতি, ইকবালের ভাষায় 'আইনগত ধারণায় খণ্ড খণ্ড কঠোরতার জন্ম দেয়, যা শরীয়াহ বিষয়ে অন্যান্য ইজতিহাদী মতবাদকে অস্বীকার করে বসল" ।[২৯] ফলে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্ধ অনুকরণের (তাকলীদ আল আইমাহ) শিকারে পরিণত হল, যা ইসলামী অনুশাসনের শাব্দিক অনুসরণ ও অতীত ইজতেহাদী সিদ্ধান্তের অন্ধ আনুগত্যে পরিণত হল।[৩০] এ ধরনের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের অত্যধিক বাড়াবাড়ি সৃজনশীলতার উদ্যমকে দারুণভাবে ব্যাহত করে। আইন-কানুনকে কংকালে পরিণত এবং মর্মবস্তুকে বাদ দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্বতাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফলে শরীয়াহ ইসলামের সোনালী যুগে যে প্রাণবন্ত ও গতিশীল সভ্যতা সৃজন করেছিল তার ধারা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হল। ইসলামের পতনের কারণ হচ্ছে ইজতিহাদের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের গতিরোধ ও অবক্ষয় এবং মর্মবস্তুকে বাদ দিয়ে ধর্মের বাহ্যিক খোলস ও খুটিনাটি বিষয় নিয়ে অনাবশ্যকভাবে লিপ্ত থাকা। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি সমাজের নৈতিক সংস্কার সংরক্ষণ করতে হয়, তবে ইজতিহাদকে তার সঠিক মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

ইজতিহাদ শুধুমাত্র ঐসব প্রাজ্ঞবিজ্ঞ ইসলামী পণ্ডিতবর্গই পরিচালনা করতে পারেন যাদের কুরআন হাদীসের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে এবং যারা অতীত ইসলামী আইনবিশারদদের ইজতেহাদী অবদান ও সমকালীন সমস্যার বিষয়ে সমকভাবে অবহিত

আছেন।[৩১] যেহেতু এসব শর্তাবলী পূরণ "একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা প্রায় অসম্ভব" তাই ইকবাল বিকল্প পন্থা হিসাবে ইজতিহাদী প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।[৩২] সাংবিধানিকভাবে এরূপ প্রতিষ্ঠানকে ইজতিহাদের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সক্ষমতার ভিত্তিতে এমন সব মুজতাহিদদের (ইজতেহাদকারী) নির্বাচিত করা যায়। ইকবালের মতে, কেবলমাত্র এভাবে আইনগত বিষয়ে আমরা জীবনীশক্তি সঞ্চালিত করতে পারি এবং একে একটি বিবর্তনশীল রূপদান করতে পারি।"[৩৩]

শরীয়াহর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

উপরের আলোচনা হতে শরীয়াহর প্রকৃতি ও উৎসসমূহের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে প্রদত্ত বিভিন্ন চিন্তাধারা শরীয়ার তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধির যৌক্তিকতা প্রদান করে।

প্রথমত শরীয়াহ হচ্ছে ঐশ্বরিক। ইহা ইসলামের শেষ নবী (সা) এর নিকট আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট পবিত্র বাণী। মূলত ইহা ঐশী উৎস কুরআন ও সুন্নাহর উপর সংস্থাপিত। অন্যভাবে বলতে গেলে, শরীয়াহর উৎস হচ্ছে আল্লাহ 'যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন.. অবশ্যই সমগ্র সৃষ্টি ও সার্বভৌমত্বের মালিকানা তাঁর" (৭:৫৪)

প্রভু ও মালিক হিসাবে একমাত্র আল্লাহর নিকট মানুষকে তার আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, মানুষের কার্যাবলীকে তার নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সেহেতু এ বিশ্বাস শরীয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক, তাই ইসলামে বিশ্বাসীদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার সাথে তা পালন করতে হবে। ইবরাহীম সুলায়মানের মতে তাই ইসলামে আইনের অর্থ 'বিশ্বাসীদের আইন' কেননা এ আইন তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা এতে বিশ্বাস করে।[৩৪] তাই শরীয়াহ'র ভিত্তি হচ্ছে গভীর বিশ্বাস বা ঈমান। ঐশ্বরিক বিধায় শরীয়াহ চিরন্তন, ন্যায়ানুগ এবং সর্বদেশ ও সর্বসময়ের জন্য প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত শরীয়াহ নির্দেশাত্মক নয় বরং আদর্শাত্মক। শরীয়াহ আচরণ বিধির উচ্চমান নির্দেশিকা হিসেবে এমন চরিত্র গঠন করে যা মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সভ্য সমাজের মৌলিক লক্ষ্যসমূহ তথা ভালোমন্দ পার্থক্য করার মত মানসিক গঠন; দুর্বল, দুস্থ ও বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতি; বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে সততা; সকল প্রকার বঞ্চনা ও শোষণ হতে নারীসমাজকে রক্ষা করা; বিচার ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত রাখা; পারস্পরিক আলোচনা ও পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালনা করার কর্তব্যভার মানুষের উপর অর্পিত হয়েছে।[৩৫] মাদকাসক্তি, রিবা (সুদ), জুয়া ইত্যাদি ধরনের কার্যাবলী নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি *(জরুরীয়াত)*, সুবিধাজনক দ্রব্যাদি *(হাজীয়াত)* এবং বিলাসিতা বা উৎকর্ষতামূলক দ্রব্যাদি *(তাহসিনিয়াত)* সরবরাহ করা। শরীয়াহ ব্যক্তি ও সামষ্টিক

জীবনকে পূণ্য বা *'মারুফাত'* এর ভিত্তিতে গঠন করতে এবং পাপ পংকিলতা বা *'মুনকিরাত'* হতে মুক্ত করতে চায় (৩:১০৪)।[৩৬] এভাবে সকল কর্মকে হালাল ও হারাম দু'ভাগে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেকটির রয়েছে বিভিন্ন স্তর। বস্তুত শরীয়াহ আচরণবিধিকে নৈতিকতার মাপকাঠিতে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছে : বাধ্যতামূলক *(ফরজ ও ওয়াজিব)* ও সুপারিশমূলক। কিন্তু অবশ্য পালনীয় নয় *(মানদুব)*, নিরপেক্ষ তথা পালনযোগ্য *(মুবাহ)*, দূষণীয় কিন্তু সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয় (মাকরূহ) এবং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম)।[৩৭] মানুষের কার্যাবলীর বিভিন্ন মাত্রার নৈতিক দাবি অনুযায়ী এসব মূল্যবোধ ও বিধি সমাজকে এমনভাবে গঠনে সহায়তা করে যে তা মানুষের সকল কার্যাবলীতে সততা ও ন্যায় পরায়ণতা বিস্তার করে। যেহেতু শরীয়াহ মূল্যবোধ ও নীতির সাথে সম্পৃক্ত, তাই এর নির্দেশনা ব্যক্তিমানুষকে সমাজের অসংখ্য ক্ষেত্রে সুনিপূণতা ও স্থিতাবস্থার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত শরীয়াহ হচ্ছে ব্যাপক। ব্যক্তি জীবনে মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নন্দনতাত্ত্বিক ও জৈবিক সকল দিক শরীয়াহর আওতাভুক্ত। সামষ্টিক জীবনে শরীয়াহর নির্দেশনা সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সকল ধরনের সামাজিক আচরণ ও কার্যাবলী আওতাভুক্ত করে। ইহজীবনে মানবজীবনের সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির জন্য শরীয়াহ মানব জীবনের সকল দিক ও অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করে।

এ প্রসঙ্গে এস. পারভেজ মঞ্জুর বলেন যে, আভ্যন্তরীণ নৈতিকতা ও বাহ্যিক আইন, গুপ্ত ইচ্ছা ও প্রকাশিত কার্য, বাস্তব বিশ্বাস ও কার্যাবলীর মধ্যে যা কিছু বৈপরীত্য আছে তা শরীয়াহর সর্বপ্লাবী গতিশীলতার মাধ্যমে তার সমাধান হয়। একই সাথে ইহা আদর্শ ও চলার পথ। ঐশী ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং সে ইচ্ছার বাহক হবার জন্য মানুষের সংকল্প ধর্ম, নৈতিকতা, আইন, সমাজতত্ত্ব এমনকি রাজনীতি এসব হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় ঐশ্বরিক দিকের অনন্য সাধারণ অবদান।[৩৮]

শরীয়ার অনুশাসনসমূহ শুধুমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অন্তরের অন্ত:স্থলের অনুভূতি, অভিপ্রায় ও নিয়ত পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। শরীয়তের কিছু ব্যক্তিগত, কিছু সামাজিক, কিছু রাজনৈতিক এবং অন্যান্যগুলি নৈতিক পর্যায়ের। শরীয়তের সাধারণ ও বিশেষ, নৈতিক ও রাজনৈতিক সবগুলো অনুশাসনের সমন্বয়ই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে যা তাকে অন্যান্য আইন ব্যবস্থা থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে।

চতুর্থত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শরীয়াহ হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে এমন একটি সামগ্রিকতা যার বিভিন্ন দিক ও ধারা তাওহীদ ও রিসালাতের একই নীতি হতে যৌক্তিক ও অপরিহার্যভাবে প্রবাহিত। শরীয়াহর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় বরং একই সুসমন্বিত ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ ও এক অংশ

অপর অংশ হতে শক্তি সংগ্রহ করে। ইহা মুসলিম উম্মাহর দেহস্বরূপ, যে বিষয়ে রাসূল (সা) বলেছেন :

বিশ্বাসীগণ একে অন্যে মিলে একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা স্বরূপ, যেন একটি জীবন্ত দেহ যেখানে একজন আঘাত প্রাপ্ত হলে অন্য সবাই একই ব্যথা প্রাপ্ত হয়।[৩৯]

শরীয়াহ ধর্ম ও রাজনীতিসহ জীবনের কোন অংশের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না। জীবনের এমন কোন অঙ্গন নেই যেখানে শরীয়াহ কোন দিকনির্দেশনা দেয়নি। এই নির্দেশনা দ্ব্যর্থহীন অথবা দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে? কোথাও কঠোর যেমন 'ফারাইদ' ও *'মুহররামাত'* এ ক্ষেত্রে, অথবা নমনীয় যেমন 'মানদুব', 'মাকরুহ' ও 'মুবিহ' এর ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবনের কোন কিছুই শরীয়ার নির্দেশনার বাইরে নেই। শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন একটি অখণ্ড সমগ্রতা। এটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে যাপন করতে হবে। শরীয়ার বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। শরীয়াহ তখনই সুচারু ও দক্ষভাবে কার্যকর হয়, যখন প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনা করা হয়। তাই সাইয়েদ মওদূদীর মতানুসারে চুরির দায়ে হাত কাটার বিধান শুধুমাত্র পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত ইসলামী রাষ্ট্রে প্রযোজ্য যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিককে জীবিকার পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং যেখানে পাপাচার ও অবৈধ কাজ নিরোধ ও পূণ্য কাজকে উৎসাহিত করা হয়। এ বিধান ঐ সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয় যেখানে বৈষম্য, শ্রেণী সংঘাত ও দুর্বিষহ অর্থনৈতিক বিভেদ বিরাজমান। একইভাবে যে নোংরা সমাজে যৌনতা উদ্দীপক বস্তুর ছড়াছড়ি; নগ্ন ছবি, পুস্তক ও গান বিনোদনের মাধ্যম সে সমাজে ব্যভিচারের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য নয়।[৪০]

সর্বশেষে শরীয়াহ স্থায়ীত্ব (স্থিতিশীলতা) ও পরিবর্তন (স্থিতিস্থাপকতা) এর মধ্যে একটি সুষম সামঞ্জস্যশীলতা বিধান করেছে। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ৫:৪৮-এ বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা ঐশী কিতাব নাজিল করেছি এবং পথ প্রদর্শন করেছি। এভাবে আইনদাতা মহান আল্লাহ শুধু আইনই প্রদান করেননি, বরং শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে থেকে স্থান, কাল অনুযায়ী নানাবিধ পার্থিব সমস্যার সমাধানের জন্য পথ খুঁজে নেবার জন্য আইন রচনার অনুমতি দান করেছেন।

যে সব বিষয় *'ওয়াজিবাত'* ও 'হারাম' এর অন্তর্ভুক্ত শরীয়াহ বিশ্বাসীদের তা সুদৃঢ়ভাবে মানার নির্দেশ প্রদান করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বৃহদাংশ কর্মকাণ্ড মুবাই শ্রেণীভুক্ত। যা ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে মানুষকে ব্যক্তিগত পছন্দ, স্বাধীনতা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ প্রদান করেছে। শারীয়াহর এই অংশটুকু নমনীয় যা মানুষকে প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছে। মুসলিম আইনজ্ঞগণ নানা বিধি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দিয়েছেন যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই পদ্ধতিসমূহের অধিকাংশই *'ইজতিহাদ'*এর ধারণার অন্তর্ভুক্ত, যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিসীমার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

মুসলিম জাহানে শরীয়াহ

শরীয়াহ ইসলামের মূলকেন্দ্র। সকল মূল্যবোধ, কার্য, নীতিমালার মূল মধ্যস্থতাকারী হচ্ছে শরীয়াহ এবং ইহা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্ধারণকারী উপকরণ। এতদসত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশেদার পর দীর্ঘ দিন মুসলিম জাহানে শরীয়াহকে বিস্মৃত বা অবহেলা করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদার সময় শরীয়াহ সব কিছুর শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করত। ইসলামী আইন বিশ্বস্ততার সাথে প্রয়োগ ও পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খলিফাগণ সবিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। অতঃপর অনেক শতাব্দী পর্যন্ত এই উচ্চতম আদর্শের সাথে সরকার সমূহের বাস্তব কর্মকাণ্ডের খুব কমই সাদৃশ্য ছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণ এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য তাদের ইসলামী বৈধতার প্রতীকসমূহের সাথে নিজেদের জড়িত করত এবং নিজেদের ভাবমূর্তি ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সেবার কাজে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করত। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের মুসলিম আইনজ্ঞগণ কর্তৃক ঘটনা উত্তর অনুমোদন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তার তত্ত্ব দ্বারা তাকে যুক্তিযুক্তকরণ - এ হতে প্রতীয়মান হয় যে শরীয়াহর আওতা হতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমেই দূরে সরে গিয়েছিল। শরীয়াহ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এই বিভাজনের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ শারীয়াহকে গুরুত্বহীন ক্ষেত্রে ছুঁড়ে ফেলতে এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে নিজেদের রচিত আইন প্রয়োগ করতে পেরেছিল।

অস্টিনের তত্ত্বের নীতিমালা অনুযায়ী, ইউরোপীয়ান সিভিল আইনসমূহ আইন, কার্যবিধি ও বিচার বিভাগীয় বিষয়াদিতে প্রতিস্থাপন করা হয়। ফরাসী উপনিবেশসমূহে 'নেপোলিয়ান কোড' এবং ইংরেজ উপনিবেশসমূহে 'কমন ল' প্রচলন করা হয় এবং তা মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য হয়। প্রত্যেক মুসলিম অঞ্চলে একটি নতুন জাতীয় আইন ব্যাখ্যা গড়ে তোলা হয়; তবে মুসলমানদের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার বিষয় বিবেচনা করে মুসলিম পারিবারিক আইনসমূহ অক্ষুণ্ন রাখা হয়।[৪১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মুসলিম জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব অবস্থার উন্নতি ঘটায়নি। আইন ব্যবস্থার পাশ্চাত্যকরণ ছিল প্রতিষ্ঠিত প্রবণতা এবং শরীয়াহকে ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল, তাছাড়া সেক্ষেত্রেও প্রভূত সংস্কার ও পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। তুরস্কে শরীয়াহকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে অনৈসলামিক আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অন্যান্য মুসলিম দেশে পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে বিকৃত শরীয়াহর আইন জারী রেখে ফৌজদারী ও সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মডেলের আইন বহাল করা হয়। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের মত দেশসমূহ শরীয়াহকে দেশের আইন স্বীকার করে নিলেও ইসলামী অনুশাসনের পরিপন্থী প্রথা ও আচরণও অনুমোদন করে। ইসলামী পণ্ডিতবর্গের সুদৃঢ় রায় হচ্ছে, আমীরাত ও অনুরূপ মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ'র দাবী অনুযায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই। মরহুম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে শরীয়াহর সার্বিক আঙ্গিকে সাধারণ আইনকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বৈরী বৈদেশিক শক্তি দক্ষ জনশক্তির অভাব শরীয়াহ কার্যকরকরণের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে।

তাই বর্তমানে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়না, যাকে ইসলামী শাসন পদ্ধতির দাবী অনুযায়ী ইসলামী সরকারের নমুনা বা মডেল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মুসলিম বিশ্বব্যাপী ইসলামী শরীয়াহ্ বাস্তবায়নের দাবীর প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান একটি অর্জন হচ্ছে- ২৬টি মুসলিম দেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এবং এ মর্মে শাসনতান্ত্রিক ঘোষণা যে শরীয়াহ হবে সকল আইনের 'উৎস'।

লক্ষ্যণীয় যে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হবে এবং শরীয়াহ্ সকল আইনের উৎস হবে এ মর্মে ঘোষণা দেবার কোন অবকাশ শরীয়ায় নেই। একটি ইসলামী শাসনতন্ত্রে স্বতই: শরীয়াহ ও ইসলামের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকবে; তাই এরূপ ঘোষণা অর্থহীন পুনরাবৃত্তি এবং অবাঞ্ছিত। রাষ্ট্রধর্মের ধারণাটি একটি ইউরোপীয় ফর্মূলা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবরণ দেবার জন্য এটি মুসলিম দেশসমূহে আমদানী করা হয়েছে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা বা না করা দ্বারা ইসলাম সমাজকে কিভাবে পরিবর্তন করবে তার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না। এ ধরনের নামকরণের বাস্তব তাৎপর্যের চেয়ে প্রতীকি অর্থই অধিক এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমা শিক্ষিতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সমালোচনাকারী ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত ব্যক্তিবর্গকে তুষ্ট বা আশ্বস্ত করা।

শরীয়াহ বাস্তবায়নের অর্থ বর্তমানে বিরাজিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং বহিরঙ্গে প্রসাধনী প্রলেপ দেয়া নয়। এর অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল করে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং আইনগত চিন্তা ও পদ্ধতিকে পুনর্গঠিত করে তোলা। শরীয়াহর আহ্বান হচ্ছে বিজাতীয় চিন্তা ও জীবন পদ্ধতি অপসারণ করার জন্য সমস্ত সমাজকে জাগিয়ে তোলা; রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের অবসান ঘটান এবং ইসলামী সমাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পত্তনের জন্য ইসলামী মূল্যবোধের চর্চার ধারা প্রবাহিত করা।

উপসংহার

শরীয়াহ্ পরিভাষাটি প্রায়শই ভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝির শিকার এবং পাশ্চাত্যে আইন সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত তার সাথে ভ্রান্তিজনকভাবে শরীয়াহকে সমার্থক বলে গণ্য করা হয়। শরীয়াহকে ফিকাহ্ বা আইনশাস্ত্রের সাথেও সমার্থক মনে করা হয়ে থাকে। তবে এ দু'টি পরিভাষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও অভিন্ন নয়। শরীয়াহ্ হচ্ছে উৎসের দিক থেকে ঐশ্বরিক, আর ফিকাহ মানব রচিত- আল্লাহপাকের ঐশী ইচ্ছাকে উপলব্ধি, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের মানবীয় প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে ফিকাহ্।

কোরান ও সুন্নাহর উদ্দেশ্য ঐশী ইচ্ছাকে সংজ্ঞায়িত বা ব্যক্ত করা; আর ফিকাহ্ সেই ঐশী ইচ্ছাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে এবং ব্যক্তিও সামগ্রিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিধিবিধান উদ্ভাবন করে। যাহোক, উভয়ই শরীয়ার অংশ।

শরীয়াহ্ হচ্ছে মহাবিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। উৎসের দিক থেকে ঐশী বিধায় প্রকৃতিগতভাবে শরীয়াহ অনেকাংশে নির্দেশাত্মক, সুসমন্বিত এবং

সাংগঠনিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শরীয়াহ আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ব, নিজের প্রতি ও অন্যান্য মানুষ ও প্রাণীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। সংকীর্ণ অর্থে একে 'করণীয়' ও 'নিষেধ' এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। জীবনের সকল অঙ্গনকে বেষ্টনকারী ঐশী জীবন বিধানের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এসব নির্দেশমালাকে অবলোকন করতে হবে। ইসলামী আইন নামে এখন যা দেখা যায় অথবা ইসলামীকরণ পরিকল্পনার অধীনে যা রচিত হচ্ছে, তা একটি বিশাল সমগ্রতার ক্ষুদ্র অংশবিশেষ করে যার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই এবং সামগ্রিকতা বহির্ভূতভাবে বিচ্ছিন্নভাবে এর প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব নয়।

শরীয়াহ নিম্নবর্ণিত নীতির উপর সংস্থাপিত ১. সকল কিছুর আল্লাহ কেন্দ্রিকতা (তাওহীদ); ২. মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়ত (রিসালাত); ৩. পৃথিবীতে মানুষের আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব (খিলাফাহ), এবং ৪. সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা (আমর বি আল- মারুফ ওয়া আল-নাহইয়ান আল মুনকার)। তাওহীদের ঘোষণা এবং মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর। সেই জন্যই কুরআন নাজিল হয়েছে, প্রত্যাদিষ্ট নবী প্রেরণ তাই অত্যাবশ্যক, যাতে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা, বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত জীবনাচরণ, বক্তব্য ও অনুমোদন (যা এক সাথে সুন্নাহ নামে অভিহিত) দ্বারা পরিচালিত করতে পারেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে ইতিবাচক বিধি আহরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ করাকে সামগ্রিকভাবে 'ইজতিহাদ' বলা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়ে তা নিম্নরূপ শব্দ রূপে প্রকাশিত হয়েছে যথা *'ইজমা', 'ইসতিসলাহ', 'ইসতিহসান', 'ইসতিসহাব'* ও *'উরফ্'*।

মুসলিম সমাজের মুখ্য নৈতিক ও আইনগত বিধান শরীয়াহ মুসলমানদের সামাজিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি এমনভাবে প্রসারিত করেছিল যে বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে একটি সমৃদ্ধ ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠে। শরীয়াহ'র গতিশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতায় ইজতিহাদের ভূমিকা বহুলাংশে প্রধান। এটা সুবিদিত যে, রাসূল্লাহ (সা)এর সাহাবীগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ পণ্ডিতব্যক্তি এবং আইনশাস্ত্রের ধারা প্রবর্তক প্রণেতারা (মাজাহিব) নিজেরা ইজতিহাদ চর্চা করেছেন এবং অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতদের ইজতিহাদ চর্চা করতে আহ্বান জানিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। যে ইজতিহাদী সঞ্জীবনী শক্তি মুসলমানদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকুশলতা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল এবং মুসলিম সমাজের প্রবৃদ্ধির শিকড়ে রস সিঞ্চন করেছিল, তা এক পর্যায়ে এসে অবস্থাচক্রে স্বীয় ভূমিকা পালনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার স্থান দখল করে নেয় 'তাকলীদ' বা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণ।

'তাকলীদ' এর ফলশ্রুতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয় ও সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ফলত পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে মুসলমানদের মৌন আত্মসমর্পণ ঘটেছে- সমকালীন এ উপলব্ধি ইজতিহাদের দুয়ার পুনঃ উন্মোচনের আহ্বান সৃষ্টি করেছে যাতে ইসলামের গতিশীল ও জীবন্ত সভ্যতার সৌধ পুনঃ বিনির্মাণ করা যায়।

উম্মাহ ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

উম্মাহ বা ইসলামী জাতি হচ্ছে সমস্ত মানবজাতির জন্য সত্যের সাক্ষ্যবাহী (২:১৪৩)। ইতিহাসের স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের গতিশীল বাহন উম্মাহ। এ সত্যের স্বীকৃতি দিয়ে শরীয়াহ আলোচনার অধিকাংশই নিয়োজিত করেছে ইসলামী সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে; আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যক্তিগত নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে অল্প অংশে। একইভাবে ইসলামী ঐতিহ্য উম্মাহর ধারণার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন উম্মাহর অংশ হওয়া। ইসলামী সময়কাল মহানবী (সা.)-এর জন্ম বা মৃত্যু দিবসের সাথে সম্পর্কিত নয় বা প্রথম কুরআন নাজিলের সাথেও সম্পর্কিত নয়, বরং মহানবী তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মদিনায় হিজরতের সময় হতে এর সূচনা। এটা সে সন্ধিক্ষণ যখন মক্কার মুসলমানগণ রক্তের সম্পর্কের উর্ধ্বে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে স্থান দিয়েছিল। সুসামঞ্জস্যশীল উম্মাহর অংশে পরিণত হওয়ার মধ্যে মুসলমানের জীবনের তাৎপর্য এবং তার পরকালীন মুক্তি নিহিত। এ ধারণা ব্যাখ্যা করে উম্মাহর ধারনাটি কেন ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। উম্মাহ আসলে কি? কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে কি ধারণা দেয়া হয়েছে? ইতিহাসে এ ধারণার জন্ম হল কিভাবে? পরিশেষে জাতীয়তাবাদের ধারণার সাথে কিভাবে এর তুলনা করা যায়?

পারিভাষিক বিভ্রান্তি

উম্মাহ একটি অনন্য সাধারণ পরিভাষা। পাশ্চাত্য ভাষায় এর কোন প্রতিশব্দ নেই। প্রথম দিকে পশ্চিমে উম্মাহ শব্দের সাথে জাতি বা জাতি রাষ্ট্রের ব্যবহার সমার্থক হিসাবে গণ্য হতো। সম্প্রতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উম্মাহ শব্দ সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতি বা জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটি সাম্প্রতিক এবং পশ্চিম থেকে ধার করা। দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের পাশ্চাত্য গুরুদের অনুকরণে উম্মাহ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে জাতি শব্দটি ব্যবহার করেছে। সম্প্রদায় অর্থে উম্মাহর ব্যবহারও সমভাবে ভুল।[১] এ দু'য়ের মধ্যে সাদৃশ্য কৃত্রিম।

সম্প্রদায় শব্দটি একই ধরনের জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত লোকসমষ্টিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং এমতাবস্থায় শব্দটি 'স্থানীয় দল', 'কোন অঞ্চলের সামাজিক জীবন' যথা গ্রাম, শহর বা দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।[২] এর মধ্যে একটি 'জটিল সামাজিক ব্যবস্থা আর আঙ্গিক কাঠামো এবং সমাজ-মনস্তাত্বিক ঐক্য' রয়েছে।[৩] সহজভাবে বলতে গেলে,

সম্প্রদায় হচ্ছে- একটি জনগোষ্ঠী যারা কোন বিশেষ অঞ্চলে বাস করে এবং যাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের ঐক্যের বন্ধন রয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ত, আত্মীয়তা, একই সংস্কৃতি, একই ভূখণ্ড হতে উদ্ভূত হতে পারে অথবা এগুলি উপাদানের কতিপয়কে নিয়ে এ ঐক্য হতে পারে। সম্প্রদায়ের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার সাথে উম্মাহ্ শব্দটির অর্থগত কোন মিল নেই। উম্মাহ্ গঠনের নির্ধারণী ভিত্তি জাতি, ভাষা, ইতিহাস বা এদের কতিপয়ের সমন্বয় নয়। কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের মাঝে উম্মাহ্ সীমাবদ্ধ নয়। জাতি, ভাষা ও ভূখণ্ড দ্বারা উম্মাহ্ শব্দটিকে আবদ্ধ করা যায় না। উম্মাহ্ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যত মুসলমান বাস করে তাদের সমন্বয়ে এবং ইসলামী দর্শন ও চেতনার ঐক্য বন্ধনে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণা। স্থানকালের পরিসীমা অতিক্রম করে ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সামগ্রিক মানবগোষ্ঠী হচ্ছে উম্মাহ্, যার লক্ষ্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।

কুরআন ও সুন্নায় উম্মাহ্

আল কুরআনে উম্মাহ্ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর নানা অর্থ করা হয়েছে।[৪] কতিপয় আয়াতে উম্মাহ্ বলতে 'লোক সমষ্টি', 'জাতি' বোঝাতে 'কওম' বা 'শা'ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যারা শুধুমাত্র- আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ (৪০:৫; ৪৯:১৩)।

কোন কোন আয়াতে উম্মাহ্ বলতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে একদল লোককে বোঝান হয়েছে (৭:১৫৯) অথবা বোঝান হয়েছে এমন দল 'যারা পানির মত প্রবাহিত' (২৮:২৩)।

১০:১৯ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে একক জাতি বা 'উম্মাহ্ ওয়াহিদাহ্' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃহৎ মানব গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের কারণে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই ধরনের কঠোর দৃষ্টিকোণ থেকে, উম্মাহ্ বলতে একই ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ দ্বারা আবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বোঝায় (৭:১৫৯)।

উম্মাহ্ বলতে একজন নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী একদল লোককেও বোঝান হয়েছে। (১০:৪৭), যারা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করার শপথ নিয়েছে। এই বিশেষ অর্থেই কুরআন নবী করিম মোহাম্মদ (সা) এর অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'তোমরা মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্, যারা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে (৩:১১০)।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উম্মাহ্ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্বাসীদের (মুমেনুন) বুঝানো হয়েছে এবং বিপরীত পক্ষে রয়েছে অবিশ্বাসীরা (কুফর), ইহুদী ও বহুত্ববাদীরা (মুশরিকুন)। এভাবে আমরা তাদের পৃথিবীর বুকে উমুম (উম্মাহ'র বহুবচন) হিসাবে বিভক্ত করে দিলাম, যাদের কিছু অংশ ন্যায়পরায়ণ আর বাকী অংশ বিপরীতধর্মী (৭:১৬৮)।

ইসলামে শাহাদাত শুধু আল্লাহপাকের একত্ব ও মোহাম্মদ (সা) এর নবুয়তে বিশ্বাসই নয় বরং 'উম্মাহ মুসলিমাহ' এর অংশ হবার আনুগত্যের শপথও। এ উম্মাহ্ বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝায় কেননা শেষ নবীর আহ্বান বাণী ছিল সর্বত্র মানব জাতির জন্য। 'হে মানব মণ্ডলী' আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর বাণী বাহক হিসাবে এসেছি, আসমান ও জমিনের সমস্ত কিছু যার অধীন এবং তিনি ছাড়া আর কেউ উপসনার যোগ্য নয়' (৭:১৫৮)।

উম্মাহ্ শব্দটি নবী করিম (সা) এর অনেক হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি তার অনুসারীদের উম্মাহ্ বলে অভিহিত করেছেন এবং এই নব সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। হামিদুল্লাহ'র মতে উম্মাহর ধারণাটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব লাভ করে মদীনার লিখিত সংবিধানে এ শব্দটির ব্যবহার বা উল্লেখের মাধ্যমে।[৫] সবচেয়ে সমালোচনাকারী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিও এ দলিলের সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি।[৬] এই মৌলিক দলিলের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মদিনার দলিল হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্ ও আহল-আল কিতাবী তথা কিতাবধারীদের মধ্যকার প্রথম চুক্তি, এখানে কিতাবধারী বলতে ইহুদীদের বোঝান হয়েছে।

'পরম করুণাময় আল্লাহ'র নামে শুরু করছি' এ শব্দগুচ্ছ দ্বারা আরম্ভ করে চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বিশ্বাসীগণ তথা কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলমানগণ, আর তাদের সাথে যারা যোগ দিয়েছে ও অনুসরণ করছে এরা সবাই মানবজাতির মধ্যে আলাদা একটি উম্মাহ।[৭] তারা একে অন্যের সাওয়ালী বন্ধু, অভিভাবক, সহযাত্রী।[৮] সমন্বিত দেহের মত একযোগে কাজ করে এবং অবিশ্বাসী (কুফর), ইহুদী ও বহুত্ববাদীদের (মুশরিকুন) সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।[৯] মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ইহুদীদের জীবনযাত্রা ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

এ ধরনের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও 'মদীনার সংবিধানে ঘোষিত উম্মাহর 'ভূখণ্ডগত পরিচয় রয়েছে' মর্মে মতামত প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।[১০] রোজেনথাল ও মন্টোগোমারী ওয়াট মনে করেন যে, উম্মাহ্ শব্দটি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা মুসলিম, ইহুদী ও দেবদেবী পূজারীদের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার বণ্টন করে দিয়েছে।[১১] এ ধরনের ভুল ধারণার জন্ম হয়েছে সংবিধানের এ ধারা হতে 'ইন্না ইয়াহুদ বনি আউফ উম্মাতুন মা আল মুসলিমিন' যার অর্থ মদিনাতে মুসলিম ও ইহুদীরা মিলে একটি উম্মাহ্ গঠন করেছে। এ ধরনের ব্যাখ্যা কতিপয় কারণে অগ্রহণযোগ্য। প্রথম এটা কুরআনে বিধৃত উম্মতের ধারণার বিপরীতপন্থী দ্বিতীয়ত: এটা সংবিধানের প্রথম ধারার সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে মুসলমানদেরকে বিশ্বাসী ও অনুসারীদের একটি দল বা উম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের বিপরীত দল হিসাবে ইহুদীও দেবদেবী পূজারীদের ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষে, সমস্ত সংবিধান জুড়ে ইহুদীদের মুসলমানদের পাশাপাশি

উল্লেখ করা হয়েছে, কখনো ইহুদীদের মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করা হয়নি। যখন উভয় দলকে একইসাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়েছে, তখন মদীনা সংবিধান 'আহল হাদিহী আল সাহিফাহ (চুক্তির লোকসমষ্টি) শব্দটি ব্যবহার করেছে। তাই বনি আউফ সম্প্রদায়ের ইহুদীদের মুসলমানদের পাশাপাশি আলাদা উম্মাহ হিসাবে বুঝতে হবে। আল ফারুকীর মতে মুসলিম উম্মাহ'র সংজ্ঞা হচ্ছে :

'একটি সংগঠিত লোকসমষ্টি; যারা ভূখণ্ড, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; তারা সামগ্রিকভাবে সার্বজনীন, এবং সামষ্টিক জীবনের অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ এবং এ উম্মাহ ধারণার সাথে যাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের ইহকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিধান এবং স্থান কালের পরিসীমায় ঐশী ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ন স্বরূপ অভিহিত করা হয়েছে।'[১২]

উম্মাহর অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যসমূহ

সংজ্ঞার দিক থেকে উম্মাহ একটি জনসমষ্টি, যাদের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে এবং যারা কতিপয় শর্ত মানতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক, পালনকারী ও প্রভু ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে উম্মাহর মুসলিম সদস্যবৃন্দ- অন্য সবার চেয়ে আলাদা ও ভিন্ন। বিশ্বাসীরা নিজেদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে অবিশ্বাসীদের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান জ্ঞাপন করবে। তাঁরা আল্লাহর সার্বভৌম একত্ব ও মোহাম্মদ (সা)-এর শেষ নবুয়তে বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ প্রেরিত কুরআনকে প্রত্যাদিষ্ট বাণী হিসাবে গ্রহণ করে, শরীয়াহ অনুসরণ করে এবং নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করে। দ্বীন ইসলাম হচ্ছে উম্মতের জন্য নির্যাস স্বরূপ, যা উম্মতের সকল সদস্যকে একটি সমগ্রতার বাঁধনে আবদ্ধ করে এবং মানব জাতির অন্য অংশ থেকে নিজেদের আলাদাভাবে উপস্থাপন করে। মদীনা সনদে ইহুদীদের আলাদা উম্মাহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ তারা পৃথক ধর্মে বিশ্বাসী এবং ভিন্ন আদর্শ পালন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম উম্মাহকে স্বাতন্ত্রিক পরিচয় প্রদান করেছে, যার স্বরূপ সার্বজনীন। কুরআন মুক্ত ও সমুন্নত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, সকল মানুষ একই আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়া হতে এসেছে; অতঃপর বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত হয়েছে, যাতে পরস্পরের সাথে সৌহার্দ রচনা করে সমৃদ্ধ হতে পারে (৪৯:১৩)।

প্রথম হতেই কুরআন ও মহানবী (সা) সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান করেছেন। ইসলামের সার্বজনীন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত মুসলিম উম্মাহর চরিত্র সার্বজনীন হতে বাধ্য। মুসলিম উম্মাহ কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত নয়। পক্ষান্তরে সমগ্র মুসলমানকে এর আওতাভুক্ত করার অবিরাম প্রয়াস রয়েছে। কুরআন ঘোষণা করে 'তোমার এ উম্মত হচ্ছে একটি উম্মাহ' (২১:৯২; ২৩:৫৩) এবং ফলে এ উম্মাহকে ঐশী ইচ্ছার বাস্তবরূপ প্রদান করতে হবে। উম্মতের বিশ্বজনীনতা ঘোষণা করার অর্থ অবশ্য এ

নয় যে মানুষের স্বাভাবিক গোত্র বা সম্প্রদায় থাকতে পারবেনা বা প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতার জন্য ভূখণ্ডগত বিভক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থাকতে পারবে না। অবশ্য এ ধরনের সম্প্রদায়গত পার্থক্য বা প্রশাসনিক বিভক্তি চূড়ান্ত কিছু নয়, বরং শরীয়াহর নির্দেশ সবার জন্য প্রযোজ্য এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্যোগই চূড়ান্ত লক্ষ্য। মুসলিম উম্মাহ জীবতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক বা ভাষাগত ঐক্যের বা অনৈক্যের কোন বিষয় নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিসত্তামূলক যে আপাত দৃশ্যমান অনৈক্য দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তার তলদেশে ইসলামী সভ্যতার মৌলিক ঐক্যসূত্র বিরাজ করে, যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত রূপ প্রদান করেছে। মুসলিমগণ বিভিন্ন ভূখণ্ডে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হতে পারে, তবে কলেমা শাহাদাতের উচ্চারণ ও শরীয়াহ পালন সমস্ত ভিন্নতাকে বিলীন করে দিয়ে প্রত্যেক মুসলিমকে উম্মাহর একইরূপ সদস্যে পরিণত করেছে।

তৃতীয়ত: মুসলিম উম্মাহ বিশ্বজনীনতার সাথে সাথে একটি সুসংবদ্ধ সামগ্রিকতা, যার প্রতি অংশ অন্য অংশের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে একটি সমন্বিতরূপ ধারণ করেছে। বিশ্বাসী নরনারীগণ একে অন্যের 'আওলিয়া' (৯:৭১)। তারা একে অন্যের জন্য 'আনমার' (সহায়তাকারী) ও 'আওয়ান' (সাহায্যকারী)।[১৩] তাদের হৃদয় বন্ধুভাবাপন্ন যে একে-অন্যকে পরস্পর ভালবাসে।[১৪]

'এ ওয়ালা' শব্দটি আরো গাঢ়ভাবে সুসংবদ্ধ হয়েছে 'উখুওয়াই' (ভ্রাতৃত্ব) শব্দটি দ্বারা। 'বিশ্বাসীরা একে অন্যের ভাই এবং আল্লাহকে কেন্দ্র করে তাদের হৃদয়সমূহে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রবাহিত (৪৯:১০; ৪৮:২৯)। এ ভ্রাতৃত্ব, ধর্ম (দ্বীন) ও পবিত্রতা (হুরমাহ) এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[১৫]

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রকাশ পায় জামাতবদ্ধভাবে নামাজ আদায়, এক মুসলমান ভাই অন্য মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ ও পরলোকগত মুসলমানের মৃতদেহ বহনের মাধ্যমে। অন্য কথায় মুসলমান সমাজের প্রত্যেক সদস্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং সবাই মিলে একক ঐক্য গঠন করেছে। মুসলমান উম্মাহর সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতি দুনিয়ার বুকে আল্লাহর সাক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান। এর অর্থ নিহিত নবী করিম (সা) এর এ হাদীসে, যেখানে তিনি উম্মাহকে একটি মানবদেহের সাথে তুলনা করেছেন। এটা সে তুলনার সাথেও সাদৃশ্যমান যেখানে উম্মাহকে একটি প্রাসাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে তোলে।[১৬] নবী করিম (সা) কে ঘিরে সমস্ত উম্মত আঙ্গুলের মত সমবেত হয়ে হস্তে রূপান্তরিত হয়েছে। মহানবী এ বিষয়ের গুরুত্বের উপর বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, 'যতক্ষণ তোমরা ঈমান না আন, ততক্ষণ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা; আর যতক্ষণ তোমরা পরস্পরকে ভালো না বাস, ততক্ষণ তোমরা ঈমান অর্জন করতে পারবেনা।'[১৭] মহানবীর (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের ভাই, কেউ কারো ক্ষতি করে না বা একে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।[১৮]

চতুর্থত: উম্মতের সামগ্রিক প্রকৃতির উপর জোর প্রদান করতে গিয়ে ইসলাম সংঘবদ্ধ তথাকথিত ফ্যাসীবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেনি, অথবা ব্যক্তিগত বাড়াবাড়িকে স্থান দেয়নি। বরং ইসলাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা ও সামষ্টিকতাবাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় স্থাপন করেছে। শরীয়াহ্ 'ফরজে আইন' ও 'ফরজে কেফায়া' ধরনের কার্যাবলীর বিভক্তিকরণের মাধ্যমে সামষ্টিক প্রচেষ্টা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে।

উম্মাহ্র শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তার বিকাশ, তবে এ বিকাশ পাশ্চাত্য অর্থে সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ নয়। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহ্র রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতা। ইসলামে রাজনীতি অর্থ আল্লাহ্র রাজনীতি, বিশ্বাসীরা হচ্ছে আল্লাহ্র দল *(হিযবুল্লাহ্)*, যাকে কোরানে উম্মাহ্র সামষ্টিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে (৫:৫৬)। রাজনীতির ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্র প্রাপ্য, যিনি একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। ইসলামে রাজনীতি শরীয়ার বিধি বিধানের অধীন। উম্মতের সাধারণ বিষয়গুলি পারস্পরিক আলোচনার *(শুরা)* মাধ্যমে নির্ধারণ ও নিষ্পত্তি করা হয়। ইজমার মাধ্যমে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ শুরা ও ইজমার মাধ্যমে শরীয়াহ্কে বাস্তবায়ন করে। এ অর্থে উম্মাহ্ হচ্ছে এমন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, যা খিলাফত নামে অভিহিত।[১৯] এ প্রতিষ্ঠান ঐশী সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সমস্ত উম্মতের জন্য এ ছিল ঐক্যসূত্র।

উম্মাহ্র কার্যাবলী

উম্মাহ্র একত্বকে নির্দেশ করার জন্য কুরআন কাবা শরীফকে কিবলা ঘোষণা করেছে, এর প্রতীকি ব্যাঞ্জনা হিসাবে হজ্বের বিধান দিয়েছে ও জিহাদের মাধ্যমে উম্মতের উদ্দেশ্য চরিতার্থের কথা বলেছে। এ তিনটি শব্দ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং উম্মাহ্ প্রসংগে কুরআনে এ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (২:১৪৩; ১৪৫; ২২: ৭৭-৭৮)। যেহেতু উম্মাহ্র গঠন ও জীবনের উপর কুরআনের বক্তব্য রয়েছে তাই এর কার্যাবলী সম্পর্কে কুরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

সাইয়েদ মওদূদীর ভাষায়, উম্মাহ্ যে জন্য গঠিত হয়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে সমগ্র মানবসমাজের সামনে মুসলিম উম্মাহ্র আল্লাহ্র প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে দণ্ডায়মান হওয়া।[২০] কুরআন ঘোষণা করে :

'এবং আমরা তাই মধ্যপন্থী (ওয়াসাত) উম্মত হিসাবে তোমাদের গঠন করেছি, যাতে তোমরা সমগ্র মানবজাতির সামনে সত্যের সাক্ষ্যবাহী হতে পার এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষ্য হতে পারেন (২:১৪৩)।'

শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্ সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। এ ইসলামী বিশ্বাস ঘোষণা করে যে আল্লাহ্ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (সা)

তার প্রেরিত রাসূল। শাহাদাতের মাধ্যমে সমগ্র সত্য বিঘোষিত হয় এবং মানবজীবনসহ সমগ্র কিছু আল্লাহর ঐশ্বরিকতার সামনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। সাইয়েদ মওদুদীর ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে :

মানুষকে সঠিক জীবন যাত্রা শিক্ষা দেয়া, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য সঠিক আচরণ বিধি পালন করা, তাদের যে সব কাজ করা উচিৎ এবং যেসব কাজ পরিহার করা উচিৎ ও তাদের যে সব কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষা ও সাক্ষ্য দেয়া।[২১] সত্যের সাক্ষ্য কথা ও কাজে প্রমাণ করতে হবে। প্রথমটি করতে হবে বক্তব্য, লিখনী, যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সাক্ষ্য তথা শিক্ষা, গণসংযোগ ও প্রচারণার মাধ্যমে। কার্য দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে নিজের বাস্তব জীবনে ইসলাম চর্চা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ব্যক্তিজীবন ও সামষ্টিক জীবনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তা ইসলামের জীবন্ত প্রতিবিম্বে পরিণত হয়। সক্রিয়ভাবে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে যাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সকল কিছুর উর্ধে ঐশী নির্দেশ স্থান পায় ও বাস্তবায়িত হয়।[২২]

সূরা ২ এর আয়াত ১৪৩-এ তাফসীরকারকগণের মতে 'ওয়াসাত' শব্দটিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অর্থে দাঁড়িপাল্লার সমান দুই দিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর অর্থ ইহুদীদের মত কঠিন অনড়তা এবং খ্রিস্টানদের মত সবকিছুতে আপোষকামিতা নয় বরং ইসলামে এসব পরিহার করা হয়েছে। মুসলমানরা নবী করিম (সা) এর নিকট নাজিলকৃত 'সরল সঠিক পথ' (সিরাতুল মুস্তাকীম) অনুসরণ করে।[২৩] জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুবিচারের সাথে বাড়াবাড়ি চিহ্নিত করে তা পরিহার করে সরল সহজ পথে চলতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে রোগ চিহ্নিত করণের মত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগ তথা সরল পন্থা অনুসরণ করা।

সূরা ২২ এর আয়াত ৪১ এ ব্যক্ত হয়েছে 'তাদের (মুসলমাগণ) যখন আমরা ক্ষমতা প্রদান করি তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, পূণ্যকাজ করে ও পাপকাজ পরিহার করে। পরিশেষে সকল কিছুর ফায়সালা আল্লাহর নিকট।'

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী এ দুনিয়ার বুকে উম্মতের কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে এমন সমাজ-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যাতে কার্যকরভাবে পাপকে প্রতিহত করা যায় এবং পুণ্যকে লালন করা যায়। এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই বর্ণিত হয়েছে।

এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একে অন্যের উপর কোনরূপ শাসন জুলুম করবেনা, বহি:শত্রুকে মোকাবেলা করবে, কুরআন ও সুন্নার উল্লেখিত সুসমন্বিত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কায়েম করবে।[২৪] সূরা ৩ এর আয়াত ১০৪-এ এ মর্মে বলা হয়েছে যে, তোমরা পরিণত হও সে উম্মতে, যারা ভালোর দিকে আহ্বান করবে, পূণ্যকে উৎসাহিত করবে এবং পাপকে প্রতিরোধ করবে। এ কাজের জন্য তোমরা সুনির্বাচিত (এবং এর জন্য রয়েছে

পরকালীন সুখ)।' ইউসুফ আলীর মতে উক্ত আয়াতে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

এর তাৎপর্য হচ্ছে ১. ঈমান আনয়ন করা ২. সঠিক ও ন্যায় কাজ করা, অন্যের জন্য সৎকাজ করার উদাহরণে পরিণত হওয়া, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাতে সৎ কাজ বিরাজ করে ৩. পাপ কাজকে প্রতিহত করা এবং অন্যের জন্য অসৎকাজ প্রতিহত করার উদাহরণে পরিণত হওয়া এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাতে অন্যায় ও অবিচার পরাজিত হয়।[২৫]

উপরের উদ্ধৃতি ও তাফসীকারদের ব্যাখ্যা হতে এটা সুস্পষ্ট যে, ন্যায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও মানুষের জন্য তা সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা পরস্পর নির্ভরশীল এবং একটি ব্যতিরেকে অন্যটি সম্ভব নয়।

সাক্ষ্য হিসাবে নিজকে উপস্থাপন সমগ্র উম্মতের জন্য প্রযোজ্য। তবে শব্দ সমষ্টি 'তোমরা সেই উম্মায় পরিণত হও' যা দ্বারা সমগ্র উম্মতকে বোঝাতে পারে অথবা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হিসাবে একটি দলকে বোঝাতে পারে, যারা শরীয়াহর দিকে মানুষকে আহ্বান করার দায়িত্বভার বহন করবে এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে জীবনকে সুসমন্বিত করবে। আল তাবারী ও আল কুরতবী দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং ইবনে তাইমিয়া ইবনে খালদুন ও সমকালীন তফছীরকারকগণ প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে কুরআনের আয়াত ১২২ অনুযায়ী আল কুরআন মুসলমানদের মধ্যে একটি দল গঠন করার আহ্বান করেছে, যারা ঈমান আকিদা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং প্রচারের মাধ্যমে লোক শিক্ষা প্রদান করবে। কিন্তু একটি দল কর্তৃক ঈমান ও আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও প্রচার দ্বারা সমগ্র উম্মতের সাক্ষ্য হওয়া হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে কুরআন সত্যের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বিশেষ দল গঠনের ধারণাকে পরিহার করেছে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এ দায়িত্ব উম্মতের সমস্ত নরনারীর উপর অর্পণ করেছে। সূরা ৯ এর আয়াত ৭ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে, বিশ্বাসী নরনারীগণ একে অন্যের বন্ধু ও সহধর্মী; তারা সত্যের পতাকাকে সমুন্নত করে এবং পাপ কর্মকে প্রতিহত করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করে- তাদের উপর আল্লাহ তার অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, কেননা আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।'

এ ধরনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার প্রেক্ষিতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান হচ্ছে সকল সরকারের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ কার্যে সকল সক্ষম মুসলমানের জন্য ফরজ। সামগ্রিকভাবে সমস্ত উম্মতের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত এবং উম্মত কর্তৃক নির্বাচিত দল এ কাজের আনজাম দিতে পারে। এই কাজ না করা হলে প্রত্যেক মুসলমান নরনারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে।[২৬]

সমগ্র উম্মতের সাক্ষ্যদানের বিষয়টির নানা তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত এটা বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণী তৈরীর ধারণাকে বাতিল করে। এ ধারণাটি কুরআনের দৃষ্টিতে এতই

গর্হিত যে কুরআন সুস্পষ্টভাবে 'বিশ্বাসী নরনারী' শব্দের ব্যবহার দ্বারা সবার সাক্ষ্য দান বুঝিয়েছে। এ দায়িত্বশীলতা প্রশ্নটি কুরআনে উল্লেখিত উম্মাহ শব্দের সাথে সঙ্গতিশীল; কেননা তৌহিদী উম্মাহ হচ্ছে বিশ্বজনীন, সদৃচ্ছা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সামগ্রিক ও বৈষম্যহীন। পরিশেষে সমগ্র মুসলিম ইতিহাসব্যাপী উম্মাহ কর্তৃক এই দায়িত্বভার গ্রহণ মুসলিম জাহানে বিপ্লব ও পরিবর্তনের চাকাকে সচল রেখেছে।

মুসলিম উম্মাহ ঃ একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুসলিম উম্মতের উৎস সুদূর অতীতে সমাধিস্থ নয় অথবা এর জন্য কোন দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজন নেই। নবী করীম (সা) এর জীবন হতে এ উম্মত ধীরে ধীরে জন্মলাভ করেছে। তাঁর একনিষ্ঠ সংগ্রাম ও তাঁর সাহাবীদের জীবন গাঁথায় উম্মতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময়কাল

নবী করিম (সা) এর আহ্বানে যে ক্ষুদ্র দলটি প্রথমে সাড়া দিয়েছিল তাদের নিয়ে উম্মতের সূত্রপাত হয়। নবী সহধর্মিণী খাদিজা, তাঁর চাচাত ভাই আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর বন্ধু আবু বকর এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস জায়েদ ইবনে হারিছাহ উম্মতের প্রথম ক্ষুদ্র দলটি গঠন করে, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)। ৬১০-৬২২ খ্রি. এ অন্যান্য অনেকে তাদের সাথে যোগ দেন। তারা কলেমা-শাহাদাত উচ্চারণ করে 'আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায়' জীবনকে গঠন করেন (২:১৮৭)।

পৌত্তলিক মক্কার বণিক সমাজে মুসলিম উম্মাহ একটি সংকীর্ণ আবর্তে আবদ্ধ ছিল। মক্কার শীর্ষস্থানীয় গোত্র কোরাইশ নতুন উম্মতের সদস্যদের উপর কঠোর অত্যাচার-নির্যাতন চালনা করে, মক্কানগরী থেকে অনেককে বহিষ্কার করে এবং অবশেষে নবী করিম (সা) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহর নির্দেশে নবী করিম (সা) তার সাহাবাদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে মদীনায় হিজরত করেন এবং এভাবে ইসলামী সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।[২৭] এ হিজরতের মাধ্যমে মসলিমগণ এক ভূখণ্ডগত ভিত্তি লাভ করে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতার ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা আরবীয় জটিল গোত্রীয় প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ ও বিবর্তিত করে।[২৮] সংক্ষেপে হিজরতের সাথে সাথে একটি নতুন জীবনধারা, নতুন জনগোষ্ঠী ও নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা জন্মলাভ করে- যার ভিত্তিতে ছিল তওহীদী উম্মতের বিশ্বজনীনতা।

মদীনায় আগমনের পর নবী করিম (সা)-এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো মুসলমানদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক (মুয়াকাত) রচনা করা, যে সম্পর্ক ছিল রক্তের সম্পর্কের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। নবী করিম (সা) আলীকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে উদাহরণ স্থাপন করলেন। রাসূলুল্লাহর চাচা হামজার ভাই হলেন রাসূলুল্লাহ মুক্ত দাস জায়েদ ইবনে হারিসা। অন্যেরা এই উদাহরণ অনুসরণ করল (ছক ৫:১)

৬—

ছক ৫.১ নবী করিম (সা) কর্তৃক স্থাপিত জোড় ভ্রাতৃত্ব

আবু বকরের সাথে খারিজা ইবনে জুবাইর–
উমরের সাথে ইতরান বিন মালিক–
আবু উবায়দা আমির ইবনে আবদুল্লাহ-এর সাথে সাদ ইবনে মুয়াব ইবনে আল নুমান
আবদুর রহমান ইবনে আউফের সাথে সাদ আল রাবি
আল জুবাইর ইবনে আওয়ামের সাথে সালামা ইবনে সালামা ইবনে ওয়াক্কাস উসমান ইবনে আফফান এর সাথে আউস ইবনে সাবিত ইবনে আল মুনধীর
তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এর সাথে কাব ইবনে মালিক
সাদ ইবনে জায়ীদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল এর সাথে উবাই ইবনে কাব
মাসুদ ইবনে উম্মর এর সাথে আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে জায়িদ
আবু হুজাইফা ইবনে উতবা এর সাথে আব্বাস ইবনে বিশর ইবনে ওয়াক্কাস
আম্মার ইবনে ইয়াসীর (বনি মাখজুম এর মিত্র) এর সাথে হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান
আবু দার বুরাইর ইবনে জুনাদা আল গিফারী এর সাথে আল মুনধির ইবনে আমর
হাতিব ইবনে আবি বালতা (বনি আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জার মিত্র) এর সাথে উওয়াইম ইবনে হাতিব ইবনে সাদিয়াব (বনি আমর ইবনে আউফের ভ্রাতা)।
সালমান ফারসী এর সাথে আবু দারদা/বিলাল (হযরত আবু বকর কর্তৃক মুক্ত মানব) এর সাথে আবু রুয়াইয়া আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রাহমান আল খাতামী।

(সূত্র : ইবনে ইস্হাক; The life of Mohammad' / Alfred Guillaume কর্তৃক ইবনে ইসহাকের সীরাতে রাসূলুল্লাহ গ্রন্থের অনুবাদ (লন্ডন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৭, পৃ: ২৩৪-৫)

এর পরেই প্রবর্তিত হয় হজ্ব, জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দেস হতে মক্কার কাবার দিকে কেবলা পরিবর্তন (২:১৪৪)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মদীনার সংবিধান প্রণয়ন ও স্বাক্ষর। এ দলিল সম্পাদনের সাথে দু'টি পৃথক সত্তা সৃষ্টি হলো :
দারুল ইসলাম (শান্তির স্থান) দারুল হরব (যুদ্ধের স্থান)।[২৯] মুসলিম উম্মাহর মৌলনীতি সমূহ বিদায় হজ্জের ভাষণে বিধৃত যা নিম্নে উদ্ধৃত করা এখানে প্রাসঙ্গিক।[৩০]

"হে লোকসকল, আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, কেননা ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন উপলক্ষ্যে তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে কিনা আমি জানি না। হে মানব মণ্ডলী, আজ হতে তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পত্তি স্রষ্টার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত অলংঘিত ঘোষিত হইল। এ দিবস এবং এ মাস যেমন পবিত্র তেমনি তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পত্তি তদরূপ পবিত্র ঘোষিত হল। স্মরণ রেখো, তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে

হবে। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতেছি। যদি তোমরা কারো কাছ থেকে কিছু আমানত প্রাপ্ত হও, তবে প্রকৃত মালিককে সেই আমানত ফিরিয়ে দেবে। সুদ প্রথা অদ্য হতে রহিত করা হল। তবে তোমাদের আসল বজায় থাকবে। তোমরা কেউ বৈষম্য করবেনা, বা বৈষম্যের শিকার হইওনা। আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন যে আজ হতে সুদ অবৈধ এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব যা কিছু সুদ পেতেন তা প্রত্যাহার করা হলো। প্রাক ইসলামী যুগে হত্যার বদলে বদলা নেওয়ার প্রথা বাতিল করা হলো। এ ধরনের প্রথম যে বদলা আমি বাতিল করছি তা হলো রাবিয়াহ ইবনে আল হারিস ইবনে আবদুল মোত্তালিব এর হত্যার বদলা। হে লোকমণ্ডলী; শয়তান এ ভূখণ্ডে আর কোনদিন কোন উপাসনা পূজা অর্চনা পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছে; তদসত্ত্বেও সে তোমাদের কাজকর্মকে লঘু বা হালকা করে দেবার চেষ্টা করবে। তোমাদের ধর্মের খাতিরে তার বিষয়ে সতর্ক হও। হে মানবসমাজ, মাস সমূহের মধ্যে বিভ্রাট সৃষ্টি করা গুরুতর অবিশ্বাসের কাজ এবং এটা অবিশ্বাসীদের বিপথগামী হওয়াকে নিশ্চিত করে। কোন বৎসর তারা একটি কাজ করে। আবার অন্য বৎসর তা করা হতে বিরত থাকে; তারা এরূপ করে আল্লাহ যা অনুমোদন করেছেন তা বাতিল করার জন্য, আর যা বাতিল করেছেন তাকে অনুমতি দেয়ার জন্য। সে ভাবে সময় গণনা করা হয়, তা সব সময় একই রকম। আল্লাহ্ মাসকে বারো সংখ্যায় নির্ধারণ করেছেন। চারটি মাস পবিত্র। তিনটি মাস পরস্পর সন্নিহিত এবং অন্য মাসটি জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে। হে লোক মণ্ডলী, স্বামীর নিকট স্ত্রীর অধিকার আছে, স্ত্রীর নিকটও স্বামীর অধিকার আছে। যাদের তোমরা অনুমোদন করোনা তাদের সাথে তারা (স্ত্রীগণ) দেখা সাক্ষাৎ করবেনা এবং তোমরা কখনো জিনায় লিপ্ত হয়োনা। যদি তারা সীমা লংঘন করে তবে তোমরা তাদের শয্যা আলাদা করে দাও, নিষ্ঠুরতা ছাড়া তাদের ভর্ৎসনা করো। যদি তারা তোমাদের অধিকার রক্ষা করে, তবে সহৃদয়তার সাথে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করো। তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো, তাদের প্রতি সদয় থেকো, কেননা তারা তোমাদের সহধর্মিণী ও সাহায্যকারী। মনে রেখো তোমরা তাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর আমানত হিসাবে ও তার অনুমতিতে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছ। আমি যা তোমাদের বলছি তা ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা অনুসরণ করো তবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। হে মানব মণ্ডলী, আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করো। জেনে রেখো, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান মিলে একটি ভ্রাতৃসমাজ। কোন মুসলমানের কোন দ্রব্য কোন অন্য মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় তা প্রদান করে। তাই নিজের নফসের প্রতি জুলুম করোনা। হে আমার প্রভু আল্লাহ? আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পেরেছি?"

বিদায় হজ্বের ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ :

১. ইহা আনুগত্য, পরিচয় ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের বন্ধনকে বাতিল ঘোষণা করে;
২. ইহা সুদ এবং সুদ সম্পৃক্ত সকল ব্যবসাকে অবৈধ ঘোষণা করে;
৩. ইহা পারিবারিক সম্পর্ককে ভালোবাসা, সমতা ও ন্যায়পরাণয়তার উপর স্থাপন করে;
৪. ইহা জীবন, সম্পত্তি ও পরিবারকে আল্লাহর আমানত হিসাবে ঘোষণা করে, যার পবিত্রতা অলংঘনীয়।
৫. ইহা ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংহতি ঘোষণা করে;
৬. ইহা মুক্তির জন্য মুসলমানদের শরীয়াহ্ অনুসরণের নির্দেশ দেয়। মহানবী কর্তৃক এই ভাষণের সকল বক্তব্য আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রদান করা হয়।

মুসলিম পণ্ডিতগণের ঐকমত্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর শরিয়তী কর্তৃত্ব খোলাফায়ে রাশেদার উপর অর্পিত হয়েছে, যারা নিজেরা আইন প্রণয়নের কোন ঐশী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না অথবা তা ঘোষণা করারও কোন নবুয়তী কর্তৃত্ব রাখতেন না।[৩১] ঈমান আকিদার সংরক্ষণ ও দুনিয়াবী শাসক হিসাবে তাদের দায়িত্ব ছিল রাসূলের ঐতিহ্যকে বজায় রাখা ও শরীয়ার মাধ্যমে ধর্ম, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও উম্মাহকে পরিচালনা করা। এই সীমাবদ্ধ অর্থে তাঁরা ছিলেন নবীদের উত্তরসূরি এবং উম্মতের উপর তারা এভাবে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতেন। খলিফাগণ উম্মতের ঐক্যের সূত্র হিসাবে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক ছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী সময়ে উম্মাহ্

নবী করিম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার ঈমান, ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার স্বর্ণযুগে উম্মাহ্ মুসলেমীন এক রাজনৈতিক ঐক্যের ছত্রছায়ায় একতাবদ্ধ ছিল। সময়ের বিবর্তনে মুসলমানদের সহজ সরল জীবন ও গভীর ধর্মপরায়ণতার স্থান দখল করে নেয় শান শওকত, বিলাসিতা ও শরীয়াহ্ পালনে শিথিলতায়। বিশ্বভ্রাতৃত্বের ইসলামী মূল্যবোধ ও ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা মঞ্চের পেছনে সরে আসে এবং অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করে নেয় গোত্রীয় প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব। উমাইয়ারা ক্রমান্বয়ে খারেজী, শিয়া, আইন শাস্ত্রবিদ ও অনারবদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। উমাইয়া শাসনের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীক অবক্ষয় ও পতনের সাথে তারা মদীনার স্বর্ণযুগের তুলনা করে গভীর সমালোচনায় লিপ্ত হয়। শেষের দিকে উমাইয়ারা আরব ও অনারবদের সম্মিলিত করে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীনতার দিকে ফিরে যাবার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এ পদক্ষেপ মাওয়ালী ও অনারব মুসলমানদের সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারা আব্বাসীয়দের সাথে মিলিত হয়ে হিজরী ১৩২ সনে (৭৫০ খ্রি.) উমাইয়া শাসনের পতন ঘটানো হয়। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে জনসমর্থন লাভ করে আব্বাসীয়রা ধর্মপরায়ণতাকে তাদের শাসনের ভিত হিসাবে ঘোষণা করল এবং গোত্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মকে রাজনীতির ভিত্তি

হিসেবে গ্রহণ করল। সাইয়েদ আমীর আলীর মতে সামাজিক সাম্যতার নীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে আব্বাসীয় যুগকে পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী প্রলম্বিত করল অতঃপর বর্বর আক্রমণের মুখে তার পতন ঘটল।[৩২] অবশ্য আমীর আলীর বিশ্লেষণটি ভ্রান্তিমূলক। প্রথম সাতজন খলিফার শাসনামলে (হিজরী ১৩২-২১৮ সন/ ৭৪৯-৮২৮ খ্রি.) আব্বাসীয় খিলাফত শীর্ষ শিখরে আরোহন করল, যার অত্যুত্তম নজীর হচ্ছে বিখ্যাত খলিফা হারুন-আল রশীদের রাজত্বকাল (হিজরী ১৭০-১৯৪/ ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)।

অতঃপর ধীরে ধীরে গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজনৈতিক সংঘাত, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হলো ও খিলাফতের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে লাগল। হিজরী ৩৯০ সন/১০০০ খ্রি. এর দিকে আব্বাসীয় রাজত্ব ফাতিমী, হামদানী, বুওয়েহিদ, সামানীফ ও গজনভী সুলতানাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন শাসকদের কাজ ও উদ্দেশ্যে কোন ঐক্য ছিলনা, এবং তাদের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রতি আনুগত্যও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হিজরী ১৩২ সন/৭৫০ খ্রি. হতে শুরু করে হিজরী ১৩৪৩ সন/১৯২৪ খ্রি. সনে আটোম্যান খিলাফতের অবসান পর্যন্ত মুসলমানদের ইতিহাস ছিল দারুল ইসলামের রাজনৈতিক বিভক্তি এবং অবশেষে খিলাফত ব্যবস্থার অবসান। খিলাফত ব্যবস্থার অবসানের ফলে উম্মাহ ধ্বংস হয়ে গেছে বলা চলে না। ইবনে তাইমিয়ার মতে একক ও বিশ্বজনীন খিলাফত প্রতিষ্ঠার আর কোন ঐক্যসূত্র বজায় ছিল না। তাই মুসলমানদের উচিত স্ব স্ব অঞ্চলে শরিয়ার অনুসরণে স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গঠন করা। তারপর কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে উম্মতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করা।[৩৩]

সমকালীন পণ্ডিতগণ খিলাফতের আদর্শ তত্ত্ব থেকে স্খলনের জন্য অতীতের অধিকাংশ মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদগণের তাত্ত্বিক আলোচনার সমালোচনা করেছেন। সমকালীন পণ্ডিতগণ শরীয়াহর অনুশাসনের প্রয়োগের গুরুত্বের উপর অধিক জোর প্রদান করেছেন, যা উম্মাহর মঙ্গল সাধন করতে পারত। এমনকি যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমেও শরীয়ার অনুশাসন জারী করে উম্মতের ঐক্য বজায় রাখা হতো তাও বৈধ। ইবনে তাইমিয়া অবশ্য খলিফার পদবীর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে শরীয়াহর অনুশাসন অনুযায়ী উম্মতের আর্থ-রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার উপর জোর দেন। খিলাফতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে শরীয়াহর প্রকৃত অনুবর্তীতার দিকে গুরুত্ব স্থানান্তরিত হয়েছে মর্মে রোজেনথাল যে মত ব্যক্ত করেছিলেন তা সঠিক ছিলনা।[৩৪] বরং গুরুত্ব স্থানান্তরিত হয়েছিল বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসাবে খিলাফতের পরিবর্তে শুধুমাত্র শরীয়াহর মাধ্যমে উম্মতের ঐক্য স্থাপনের দিকে।

একক খিলাফতের পরিবর্তে ইসলামী আইন ও অনুশাসন প্রয়োগের মাধ্যমে উম্মতের ঐক্য রচনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শরীয়াহই যদি মুসলমানদের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার দিকনির্দেশক এবং ঐক্য সংহতির শক্তিশালী মাধ্যম হয়, তবে ইসমাইল-আল ফারুকীর মতে 'শরীয়াহ যা ইসলামী আইনই বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজের পুরোভাগ ও মেরুদণ্ড উভয় হিসাবে' পরিগণিত হবে।[৩৫] ঐক্যের এই অনুভূতি নৈতিক ও সামাজিক

সাম্যের পরিব্যাপ্ততা দ্বারা আরো শক্তিশালীভাবে প্রসারিত হয়। মার্শাল হডজশন বলেন, ইসলাম যেখানেই গিয়েছে :

'সেখানে সকল মুসলমানদের উপর একই আদর্শিক মানদণ্ড গ্রহণের চাপ সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একই ধরনের জীবন যাপন পদ্ধতি চালু হয়েছে,... সর্বত্রই বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি ঐক্য অনুভূতির সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছে,... চরম বৈষম্যমূলক ভৌগোলিক অবস্থানে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকচিহ্ন সমূহ সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান ছিল... এমনকি অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিরাজ করছিল।[৩৬]

মুসলিম বিশ্বের উপর ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র দারুল ইসলামে বস্তুগত ও উচ্চতর সাংস্কৃতিক একক বিশ্বদৃষ্টি ও ঈমানের একক ঐক্যসূত্র বজায় ছিল।

সমকালীন উম্মাহর অবস্থা

উপনিবেশিক ও সামগ্রিক পাশ্চাত্য আধিপত্যের অবমাননাকর পরিস্থিতিতে, মুসলিম উম্মাহর উপর শুধু রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যই নিপতিত হয়নি, তাদের স্বাতন্ত্রের চিহ্ন আদর্শিক ভিত্তিও ক্ষয়ে গিয়েছিল। উপনিবেশবাদীরা জাকাত ও জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি বাতিল করে দেয়। শরীয়ার সবকিছু কর্তন করে অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম পারিবারিক আইনকে যেন তেন প্রকারে অব্যাহত রাখা হয়। শরীয়ার সব কিছুকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়। মুসলিম উম্মাহর আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করে তাদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও হানাহানির বীজ বপন করা হয়।

বর্তমানে ৫২টি দেশ রয়েছে যাদেরকে মুসলিম উম্মাহর পরিসরের মধ্যে ধরা যায়। এসব দেশের সংবিধানে বিভিন্ন মাত্রায় ইসলামকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এসব দেশের সমাজদেহে শরীয়াহ ও ইসলামী মূল্যবোধের সম্পৃক্তির মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় সুদানে শরীয়াহর সামগ্রিক ব্যবস্থাকে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অপরদিকের বিপরীত উদাহরণ হিসাবে তুরস্ক ১৯২০ সালে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সকল বন্ধন ছিন্ন করা হয়। তাছাড়া বিশ্বের মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ অমুসলিম দেশসমূহে সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করছে।

জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের বাহক হিসাবে জাতি-রাষ্ট্র ধারণাকে দেশজ নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করে নেন এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এ মাধ্যমকে গ্রহণ করেন। বিষয়টি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আদর্শগত বিতর্কের জন্ম দেয়। জাতীয়তাবাদের ও উম্মাহর ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তার রয়েছে এলাকাভিত্তিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য আর উম্মাহর রয়েছে বিশ্বজনীন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ধারণা।[৩৭]

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

চরিত্রের দিক থেকে অস্পষ্ট ও রহস্যময়, জাতীয়তাবাদের ধারণাটির কোন একক সংজ্ঞা নেই। কার্লটন হাইয়েছ এর মতে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে 'আধুনিক দু'টি অনুভূতির সম্পৃক্তি-দেশপ্রেম ও জাতীয়তা'; শেফারের মতে এটি হচ্ছে, পৌরাণিক ও বাস্তবতার ভিত্তিতে বিশ্বাস ও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ; এবং ম্যানস কোহনের মতে, 'এটি হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থা, একটি সচেতন কর্ম, ব্যক্তি মানুষের 'আমরা একটি দল' এ অনুভূতির সাথে একাত্মতা, যা জাতিরাষ্ট্র ধারণার উপজাত'।[৩৮] যাহোক এই জাতীয়তাবাদী 'আমরা' ধারণাটি বিজাতীয় 'তাহারা' ধারণা হতে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এটা 'মূলত: একটি বিরুদ্ধ মনোভাব-- যা ঘৃণা ও ক্রোধের ভিত্তিতে পরিপুষ্টি লাভ করে এবং কোন প্রতিযোগী দলের বিরুদ্ধে চালিত হয়।'[৩৯] জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং এর মৌলবোধ থেকে অন্যান্য আদর্শ বিশেষ করে ধর্মীয়বোধ বিবর্জিত।[৪০]

'ইসলামী ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য' উপনিবেশবাদীরা জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।[৪১] উপনিবেশবাদের শেষের দিকে এ ধারণার গোড়াপত্তন হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতা লাভের অস্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার শুরু করে। জাতীয়তাবাদী ধারণা 'কখনো মুসলিম মূলধারার গণমানসে স্থান লাভ করেনি।[৪২] জাতীয়তাবাদী ধারণা বিশ্বের মুসলমান অঞ্চলের উপর পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদ অব্যাহত রাখার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জাতীয়তাবাদী ধারণা ইসলামী ধারণার সমান্তরালে চলে এসেছে। চেতনা ও লক্ষ্যের দিক থেকে তারা পরস্পর বিরোধী। জাতীয়তাবাদের ধারণা বিভিন্নভাবে উম্মাহর ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমত: জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক ধরনের সপ্রশংসিত গোষ্ঠীপ্রীতি, যে ধারণা নবী করিম (সা) প্রত্যাখ্যান করেছেন: সে আমাদের দল ভূক্ত নয় যে নিজকে কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং সেভাবে মৃত্যুবরণ করে।'[৪৩] অন্য একটি হাদীস অনুযায়ী :

'মানুষ দু'ধরনের : প্রথমত: যারা স্বজ্ঞানে বিশ্বাসী, আর দ্বিতীয়ভাগে সীমালংঘনকারী ও বিপথগামী ছিল। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট। জাতীয়তাবোধের গর্ব মানুষের পরিত্যাগ করা উচিৎ, কেননা এ বোধ হচ্ছে জাহান্নামের কয়লা স্বরূপ। যদি তারা এই বোধ ধারণা পরিত্যাগ না করে তবে আল্লাহ তাদের নীচ কীট হিসাবে গণ্য করে পুতিগন্ধময় পুরিষে প্রবিষ্ট করাবেন।'[৪৪]

দ্বিতীয়ত জাতীয়তাবাদ ভাষাগত, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিসত্তাগত ও অন্যান্য সবধরনের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, যা কুরআনে বর্ণিত উম্মাহর ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। উম্মাহ মুসলিমাহ ভূখণ্ড, ভাষা, জাতি বা ইতিহাস দ্বারা আবদ্ধ নয় এবং এর একমাত্র ভিত্তি তাওহীদ। কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, তোমাদের এ উম্মাহ একক ও ঐক্যবদ্ধ এবং আমি তোমাদের প্রভু এবং আমার আনুগত্য কর' (২১:৯২)।

তৃতীয়ত: জাতীয়তাবাদ জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এমনকি অন্যের ক্ষতির বিনিময়েও। অপরদিকে কুরআন দাবী করে যে, উম্মাহ্ ভালো ও পুণ্যের উদ্বোধন ঘটাবে ও মন্দকে প্রতিহত করবে, 'ধর্মভীরুতা অর্জনের জন্য ভালো কাজে' সহযোগিতা করবে; পাপ, অপরাধ ও আক্রমণকে পরাভূত করার জন্য বিরোধীদের বাধা দিবে (৫:৩)। চতুর্থত: জাতীয়তাবাদ মুসলিম বিশ্বের মাঝে সামাজিক বিরোধ ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের দুয়ার উন্মোচন করে হানাহানি বৃদ্ধি করে। জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের মূল ঐক্যসূত্র ও বৈশিষ্ট্য উম্মাহর ধারণার ভিত্তি প্রস্তরকে ক্ষয় করে। পক্ষান্তরে উম্মাহ্ হচ্ছে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যার রয়েছে শক্তিশালী ও ব্যাপক আদর্শ, বিশ্ব সরকার এবং তা বাস্তবায়নের বিশ্বসেনা বাহিনী।[৪৫]

ছক : ৫.২ জাতীয়তাবাদ ও উম্মাহর তুলনা

জাতীয়তাবাদ	উম্মাহ্
জাতির প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে	উম্মাহর প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে
জাতি ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বভৌম ও বৈধতার উৎস মনে করে	শরীয়াহকে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস মনে করে
জাতিগোষ্ঠী, ভাষা, জাতিসত্তা ও অন্যান্য বিবেচনার ভিত্তিতে গঠিত	আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত
কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্তরেখা তৈরী করে	সকল কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে
মানুষের মধ্যকার ঐক্যসূত্রকে বিনষ্ট করে	বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে
উম্মাহকে জাতিরাষ্ট্র সমূহে বিভক্ত করে	সমস্ত বিশ্ব মুসলিমকে একই উম্মাহয় পরিণত করে।

যে সব যুক্তি উপরে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ছক ৫.২-এ সন্নিবেশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে সাইয়েদ মওদূদী, হাসান-আল বান্না (হিজরী ১৩২৪-১৩৬৯ সন/১৯০৬-১৯৪৯ খ্রি., সাইয়েদ কুতুব ও অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতবর্গ সকল ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের মতে, মওদূদীর ভাষায়, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে- 'বর্তমান বিশ্বে মানবতা যে সব বিপর্যয় ও বিপদ আপদে নিপতিত তার মূল কারণ।'[৪৬] এমনকি তারা বিদেশী আধিপত্য প্রতিহত করতে ও জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার বিরোধী।[৪৭] জনগণের ভোটাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সংকীর্ণ চেতনা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সাথে শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী বিশ্বজনীনতার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'তাজদিদ ইসলাহ' বা ইসলামী পুনর্গঠন আন্দোলন শক্তিশালী হবার পর ১৯৭০ দশক হতে জাতীয়তাবাদী ধারণার শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে জাতীয়তাবাদী ধারণা অপসৃত হয়েছে অথবা মুসলিম মানসিকতা হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আরব জাতীয়তাবাদ বনাম উম্মাহ্

সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তা সমানভাবে আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। আরব জাতীয়তাবাদ, আবদ আল রাহমান আল-বাজ্জাজ এর মতে, 'ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মবাদ ও জীবনের মৌলিক বোধের ভিত্তিতে স্থাপিত' এবং ইসলাম, 'মূলত এবং অপরিহার্যভাবে আরবদের জন্য নাজিল হয়েছে'।[৪৮] আরব জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক জনক সাতি-আল হুসরী 'আদ-দ্বীন- লিল্লাহ্ ওয়া-ওয়াতান লিযামী' তথা 'ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য এবং জন্মভূমি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য' তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।[৪৯] এ জাতীয়তাবাদী তত্ত্বে এ বাণী নিহিত রয়েছে যে, আরবরা জাতিগতভাবে অন্যান্য মুসলিম জনগণ হতে পৃথক। এ কথা সত্য যে, ইসলামী বিশ্বজনীনতা সকল প্রকার জাতীয় ও গোষ্ঠীগত বিভিন্নতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, ইসলামের আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বিশেষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে নৈতিক আদর্শ হিসাবে ইসলাম আরব গোষ্ঠী প্রীতি তথা আরব জাতীয়তাকে অহংকার হিসাবে গ্রহণ করাকে জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছে। এটা সত্য যে, কুরআন আরবী ভাষায় নাজেল হয়েছে, কতিপয় প্রাক-ইসলামিক সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতিতে স্থান পেয়েছে এবং স্বয়ং নবী করিম (সা) একজন আরব ছিলেন। তবে একথাও সমভাবে সত্য (যা উক্ত আরব জাতীয়তাবাদের ভুল ধারণার অনুসারীরা স্বীকার করেনি) যে, কুরআন আরবী ভাষায় নাজিল হওয়ার কারণ আরব জনগণের বোধগম্যতার জন্য এবং তাদের অনুভূতিকে নাড়া দেবার জন্য। আরবদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আরব গোত্রীয় সংস্কৃতি বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নৈতিকতাবোধ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, ইসলামী ঐশী প্রত্যাদেশ আরবী ভাষার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং 'ভাষাশৈলীর অনন্য উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৫০] কুরআন নাজেল হওয়ার পর আরবী ভাষা কোন বিশেষ লোক সমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সমগ্র উম্মতের জন্য ঐশী ভাষা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, যেমন করে নবী করিম (সা) সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে।

'আরবী জাতীয়তাবাদকে কুরআনের সাথে সমার্থক হিসাবে গণ্য করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। ইসলামের পশ্চিমা শত্রুরা এটা করেছে এবং 'উরুবাই' শব্দটি আমদানী করেছে যার জাতিবিদ্বেষী অর্থ হচ্ছে- আরব মুসলমানদেরকে তাদের অনারব মুসলমান ভাইদের থেকে পৃথক করে ফেলা।

এ তথাকথিত আরব জাতীয়তাবাদ বা 'সুবিয়াহ' এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে দ্বিধা বিভক্ত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়া।'[৫১]

ইসলাম সচেতন আরবরা তাই আরব জাতীয়তাবাদকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করেন না। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় আলেমবৃন্দ ও

মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা ও কর্মীগণ আরব জাতীয়তাবাদী ধারণার নিন্দা করেছেন এবং সমগ্র আরব জাহানকে একমাত্র ঈমানের ভিত্তিতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সাথে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হবার আহ্বান জানান। ধারণাগতভাবে আরব জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলার জন্য ইহুদী খ্রিস্টানদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। যে সব বুদ্ধিজীবীর ইসলাম সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা রয়েছে, তারাও বিভ্রান্তিমূলকভাবে এ আরব জাতীয়তাবাদী ধারণার শিকারে পরিণত হয়েছেন। আল আজহারের উলেমাদের সাম্প্রতিক আরব জাহানের ঐক্যের আহ্বান রাজনৈতিক বিবেচনা প্রসূত মাত্র এবং ইসরাইলী আগ্রাসনের মোকাবেলার জন্য।[৫২] অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিতই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বিজাতীয় এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করা।

উপসংহার

তৌহিদের ভিত্তিতে সংস্থাপিত মুসলিম উম্মাহ সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত ও সুসংগঠিতভাবে সমন্বিত। মুসলিম উম্মাহর সদস্যগণ সমষ্টিগত ও এককভাবে ভালো কাজের উদ্বোধন ও মন্দ কাজের প্রতিহত করার জন্য দায়বদ্ধ এবং এ সত্যের সাক্ষ্যবাহী যে 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসূল।'

অটোম্যান খিলাফতের পতন, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য এবং সারাবিশ্বে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ইউরোপীয় শক্তির প্রাধান্য শরীয়াহর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করে। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক বিভেদ ছাপিয়ে এক এবং ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর ধারণা মুসলিম মানসে জাগ্রত ও জীবন্ত স্থান দখল করে আছে। এ ঐক্যবোধ শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে নয় বরং একটি সামগ্রিক ঐক্যতা স্থাপনের আধ্যাত্মিক স্পৃহায় বিস্তৃত হয়ে আছে এমনভাবে যে মুসলিম বিশ্বের কোথায় কোন আঘাত আসলে অন্যস্থানে সে আঘাতের ব্যথা অনুভূত হয়। সমস্ত সীমান্তপ্রাচীর ভেঙ্গে এক মুসলিম উম্মাহর এ চেতনা ও ধারণাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে এবং অব্যাহত রয়েছে। এসব সমন্বিত প্রচেষ্টা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

খিলাফত ঃ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামে ধর্মের সাথে রাজনীতি, আইন ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে- এই গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐশী ইচ্ছা ও নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বসমাজকে সঠিকভাবে গঠন ও রূপদান। ইসলাম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবশ্যই সমার্থক নয়, তবু রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামে ধর্মব্যবস্থা বাস্তবায়নের বাহন হিসাবে গণ্য করা হয়।[১] এ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ইসলামী ঐশী নীতিমালা প্রয়োগের যন্ত্রস্বরূপ, যা একজন বিশ্বাসী মানুষের জীবনের সকল অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত ও জীবনের সকল দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। রোজেনথাল যা প্রয়োজন মনে করেননি তার বিপরীতে ফকিহ্গণ তাই এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন যে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কেন এবং আদৌ রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।[২] উম্মাহ্র প্রয়োজন ও ইসলামী বিশ্বজনীনতার প্রসঙ্গে আলকুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও অসংখ্য হাদীসের বাণীর প্রেক্ষাপটে ফকিহ্গণ একটি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশবাদের আগমন ও পরবর্তীতে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহ ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক দখল ও শাসনের অব্যাহত প্রবাহ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চলমান আইনগত, রাজনৈতিক ও দার্শনিক নিরীক্ষামূলক আলোচনা ও গবেষণার ধারাকে স্তিমিত করে দেয়। উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে ইসলাম মূল ঐক্যশক্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে যার প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রশ্নটি পুনর্জীবিত ও উত্থাপিত হয়েছে। তখন হতে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ে ভাবনা, চিন্তা ও বিশদভাবে বিশ্লেষণ হয়েছে; তবু এর প্রকৃতি, ধরন ও রূপরেখার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা এখনো রয়ে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের জাতি রাষ্ট্রের ধারণার সাথে প্রায়শই এর তাত্ত্বিক ধারণার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রাষ্ট্র

গ্রীক দার্শনিকগণ প্রথম রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সুবিন্যস্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন। এরিস্টটলের মতে মানুষ প্রকৃতগতভাবে রাজনৈতিক জীব, একটি যুথবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করা তার প্রকৃতি, কেবলমাত্র যার মধ্যদিয়ে সে তার সর্বোচ্চ নৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে।[৩] প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে সাধারণ কল্যাণ ও নৈতিক

পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং এটা একই সাথে ধর্মীয় সম্প্রদায় সংঘ ও সামাজিকীকরণ সংস্থা হিসাবে কাজ করে- যা সাধারণভাবে ব্যক্তি মানুষের মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত থাকে। তাঁরা ব্যক্তিমানুষকে এমন এক সত্তা রূপে দেখেছেন যার স্বাভাবিক প্রবণতা শুভের দিকে এবং তাই তারা মানুষের নৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক আবহে মানুষের যুথবদ্ধতার অনুভূতির তথা নৈতিক বিশ্বাসের সাধারণ ঐক্যমত্যের উপর তারা জোর দিয়েছেন।

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.) সময় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা ও গুরুত্ব সমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে। তাত্ত্বিকগণ মানুষকে এমন স্বার্থপর এক প্রাণী রূপে দেখতে থাকেন যার ক্ষমতার পর আরো ক্ষমতা প্রাপ্তির অদম্য ও অবিশ্রান্ত লিপ্সা শুধু মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত অনিশেষ থাকে।'[৫] পরবর্তীতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু শুভবোধ ও নৈতিকতা হতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত ও নিবদ্ধ হয়। এ আলোচনা চলতে থাকতে কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-৮৩ খ্রি.) ও ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০ খ্রি.) পর্যন্ত, যাদের কাছে সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা বহুলাংশে ঋণী। মার্ক্স ও ওয়েবার উভয়েই জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই মর্মে রায় প্রদান করেন। পক্ষান্তরে তাঁরা রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীবর্গের বিশ্লেষণ ও তাদের আচরণের উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত করেন। প্রত্যেক শ্রেণীবর্গের মধ্যে ব্যক্তিমানুষ একটি স্বার্থপর সদস্য, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে উভয়ই তাতে তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন। উভয়ে রাষ্ট্রকে দেখেছেন ক্ষমতা, শক্তি আধিপত্যকে শাসন ব্যবস্থার বস্তুগত ভিত্তির নিরিখে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিষয়াবলীর উপর তুলনামূলক গুরুত্ব আরোপ, লক্ষ্য ও কাংখিত লক্ষ্য সাধনে পন্থা ও উপায় নির্ণয়ের ভিন্নতার মাঝে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে কার্লমার্ক্সসের ধারণা

মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী স্বার্থ বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রামের ফসল এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী গোষ্ঠী দ্বারা।

বর্জুয়া রাষ্ট্র হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী শোষক শ্রেণীর হাতে সমাজের নিগৃহীত ও শোষিত শ্রেণীর উপর শাসন ও শোষণের যন্ত্র। সরকার হচ্ছে শাসক শ্রেণীর 'পরিচালন বা নির্বাহী পরিষদ', যারা শাসক শ্রেণীর দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সমাজের মানুষের আচার আচরণ ও কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে। বর্জুয়া রাষ্ট্রে রয়েছে একধরনের আপেক্ষিক স্বায়ত্বশাসন এবং নিরপেক্ষতার বহি:আবরণ। ধরনের দিক থেকে এটা গণতান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু এ রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো এমন অসমভাবে বিন্যস্ত যাতে সংখ্যালঘু বর্জুয়া শ্রেণীর অব্যাহত আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকে।

মার্ক্সের মতে যেহেতু রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী ভিত্তিক, এবং শ্রেণীর অস্তিত্বে রয়েছে বিরোধ ও বিভাজন, তাই বর্জুয়া রাষ্ট্রে পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রবণতা বিরাজ করে। মার্ক্সের মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উচ্চমাত্রার উৎপাদন মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে বিপুল সম্পদের কেন্দ্রীভবন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গভীর দারিদ্রের বিনিময়ে অর্জিত হয়। তিনি মনে করেন, এই ব্যবস্থা অবশ্যই কমিউনিস্ট সমাজ দ্বারা অপসারিত হবে, যেখানে সম্পদ ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের বিকাশ ঘটবে এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন পূরিত হবে। এ ধরনের একটি ব্যবস্থায় কোন সংঘাত থাকবেনা, ফলে নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রেরও কোন আবশ্যকতা থাকবে না। এভাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে।[৬]

রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েবারের মতবাদ

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সসীয় বিশ্লেষণের বহু বিষয়ের সাথে ম্যাক্সওয়েবার একমত পোষণ করেন, তবে তিনি শ্রেণীহীন সমাজের ধারণাকে অবাস্তব বলে অভিহিত করেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মার্ক্সসীয় সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি মন্তব্য করেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোন ফারাক নেই, কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমন বর্জুয়াশ্রেণী আধিপত্য করে তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী আধিপত্য করে থাকে। তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে 'ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রাধান্য ও আধিপত্য, যা শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বিস্তার করা হয়ে থাকে'।[৭] ওয়েবার এ সম্পর্ককে বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োজনীয় মনে করেন, যেহেতু সম্পত্তিই প্রাধান্য ও আধিপত্যের বস্তুগত ভিত্তি ও উপকরণ সরবরাহ করে, সেই আধিপত্য প্রশাসনিক বা নিপীড়নমূলক যাই হোক না কেন। এই আধিপত্যকে কিভাবে আইন সঙ্গত রূপ দেয়া যায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করাকেই তিনি তার সমীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন। 'সহিংসশক্তির প্রয়োগ রীতি সম্পর্কে অবহিত' কোন সামাজিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান না থাকলে সমাজে 'নৈরাজ্যের' সৃষ্টি হবে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[৮] রাষ্ট্রকে এমন একটি 'মানব সংগঠন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বৈধভাবে শক্তি প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকার দাবী করতে পারে।'[৯] শক্তি প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকারকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় এ কারণে যে এতে সংঘাত, সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আধিপত্যের যৌক্তিকতা অবশ্য বৈধ আদেশ পালনের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে।

Dahl প্রণীত Who Governs? গ্রন্থটিতে রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েবারের ধারণার উপর ভিত্তি করে বহুমাত্রিক রাজনীতির বিষয়ে সমীক্ষা ও পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়েছে।[১০] Dahl রাষ্ট্রকে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী কেন্দ্রীয় স্থান অধিকারী লোকসমষ্টি ও শাসিত শ্রেণীর লোকবর্গের সম্মিলন হিসাবে দেখেছেন। রাজনৈতিক জগতটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সমষ্টির দ্বারা গঠিত যাদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক শক্তি ও সম্পদ রয়েছে। বিভিন্ন স্বার্থ ও সম্পদরাজির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে জননীতি নির্ণীত হয়।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রেক্ষাপট হতে রাষ্ট্র ধারণার অবয়বগ্রহণ কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। এতে রাষ্ট্রীয় আচরণের ব্যাখ্যায় জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্বের সনাতন বিশ্লেষণের সাথে শ্রেণী বিশ্লেষণ বা গোষ্ঠী মিথস্ক্রিয়া ও গতিশীলতা যুক্ত হয়েছে। যে শ্রেণী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণীর জন্য কিছু ভূমিকা সংরক্ষণ করে, তদরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রলেতরিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবস্থাও সমাজতন্ত্রের পথে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বর্জুয়া রাষ্ট্র কাঠামোর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদান অক্ষুণ্ন রাখে। উভয় ব্যবস্থাতে শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থকে সমাজের ব্যক্তি মানুষের স্বার্থ ও অধিকারের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়। পরিশেষে উভয় ব্যবস্থাই ব্যক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক এমনকি বস্তুগত কল্যাণের বিষয়েও সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে।

ইসলামী ব্যবস্থার নিরিখে রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য মডেল মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। যে কাঠামো ইসলাম অনুমোদন করে তা জনগোষ্ঠী বা ভূ-খণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। জনগোষ্ঠী ও ভূ-খণ্ড নিশ্চিতভাবে প্রয়োজনীয় কিন্তু এগুলো একটি বিশ্বব্যবস্থা গঠনের পথে যান্ত্রিক প্রয়োজন মাত্র। ইসলাম শুধুমাত্র একটি ভূ-খণ্ডের অভিলাষী নয় বরং সমগ্র বিশ্বের ভূ-খণ্ডকে একমাত্র স্রষ্টার ঐশী ইচ্ছার বাস্তবায়ন ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত করতে চায়। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বজনীন, তাই একটুকরো ভূখণ্ডের মাঝে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একই সাথে ইসলামের বাণী কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিসত্তার প্রতি নয় বরং সমগ্র মানব সমাজের জন্যে। জাতি-রাষ্ট্রের মত নয়, বরং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন এক মুক্ত সমাজ যার দুয়ার ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। দেশপ্রেম এবং স্বদেশের প্রতিরক্ষা ইসলামে স্বীকৃত ও উৎসাহিত। তবে এই দেশপ্রেম ইসলামী দুর্গের প্রতিরক্ষায় বিশেষভাবে উৎসাহিত। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা, যেখানে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তাও ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও আইনী আওতায় একটি বিজাতীয় ধারণা এবং একে বায়াত গ্রহণ বা শুরা ব্যবস্থার সাথে সমার্থক বিবেচনা করা যায় না। ইসলামী রাজনীতিতে আইন পরিষদ শরিয়া দ্বারা পরিচালিত এবং আইন পরিষদের কাজ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত নীতিমালা ও মূল্যবোধ সমূহ বাস্তবায়ন করা। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি আদর্শগত ধারণা। বিশ্বাসীদের নিয়ে এ সমাজ গঠিত এবং এর লক্ষ্য আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করা, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করা এবং সৎকাজকে উদ্বুদ্ধ করা ও অসৎকাজকে নির্মূল করা। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের মত নয় বরং এর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং তা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের চরিতার্থ নয়।

তৌহিদে অবিচল বিশ্বাস ও শরীয়া দ্বারা শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে উভয়ের স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত। ইসলাম পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মত জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের সার্বভৌম বৈধতায় বিশ্বাসী নয়। ইসলামী ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্তের সার্বভৌম বৈধতার উৎস হচ্ছে শরীয়াহ এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে ঐশী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ।

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয় রবং ইসলামের মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের পন্থা বা উপলক্ষ- তা হলো সর্বমানুষের বস্তুগত ও আত্মিক কল্যাণের জন্যে একটি বিশ্বজনীন নৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি। ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থা হচ্ছে কতগুলো চিরকালীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্থাপিত। এ গভীরতম মূল্যবোধসমূহ হচ্ছে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস এবং তা ব্যক্তির সাথে রাজনীতির ও রাজনীতির সাথে সমগ্র সমাজের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। এই মূল্যবোধ ও ঐশী অনুশাসন সমূহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিমালা নির্ধারণ করে যার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে।

ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা

জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা, যার আরবী পরিভাষা হচ্ছে 'দাওলাহ' তা ইউরোপে সার্বভৌমত্বের *(দিয়াদাহ)* ধারণার মতই সাম্প্রতিক ধারণা ও পরিভাষা। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির সাথে জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণাটি সম্পৃক্ত এবং সার্বভৌমত্বের ধারণাটি প্রথমত: ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ডীন বডিন (১৫৩০-৯৬ খ্রি.) কর্তৃক উদ্ভাসিত। তাই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে রাষ্ট্রের পরিভাষাটি যেমন কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়েও এ পরিভাষাটি প্রচলিত ছিল না।[১১] প্রথম যুগের ফকিহগণ 'খিলাফত' বা 'ইমামত' শব্দদ্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝাতে ব্যবহার করেছেন। 'দাওলাহ' পরিভাষাটি হিজরী সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং ক্ষমতাহীন খলিফার নামেমাত্র আনুগত্যশীল মুসলিম রাজবংশ সমূহকে আখ্যায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।[১২] 'খিলাফত শব্দের বিকল্প' হিসাবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করতে আরো আটশতাব্দী পেরিয়ে যায়।[১৩] এই অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ে ১৯২৪ সালে খিলাফতের বিলুপ্তিসহ অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' পরিভাষাটি ভাষার একটি অপপ্রয়োগ এবং একে 'ইসলামী রাজনীতি' বা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সঙ্গত। যদিও 'রাষ্ট্র' বা 'রাজনীতি' শব্দদ্বয় কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তবে এর অপরিহার্য যে উপাদানসমূহ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আল কুরআনে রয়েছে। এ হতে প্রতীয়মান যে পরিভাষা না হলেও এ ধারণাগুলি আল কুরআনে বর্ণিত এবং বোঝান হয়েছে।[১৪] উদাহরণস্বরূপ কুরআনে কতিপয় নীতিমালা বা কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে যা একটি সমাজরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের নির্দেশ করেছে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত কর্তৃত্বের উল্লেখ রয়েছে। এসবের

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন শব্দাবলী যেমন 'আহদ' (চুক্তি), 'আমানাহ' (বিশ্বস্ততা), 'ইতায়াহ' (আনুগত্য) এবং 'হুকুম' (কানুন বা বিচার)।[১৫] যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের জন্য রয়েছে সাধারণ আইন বা নির্দেশনা। এসব আইন বা নির্দেশনার লক্ষ্য হচ্ছে অন্যান্য ব্যবস্থা হতে ভিন্ন বিশেষগুণে গুণান্বিত 'ভারসাম্যমূলক ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিম সম্প্রদায়' গঠন, যা হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমাজ। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এমন কতিপয় বাধ্যবাধকতামূলক ধর্মীয় কার্য যথা যাকাত সংগ্রহ, দুষ্কৃতকারী ও দুর্বৃত্তদের শাস্তি প্রদান, জিহাদ সংগঠন ইত্যাদি, যা কোন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আনুষ্ঠানিক হস্তক্ষেপ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

ছক. ৬.১ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

নীতিমালা	অর্থ	কুরআনের প্রাসংগিক আয়াত
তাওহীদ	'আল্লাহপাকের অবিচ্ছেদ্য অবিভাজ্য ঐশ্বরিকতা	১:২; ৩:১৫৪; ৫:৩৮-৪০; ৬:১০২, ১৬৪; ৭:৩, ৫৪; ১০:৩১; ১২:৪০; ১৩:৩৭; ১৫:৩৬; ৪২:১০; ৪৮:৪; ৫৭:২-৩; ১১২:১-৪;
শরীয়াহ	'পানির প্রস্রবনের দিকের পথ' কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী আইন	৫:৪৮; ৭:১৬৩; ৪২:১৩; ২১: ৪৫:১৮
আদালাহ	ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা	৪:৫৮; ১৩৫; ৫:৩; ৯',৪৫; ৭:২৯; ১৬, ৯০, ১৫২; ৪২:১৫; ৫৫:৯
স্বাধীনতা (হুররিয়াহ)	শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তি ও সামষ্টিক কল্যাণ লাভের জন্য ব্যক্তি ইচ্ছার প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা	২:২৮৬; ৪:৮০; ১০:৯৯; ১৮:২৯; ৭৪:৩৯, ৫৬; ৭৬:২৯; ৮১:২৮
সমতা (মুসাওয়াহ)	ব্যক্তিমানুষের প্রতিভা ও কর্মশক্তি সর্বোচ্চ স্ফুরণের জন্য সমতাভিত্তিক সুযোগ	২:৩০; ৪:১;৬:১০৪, ১৫১; ১২:৪০'
শুরা	পারস্পরিক পরামর্শ	২:২৩৩; ৩:১৫৯; ৪২:৩৮

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রদান করেছে (ছক ৬.১ দ্রষ্টব্য)। প্রথম হচ্ছে তাওহীদ, যার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য ঐশ্বরিকতা। এই নীতিমালা স্বকীয় ও নিজস্ব ক্ষমতা, কাউকে

কতিপয় বিষয় করা বা না করার নির্দেশ দানের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকা স্বীকার করে না-আদেশদানকারী সে সত্তা 'হবস' বর্ণিত সম্রাট বা আইনগত কাঠামোয় 'রাষ্ট্র' যাই হোক না কেন।

কেননা কুরআন ঘোষণা করে, 'আদেশ দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর' (৬:৫৭)। 'কে এই মহাবিশ্বের প্রভু' (১:১) এবং (কে) হিদায়েত প্রদান করেন' (৮৭:৩)। আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ মানবজাতির কাছে দু'ভাবে এসেছে : প্রথমত কুরআন, যে ঐশী গ্রন্থ হতে ইসলামের সকল নির্দেশনা ও অধ্যাদেশ সমূহ অনুসৃত। দ্বিতীয়ত: শেষ নবী (সা) এর আদর্শ জীবনাচরণ বা সুন্নাহ যা কুরআনের সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাদানকারী সূত্র। এ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ যা সকল কর্তৃত্বের উৎসমূল (বিষয়টি চতুর্থ অধ্যায়ে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে)। এর অর্থ ,কোন কর্তৃত্বের প্রদত্ত কোন আইন, পদ্ধতি, বিধিবিধান, সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত আইনত বাধ্যতামূলক ও বৈধভাবে জনগণের উপর প্রয়োগযোগ্য হতে পারে না যদি না তা খোদায়ী আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। কুরআন সুস্পষ্টভাবে বিশ্ববাসীদের প্রতি আহ্বান জানায়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী তাদের মধ্যে তোমরা বিচার কর' (৫:৪৯) এবং কুরআন আদেশ লংঘনকারীদের খেয়ানতকারী' 'দুষ্কৃতকারী' ও 'বিদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করে নিন্দা করেছে (৫:৪৪, ৪৫, ৪৭)। শরীয়াহর পতাকা উর্ধে তুলে ধরে ইসলাম ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে নয় বরং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সরকারের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছে।

পরবর্তী নীতি হচ্ছে 'আদালাহ' তথা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, 'যদি তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এমন কি নিজের বিরুদ্ধেও হয়' (৪:৫৫, ৪:১৩৫)। বিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণ হতে আদেশ করা হয়েছে, কেননা 'ধর্মপরায়ণতার পরেই ন্যায়পরায়ণতার স্থান' (৩৮:২৪)। নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন যাতে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারে।' (৫৭:২৫)।

'সত্য' ও 'আল্লাহ'র পথ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নবী করিম (সা.) নির্দেশিত হয়েছিলেন' (২:২৪); অধিকাংশ তাফছীরকার সত্য ও আল্লাহর পথ' শব্দদ্বয় বলতে ন্যায়পরায়ণতা' ও 'সুবিচার' বুঝিয়েছেন। কুরআনে ন্যায়বিচারের তাৎপর্য বোঝাতে বহুবিধ শব্দ যথা 'সুন্নাতুল্লাহ' (আল্লাহর পথ বা পন্থা), 'মিজান' (দাড়িপাল্লা), 'কিসৃত' ও 'আদল' (উভয় শব্দই সুবিচার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যক্তিমানুষ কর্তৃক সৎকাজের দায়িত্বপালন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ; বিদ্রোহ, অবিচার, লজ্জাকর ও গর্হিত কাজ পরিহার; অসৎইচ্ছা বা বিদ্বেষের বলে অন্যের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর কুরআন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন শুধুমাত্র দুর্বল ও নিপীড়িতের প্রতি সুবিচারের কথাই বলেনি এবং সমাজে হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও সীমালংঘনকারীদের প্রতি কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ

করেছে। কুরআন ব্যক্তিমানুষের কাছে এমন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ দাবী করে যে প্রয়োজনে সে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একটি ন্যায়পরায়ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন সব ন্যায়বান ও দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয় যারা ন্যায় ও সততার সাথে জননীতি পরিচালনা এবং সকল সম্পদ ও সুযোগ ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিলি বণ্টন ও বিন্যস্ত করবে।

আদালাহ্ হচ্ছে স্বাধীনতা ও সমতা'র দু'টি মৌলিক নীতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচারের এমন একটি অপরিহার্য শর্ত ও পরিবেশ যে, জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের নৈতিক ও শুভ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক ইচ্ছা ও পছন্দ ঘোষণা করতে পারে এবং বিশ্বাস ও পছন্দমাফিক স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।[১৬]

কুরআনের বাণী 'লা ইকরাহা ফী আদ-দ্বীন' (২:২৫৬) যার অর্থ 'দ্বীন-ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।' শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ের প্রসঙ্গেই বলা হয় নাই, বরং মানবজীবনের সকল বিষয়ের দিকে এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানব জীবনকে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়কে কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু ও অমুসলিম সমাজের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী সমাজ রাষ্ট্রে অমুসলমান নাগরিকদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নিজস্ব ভাষা ব্যবহার, পালন ও সংরক্ষণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। মনে রাখতে হবে, সকল সম্প্রদায়ের জন্য এই স্বাধীনতা চূড়ান্ত নয় বরং তাদের দায়িত্ব সচেতনতা ও পরিচিতি ও মাত্রাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার যেমন চরমভ্রান্তি, তদরূপ স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার দাবীও দায়িত্বজ্ঞানহীন।

স্বাধীনতার ধারণাটি সবার জন্য সমতার প্রস্তাবনা করে- এ স্বাধীনতা হচ্ছে অধিকার, আজাদী, সুযোগসুবিধা ও নাগরিক দায়িত্ব সচেতনতা ভিত্তিক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সবার জন্য এ স্বাধীনতার দুয়ার উন্মোচিত থাকবে এবং সবাইকে তা ভোগ করার সুযোগ থাকতে হবে। একই আইনের সবাই সম সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে; বিশেষ কোন শ্রেণী বিশেষভাবে আলাদা কোন সুবিধার দাবীদার ও ভোক্তা হতে পারবে না। নৈতিক উচ্চমান ও তাকওয়া ব্যতিরেকে কুরআন কোন ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির, জাতির উপর অন্য জাতির, কোনরূপ প্রাধান্য স্বীকার করে না (৪৯:১৩)। বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ ঘোষণা করেন, 'আজ হতে সকল আভিজাত্যের অবসান হলো।' হাদীস অনুসারে এক আদমের সন্তান হিসাবে সকল মানুষ 'চিরুনীর দাঁতের মত সমান'। আল্লাহই একমাত্র আইন দাতা, তাঁর আদেশের অনুবর্তীতায় সকল মানুষ সমান। এই নীতিমালাসমূহ কুরআন ও হাদীসে অতীব গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এবং সকল সময়ে শরিয়ার অপরিবর্তনীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। মোহাম্মদ আসাদের মতে, 'কেবলমাত্র এই নীতিমালার আলোকে ও ভিত্তিতে ইসলামী সমাজের ধারণাটি যুক্তিগ্রাহ্যতা ও তাৎপর্য খুঁজে পায়।'[১৭]

সর্বশেষে কুরআন ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা হিসাবে শূরার (পারস্পরিক আলোচনা বা পরামর্শ) বিধান ঘোষণা করেছে।[১৮] কুরআন মহানবী (সা) কে 'জনগণের বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা বা পরামর্শের' নির্দেশ দিয়েছে (৩:১৫৯) এবং ঈমানদার হিসাবে তাদের উল্লেখ করেছে যারা 'নিজেদের বিষয় পারস্পরিক আলোচনার' মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে। (৪২:৩৮)। আবদুল ওয়াহিদ আল সুলায়মান শুরা ব্যবস্থার ব্যাখ্যায় বলেন :

(শূরা) ঐ পদ্ধতি যাতে মুসলমানগণ পরস্পর বসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করে এবং ন্যায়বিচারের দার্শনিক ধারণার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় করে নেয়। যদি বিষয়টি ন্যায় বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় বরং দুটি সমভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার বিষয় হয় তবে সংখ্যালঘিষ্টদের মতামতকেও বিবেচনায় রেখে ভোটাভুটির পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। একই পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে যদি কোন সর্ববাদিসম্মত পূর্ব নজীর ভিত্তিক সিদ্ধান্ত না থাকে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেককে তার মতামত প্রকাশ করতে দিতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক নজীরসহ বিবেচনায় রাখতে হবে।[১৯]

নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায়ের নির্দেশের সমগুরুত্বে কুরআনে শূরা'র প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বাণী ও প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে শূরা'র অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনা ও নিষ্পত্তির জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা। এতে এই জ্ঞান ও বিজ্ঞতাই ব্যক্ত হয়েছে যে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর নিষ্পত্তি শরীয়ার নির্দেশনার সীমারেখায় রেখে জনগণের সম্মিলিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দেয়া সমীচীন। ধারণাটি হচ্ছে যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আইনের মূলভাব অনুধাবন করে নিজের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা দেয়া হয় তবে সবার সুচিন্তিত অভিমত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে। শুরা শুধুমাত্র জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের অংশগ্রহণই নিশ্চিত করে না, একই সাথে তা স্বৈরাচারী শাসন প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে। তবে শুরা ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে কাজ করে কেবল মাত্র যদি স্বাধীনতা ও সমতার দু'টি মৌলিক নীতি সঠিকভাবে পালন করা হয়।[২০] তাই দেখা যাচ্ছে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সরকার শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে না, একই সাথে জনগণের আশা-আকাংখা ও ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণও বাস্তবায়িত করবে। তাই ইকবালের ভাষায় এটা বলা যুক্তিযুক্ত যে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সময়-কালের প্রেক্ষাপটে তাওহীদ, আদল, সমতা, শুরা ও স্বাধীনতার ধারণা সমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট মানব সংগঠনের মাধ্যমে রূপদানের প্রচেষ্টা।[২১]

মহানবী (সা) সময়কালের ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

কুরআনে যে সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে নবী মোহাম্মদ (সা)এর পরিচালনা ও নির্দেশনায় সে সমাজ ব্যবস্থার মর্মবস্তু ও গঠন প্রকৃতিতে মদীনায় বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। মদীনায় হিজরত কালে কুরআনের যে পনেরটি আয়াত নাজিল হয়েছিল (১৭:২৩-৩৭) তাতে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের 'নির্দেশনামূলক রূপরেখা ও নীতিমালা' বর্ণিত হয়েছিল।

মদীনায় আগমনের কয়েক মাসের মধ্যে মহানবী (সা) পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান রচনা করেন, যা প্রারম্ভিক মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।[২২] উম্মতের ইসলামী ধারণা অনুযায়ী মদীনার রাজনৈতিক জীবনকে তা পুনর্গঠিত করে (ধারা-২); নবী করিম (সা.) কে এই নব্য কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে (ধারা ২৩, ৪২); শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, বিবাদমান দলের মধ্যে আপোষ মিমাংসা ও বহি:শক্তির আক্রমণ হতে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় (ধারা ৩৭, ৩৯, ৪৪)। এ মহান দলিল সমতা ও সাম্যের নীতি, স্বৈরশাসনের প্রত্যাখ্যান ও আইনের নিরিখে দুর্বলতম বিশ্বাসী নাগরিকেরও সুরক্ষা নিশ্চিত করে (ধারা ১৫,১৭)। এ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইহুদীদের তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারসহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক বৈষয়িক ও ধর্মীয় প্রধান হিসাবে মহানবী (সা) এ নবীন রাষ্ট্রের সামাজিক সম্পর্ক তত্ত্বাবধান করতেন, কুরআনের আলোকে আইন রচনা ও প্রয়োগ করতেন, সেনাবাহিনী গঠন এবং তার অধিনায়কত্ব করতেন।[২৩] যখন সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে তখন সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি ঐসব ভূখণ্ডের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বস্তুত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেসব বিষয়ে কোন ঐশী প্রত্যাদেশ ছিলনা, ঐগুলি তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে নিষ্পত্তি করেন। কখনো কখনো তিনি জনগণকে জমায়েত করতেন, বিবেচ্য বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করতেন এবং পরামর্শ সভা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতো তদানুযায়ী কার্য করতেন, যার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে হিজরী ৩ সাল/ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধের সময়কার বিখ্যাত পরামর্শ।

কতিপয় দিক থেকে মদিনার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এ ব্যবস্থার সদস্যপদ নির্ণীত হতো ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে, যাতে সকল বিশ্বাসীগণই ছিলেন পরস্পরের ভ্রাতৃস্বরূপ এবং এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাহে তাঁরা একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃসমাজ গড়ে তুলেছিলেন।

একতার ছায়াতলে সকল মানুষ ছিল বিভেদহীনভাবে সমান, শুধুমাত্র তাকওয়ার ঐশী গুণ ছাড়া (অর্থাৎ ধর্মপরায়ণতা, খোদাভীতি ও শুভবোধ)। এ ধরনের পরস্পর সম্পর্ক কাঠামোর মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী সংগ্রামের অবকাশ ছিলনা; কারণ মানুষের বিশ্বাসে এ বোধ কাজ করত যে, সবাই আল্লাহর গোলাম এবং একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতা ও

কর্তৃত্বের অধিকারী। পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে, এবং তার জীবনের লক্ষ্য হলো শরিয়ার বাস্তবায়ন। আল্লাহর খলিফা হিসাবে ব্যক্তি মানুষের সম্পাদনের জন্য কর্তব্য কর্ম রয়েছে, পরিপূরণের জন্য অঙ্গীকার রয়েছে এবং তাকে কঠোর নিষ্ঠার সাথে সুউচ্চ ও সমুন্নত পরম আদর্শের দিকে ধাবিত হতে হয়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, মদীনার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যগণ জন-বিষয়াবলীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। কুরআনের নির্দেশনা ও উম্মতের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্তাবলী গৃহীত হতো। ১০ বৎসর পরিসীমার মধ্যে ইসলামী উম্মাহ এমন একটি সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, যার সম্ভাবনা ছিল গভীর ও সুবিশাল।

খোলাফায়ে রাশেদা

মহানবী (সা) এর তিরোধানের পর উত্তরাধিকার প্রশ্নে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী চেতনা ও আদর্শের আলোকে ও উম্মতের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে তা নিষ্পন্ন হয়েছিল। উত্তরাধিকার মনোনয়নে তারা দু' স্তর বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেন ১. পরামর্শ, মনোনয়ন ও উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক নির্বাচন (আল বায়াত আল খাস), এবং ২. পরবর্তীতে আল-বায়াত আল-আম বা সর্বসাধারণ কর্তৃক সমর্থনের মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ। প্রথম খলিফা আবু বকর খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং হিজরী ১১ সন/ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে জনসাধারণ কর্তৃক বায়াতের মাধ্যমে এ নির্বাচন নিশ্চিত করা হয়েছিল। উম্মতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে প্রথম খলিফা, ওমরকে দ্বিতীয় খলিফা হিসাবে মনোনীত করেন এবং হিজরী ১৩ সন/ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বসাধারণ কর্তৃক তা সমর্থন লাভ করে। একটি নির্বাচক মন্ডলী কর্তৃক তৃতীয় খলিফা ওসমান মনোনীত হন এবং পরবর্তীতে হিজরী ২৩ সন/৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে তা সর্বসাধারণের দ্বারা সমর্থিত হয়। তৃতীয় খলিফা হত্যা এবং উদ্ভূত বিশৃংখল পরিস্থিতি, উম্মতের প্রতিনিধিবর্গ আলীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলী সাধারণ মানুষের মতামতভিত্তিক অনুমোদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তদনুযায়ী হিজরী ৩৫ সন/ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হন।[২৪] উত্তরাধিকার নির্বাচনের এই পদ্ধতিসমূহ ছিল কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যমণ্ডিত শুরা'র নীতিমালা দ্বারা উজ্জীবিত। এভাবে এ পদ্ধতিসমূহ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে এবং মৌলিক সূত্র ও নীতিমালা হিসাবে বিরাজ করছে।

একথা নিশ্চিত যে খলিফাগণ নবী নন এবং তাঁরা তদরূপ কোন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় প্রাধান্য বা অধিকার ভোগ করেন না। তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ধর্মের মূলতত্ত্ব তুলে ধরার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং শরীয়ার আওতায় উম্মতের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের কার্য আঞ্জাম দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল। খলিফার আনুগত্য করা আল্লাহ ও নবী করিম (সা) এর অনুবর্তিতা করার শর্তাধীন। আবু বকর তাঁর অভিষেক ভাষণে বর্ণনা করেছেন, যদি খলিফা শরীয়ার সীমারেখা হতে সরে পড়েন, তবে তিনি আনুগত্যলাভের অধিকার

হারিয়ে ফেলেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে উম্মাহ্ সকল কাজে খলিফাকে সহায়তা করবে ও পথ দেখাবে, তিনি ইসলামী নীতিমালা হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন কিনা তা লক্ষ্য রাখবে, যদি তিনি 'বিপথগামী' হয়ে পড়েন তবে তাকে সংশোধন করবে এবং সুপরামর্শের মধ্যদিয়ে তাকে কার্যসম্পাদনে সাহায্য করবে।[২৫]

খোলাফায়ে রাশেদার কাল ছিল আদর্শ ও বাস্তবতার সামঞ্জশীলতার মূর্ত প্রতীক। খলিফা কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং জনগণের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনা করতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই জনগণের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হত না।'[২৬]

শুরা ব্যবস্থা ছিল শরীয়াহর অন্তর্নিহিত মর্ম অনুযায়ী জনগণের অধিকার, খলিফা কর্তৃক প্রদত্ত কোন দানদক্ষিণা বা আনুকূল্য নয়। ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খলিফাকে শরীয়াহর বিধান অনেক সময় ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হতো, কিন্তু তা সব সময় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং শুরা'র পরামর্শক মণ্ডলীর সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই করা হতো।[২৭] এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খলিফা আইনের শাসন নিশ্চিত করেন, পৃথক আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন ও শাসক-শাসিত নির্বিশেষে বিচার পদ্ধতির বিধিমালা প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে ন্যায়পরায়ণ খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ছিল :

আইনের শাসনের ভিত্তিতে (রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও শরিয়ার নির্দেশমালা) একটি নির্বাচিত শাসনতান্ত্রিক ও জনগণতান্ত্রিক সরকার, আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ (আর্থ-সামাজিক গণতন্ত্র); এবং সর্বোচ্চ উচ্চাদর্শ ভিত্তিক শরীয়াহর শাসন যা শাসকবর্গকে জনগণের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রেখেছিল (নৈতিক গণতন্ত্র)।[২৮] মদীনায় নবী করিম (সা) এবং তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী খোলাফায়ে রাশেদার সময়কালকে সময়ের মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয় যে :

খোলাফায়ের রাশেদীনের যুগ, ইতিহাসে ইসলামী সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত। সে যুগের অর্জনগুলি ছিলো সকল অঙ্গনে, সকল ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ। সর্বযুগের মুসলমানগণ দিকনির্দেশনা, উৎসধারা ও উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য যেসব কীর্তির দিকে মুখ ফেরায়।[২৯]

উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইবনে খালদুনের ব্যাখ্যানুসারে সাম্রাজ্য প্রসারের সাথে সাথে আরবদের গোষ্ঠী অনুভূতি রাজকীয় কর্তৃত্বের চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। ধর্মের লাগামের শক্তি হ্রাস পায়।[৩০] খিলাফত রাজত্বতন্ত্র বা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় 'সিয়াসাহ দীনিয়াহ' রূপান্তরিত হয় 'সিয়াসাহ আকরিয়াহ' এর পর্যায়ে, 'আসাবিয়াহ' তত্ত্ব যাতে সমর্থন যোগায়। উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (হিজরী

৪১-১৪২ সন/ ৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) উত্তরাধিকার হিসাবে তার পুত্র ইয়াজিদের পদায়নের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। হাসান আল বাসরীর মতে এ মনোনয়ন উম্মাহর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের উপর একটি সুগভীর দুর্নীতিপরায়ণ প্রভাব বিস্তার করে।[৩১] একটি সাম্যতাভিত্তিক সমাজের প্রধান হিসাবে ধর্মপ্রাণ নির্বাচিত খলিফার স্থান দখল করে নেয় সাম্রাজ্যের মালিক হিসাবে বংশানুক্রমিক খলিফা, যিনি চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার অধিকারী হন। শুরা'র নীতিমালা দুমড়ে মুচড়ে ফেলা হয় এবং একটি আরব যোদ্ধা অভিজাততন্ত্র উমাইয়া খিলাফতের স্থিতিশীলতা ও ঐক্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয়করণ ও সামরিকীকরণ স্বৈরতান্ত্রিক ও এককেন্দ্রীক সরকারের জন্ম দেয়।[৩২]

আব্বাসীয় আমলে (হিজরী ১৩২-৬৪৬ সন/৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে) প্রাতিষ্ঠানিক খিলাফতের মহিমা ও মর্যাদা আরো ক্ষুণ্ন হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের আনুকূল্যে জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতার বিকাশ ঘটলেও, এ শাসনকাল ছিল বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার ভিত্তিক খলিফা নির্বাচন, আড়ম্বরপূর্ণ দরবারী আনুষ্ঠানিক, অতিরিক্তভাবে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে মধ্যএশিয়া হতে আটলান্টিক পর্যন্ত বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শাসন প্রভৃতি দ্বারা বিচ্যুতিপূর্ণ। দশম শতকের মধ্যভাগ হতে রাজনৈতিক বিভক্তি ও ভঙ্গুরতা, খিলাফতের শক্তির ক্ষয়িষ্ণুতার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সেনাধ্যক্ষরা আধা-স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল সমূহের স্বাধীন শাসকরূপে আবির্ভূত হতে থাকে। খলিফাদের কার্যকর ক্ষমতা হ্রাসের সাথে সাথে, সামরিক কমাণ্ডারগণ নিজস্ব অঞ্চলের বাস্তব শাসক হিসাবে সুলতান রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সর্বশেষে হিজরী ৬৫৬ সন/১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলরা আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ অবরোধ করে এবং তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের ফলে একটি বিশ্বজনীন খিলাফতের অধীনে শাসিত উম্মতের ঐক্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে। খিলাফতের রাজনৈতিক ঐক্যের স্থলে বিশাল বিশাল অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য মুসলিম সালাতানাতের জন্ম হয়।[৩৪] ষোড়শ শতকের মধ্যে তিনটি প্রধান সালতানাত আত্মপ্রকাশ করে; পূর্ব ইউরোপ ও নিকটপ্রাচ্যে অটোম্যান, পারস্যে সাফাভী এবং পাকভারত মোগল সালতানাত। এসব সালতানাত সমূহকে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, তবে সামগ্রিকভাবে ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে শাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অমুসলিম প্রজাদের প্রতি সহনশীলতা এবং সকলের প্রতি ন্যায়ানুগ ও ক্ষমতাভিত্তিক ইসলামী আচরণ এ সালতানাত সমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত।[৩৫]

তিনটি মুসলিম সালতানাতের মধ্যে মুসলিমবিশ্বে সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী ও নিশ্চিতভাবে দীর্ঘস্থায়ী ছিল অটোম্যান সালাতানাত। অটোম্যান বুদ্ধিজীবীদের মতে অটোম্যান সুলতানদের অবস্থান ছিল খলিফার মত, তাঁরা ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্ত

প্রসারে অন্যদের চেয়ে বেশী সচেষ্ট ছিলেন এবং তারা শরীয়াহকে মান্য ও উলেমাদের সম্মান করতেন।[৩৬] অটোম্যান খলিফাগণ শরীয়াহর অভিভাবক ও ইসলামী ঈমান আকিদার সংরক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করতেন। তদসত্ত্বেও অটোম্যান খিলাফতের সাথে ইবনে খালদুন বর্ণিত 'মুলক' এর অধিক সাদৃশ্য ছিল, যা ছিল শরীয়াহর সাথে সুলতানদের ধর্মনিরপেক্ষধরনের কানুন ও ফরমানের সংমিশ্রণ। অটোম্যান আইন ছিল শরীয়ার সাথে কানুনের (খলিফার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আদেশ) মিশ্রফল। ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর তারা খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভ করে। মোস্তফা কামাল (আতাতুর্ক) এর নেতৃত্বে, ১৯২২ সালে তুরস্কের জাতীয় সংসদ সুলতানাত হতে খিলাফত পৃথক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং খিলাফতের পরিবর্তে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে।[৩৭] পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থার অবসান ঘটান হয় এবং আতাতুর্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন করেন। খিলাফতের অবসানের কারণ হিসাবে হামিদ এনায়েত ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে;

প্যান-ইসলামী ধারণার সাথে তুর্কী জাতীয়তাবাদের অসামঞ্জস্যশীলতা; জনগণের মধ্যে পশ্চিমা ধরনের আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা এবং ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে বহুজাতিক ইসলামী দেশের সংজ্ঞা। এসব ধারণার মধ্যে সংঘাত এবং পরিশেষে বাস্তব কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে খিলাফতের অবাস্তব অস্তিত্ব খিলাফতের অবসান ঘটায়।[৩৮] কতিপয় পণ্ডিতের ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ ব্যতীত বিশ্বব্যাপী খিলাফত পুনর্জাগরণের কোন শক্তিশালী উদ্যোগ কোথাও গৃহীত হয়নি। মুসলমানদের শক্তি ও সাধনার অধিকাংশ ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য হতে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান এবং অসংখ্য স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিমা আদলে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

বর্তমানে মুসলিম জাহানে ৫২টি রাষ্ট্র বিদ্যমান। কিছু রাষ্ট্র স্বৈরতান্ত্রিক, অর্ধেকের বেশি দেশের (৫২টির মধ্যে ২৬টি) শাসনতন্ত্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেছে (পরিশিষ্ট- সি দেখুন)। তদসত্ত্বেও কোনদেশেই শরীয়াহকে কোন দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বাঙ্গীন আইন হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি।

প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞগণ

উপরের আলোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা) এবং চার খলিফার সময়কার মদীনায় আদর্শ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হতে পরবর্তীকালে শাসন পদ্ধতি অনেকদূরে সরে গিয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। খিলাফতকে কেন্দ্র করে বিচ্যুতি ও বিতর্ক মুসলিম আইনজ্ঞ ও চিন্তাবিদদের লিখনীতে স্থান পেয়েছে। বিচ্যুতি ও পার্থক্য সমূহকে বড় করে দেখাতে গিয়ে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা অনেক সময়

বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মুসলমান চিন্তাবিদগণ মুসলিম শাসন পদ্ধতির যে সাধারণ ঐক্যভিত্তি অবলোকন করেছেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ নিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন যে, মদীনার মডেলটি ছিল সর্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়; ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণভাবে ইসলামের সংরক্ষণ ও শরিয়াহর বাস্তবায়ন, যা 'আদল' ও 'শুরা'র ভিত্তিতে সংস্থাপিত; রাজনীতিকে কখনো নৈতিক মূল্যবোধ হতে বিচ্ছিন্ন করা উচিৎ নয় এবং রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যেও কোন সংঘাত থাকা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে এসব চিন্তাবিদ ও আইনবিশারদগণ রাজনীতিকে ধর্ম ও নৈতিকতা হতে উদ্ভূত প্রয়োজনীয় বর্ধিত অংশ বলে মনে করতেন।[৩৯]

ঐতিহাসিকভাবে মহানবী (সা) এর তিরোধানের পর ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র রূপ ছিল খিলাফত। মুসলিম চিন্তাবিদগণ তাই খিলাফতের ধারণার উৎস, খলিফার গুণাবলী, নির্বাচনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এবং সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইত্যাদির উপর বিস্তারিত তাত্ত্বিক দর্শন ও পর্যালোচনা গড়ে তোলেন। ইমামত বা খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে শিয়া, খারেজী ও অধিকাংশ মুতাজিলাপন্থীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, ইমামত হচ্ছে অপরিহার্য কেননা এর সাথে ঐশী বিধান সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী জড়িত। তারা অবশ্য এ প্রয়োজনীয়তার কারণ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আল আশারী, আল বাগদাদী (মৃত্যু হিজরী ৪২৯ সন/১০৩৭ খ্রি.), আবু আল হাসান মাওয়ার্দী (হিজরী ৩৬৪-৪৫০ সন/৯৭৪-১০৫৮ খ্রি.) এবং আবু হামিদ মোহাম্মদ আল গাজ্জালী (হিজরী ৪৫০-৫০৫ সন/১০৫৮-১১১১ খ্রি.) মনে করেন যে, ইমামত কার্যকারণ দ্বারা নয় বরং ঐশী প্রয়োজনীয়তা দ্বারা চিহ্নিত ও প্রয়োজনীয়।[৪০] পক্ষান্তরে মুতাজিলা পন্থীরা মনে করেন যে, ঐশী প্রত্যাদেশ নয় বরং যৌক্তিক কারণ দ্বারা ইমামতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত। ইবনে তাইমিয়া অবশ্য মনে করেন যে, মানুষের বিষয়াবলীর পরিচালনা ও নিষ্পত্তির প্রয়োজনে যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তার দাবী ঐশী প্রত্যাদেশের দাবীর চেয়ে কম নয়। এর সাথে যোগ করেছেন যে, মানুষের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে, যা সাধারণ কল্যাণ ও সুখের জন্য পরস্পরের সাথে সহযোগিতার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। একটি সামাজিক শৃঙ্খলাময় ব্যবস্থা ব্যতিরেকে এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব নয় এবং সেদিকে ধাবিত করার জন্য কিছু কর্তৃত্বের প্রয়োজন।[৪১] ইবনে খালদুন কর্তৃক এ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি পরম্পরা বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে।

মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও আইনবিশারদগণ তাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা এ ধরনের উপর আরম্ভ করেন যে, ইসলামী সরকার শরিয়ার উপর ভিত্তিশীল, যা ধর্ম ও জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনের মধ্যে কোনরূপ আলাদা দেয়াল গড়ে তোলেনা এবং জীবনের এমন কোন কার্যাবলী ও দিক নেই যাকে শরীয়ার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেনি। এই শরীয়া আইনের পরিসীমার মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃক এবং তার অন্তর্গঠনশৈলী সংজ্ঞায়িত।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী সমাজব্যবস্থা বা উম্মাহ।[৪২] শাসনকর্তা, যাদের প্রাথমিক ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে খলিফা, ইমাম বা আমীর হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে তারা কেউ সার্বভৌম সম্রাট ধরনের কোন কর্তৃপক্ষ ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন Primus inter-Pares তথা সমদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব। উম্মতের মধ্যে শাসক ও শাসিতের অবস্থান একই কাতারের। তাদের মধ্যে তাওকয়া ভিন্ন অন্তর্নিহিত মর্যাদার কোন পার্থক্য নেই, যা রয়েছে তা হচ্ছে বিশেষ ভূমিকা পালনের। ইমাম শরীয়ার বিধান অনুযায়ী প্রশাসন কার্য পরিচালনা করবেন, যার ব্যত্যয় ঘটলে উম্মতের উপর তাঁর প্রতি আনুগত্যের আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।[৪৩]

ইসলামী সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণিত আছে: তা হচ্ছে ইসলামের পরিপূর্ণ সংরক্ষণ ও ঐসব শর্তাবলী পূরণ ও বজায় রাখা যাতে একজন ঈমানদার মানুষ নির্বিঘ্নে তার ঐশী নির্দেশিত তাকওয়ার জীবন যাপনে অগ্রসর হতে পারে। নবুয়তের কার্যাবলী উত্তরাধিকার হিসাবে অব্যাহত রাখা এবং 'ঈমান-আকিদা সংরক্ষণ ও মানুষের দুনিয়াবী কার্যাবলী সুচারুভাবে পরিচালনা করা' ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হিসাবে আল-মারওয়ার্দী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৪] ইবনে তাইমিয়া আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম যে ধর্ম ও জীবন বিধান হিসাবে জীবনের সকল স্তর ও মানবতার সর্বমাত্রায় বিস্তৃত এবং 'আল্লাহর আদেশ-নিষেধই যে চূড়ান্ত' তা সুনিশ্চিত করা। ইবনে খালদুন আল-মাওয়ার্দীর 'জাগতিক বিষয় পরিচালনা' ও ইবনে তাইমিয়ার 'আল্লাহর আদেশ নিষেধই চূড়ান্ত' এ দু'টি বক্তব্যকে এভাবে সমন্বিত করেছেন যে শরীয়ার বিধানানুসারে সকল জাগতিক বিষয়াবলীকে ইহকালীন কল্যাণের সাথে সংযুক্ত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ইবনে খালদুন এভাবে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতে কল্যাণ লাভের জন্য মানুষের শরীয়তের উদ্দেশ্যের অনুসরণকারীর বিষয়টি সহজ ও বেগবান করাকে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইসলামী রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়াবলীর উপর সকল আলোচনা মূলত: প্রধাননির্বাহী কর্মকর্তা, যার হাতে সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত এবং কোন ক্ষমতাই বৈধ নয় যতক্ষণ না তিনি কোন ক্ষমতা অন্যকে অর্পণ করেন, সেই আলোচনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, কোন গ্রহণযোগ্য কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে জনগণের বিষয়াবলী সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই ঈমানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং যতক্ষণ তিনি শরীয়ত লংঘন না করেন ততক্ষণ তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। এরসাথে একমত পোষণ করে কারণ হিসাবে গাজ্জালী ব্যাখ্যা করেন যে, ইমাম উম্মতের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে শৃংখলা রক্ষা করেন, শান্তি-শৃঙ্খলার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন এবং সর্বশেষে তাঁর সকল কর্তৃত্ব শরীয়ত হতে উৎসারিত।[৪৫] তবে ইমাম কি পদ্ধতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন সে বিষয়ে মতপার্থক্য

রয়েছে। আল-মাওয়ার্দী, আবু ইয়ালা এবং আল বাগদাদী উম্মতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ (কর্তৃক নির্বাচন) আবু বকরের খিলাফত প্রাপ্তি, খলিফা কর্তৃক পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন (ওমরের খিলাফত প্রাপ্তি), নির্বাচক মন্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন (ওসমানের খিলাফত প্রাপ্তি) এবং জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচন (আলী) ইত্যাদি উদাহরণকে ইমাম নিয়োগের বৈধ পন্থা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বদর আল-দীন ইবনে জামাহ্ (হিজরী ৬৩৯-৭৩৩ সন/ ১২৪৪-১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তীতে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে খলিফা হওয়াকেও বৈধ পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

যদিও খিলাফতের অপরিহার্য প্রয়োজীয়তার বিষয়ে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করতেন, তবে তারা তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা অনুযায়ী একাধিক ইমাম থাকার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। আল আশারীর চিন্তার বিরোধিতা করে আল-মাওয়ার্দী একাধিক ইমাম থাকার বিষয়টি অনুমোদন করেননি, সম্ভবত এ কারণে যে তার ধারণায় সম্ভবত: এটা ইসলামের বিশ্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ন করবে। আল বাগদাদী একাধিক ইমামের ধারণাকে অনুমোদন না করলেও একই সাথে দু'জন খলিফার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন এ শর্তে যে তাদের শাসিত অঞ্চল পরস্পর বেশ দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হবে। লক্ষণীয় যে খারেজীরা কোন এক সময়ে বহুসংখ্যক ইমামের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। ইমাম তাইমিয়া তাদের সাথে একমত পোষণ করে একই সময়ে একাধিক ইমামের ধারণাকে সমর্থন করেন।

প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তাকে এমন সব গুণে গুণান্বিত হতে হবে যা তাঁর দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদনে সহায়ক হবে। তাই এমন কোন মুসলিম পণ্ডিত পাওয়া যাবেনা যিনি শাসনকর্তার গুণাবলীর উপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেননি। আল মাওয়ার্দীর মতে শাসকর্তার নিম্নবর্ণিত গুণাবলী থাকতে হবে যথা ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ্), জ্ঞান (ইল্ম), শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা (সালামাহ্), স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি (রে'এ), সাহস ও সুদৃঢ়তা (সুজাহ্ ওয়া নাজদাহ্) এবং কোরাইশ বংশোদ্ভূত *(নোসাব)*। ইবনে খালদুন গুণাবলীকে হ্রাস করে পাঁচটি হিসাবে উল্লেখ করেছেন ইল্ম, আদালাহ্, কাফাআহ্, সালামাহ্ ও নাসাব।[৪৬] আল গাজ্জালী কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে একই রূপ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। এসব গুণাবলীর তালিকার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক গুণ সুস্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। এ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের উপর ম্যাকিয়াভেলী'র মত চিন্তানায়কদের প্রভূত প্রভাব বিদ্যমান। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক জমিনের উপর আল্লাহর ছায়া স্বরূপ মর্মে অনেক মুসলিম আইনজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি শরীয়ার অনুশাসন বাস্তবায়ন করেন, জনগণের মধ্যে সাম্য বজায় রাখেন, তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করেন এবং দারিদ্র্য ও নিগৃহীতের দুঃখদুর্দশা লাঘব করেন। সংক্ষেপে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম এমন পরিস্থিতি সৃজন করবেন যাতে সঠিক

ধর্মাচরণ ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য তাই বাধ্যতামূলক এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) অনুবর্তীতার সমার্থক বিবেচনা করা হয়।

সমকালীন মুসলিম চিন্তা ও সরকারের গঠন

১৯২৪ সালে অটোম্যান খিলাফত ব্যবস্থার পতন ও তার পুনর্জাগরণের সম্ভাবনাহীনতা খিলাফতের প্রকৃতি ও কার্যের বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। এ আলোচনা অনেকাংশে আব্বাসীয় আমলে যে আলোচনার সূচনা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতা। খিলাফতের তাত্ত্বিক আদর্শের বিষয়ে আল মাওয়ার্দী, আল-গাজ্জালী এবং আল বাকীলানী'র মত শীর্ষস্থানীয় মুসলিম চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞগণ যে ধারণা পোষণ করতেন তার সাথে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সমকালীন আলোচনা সমূহের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যতা রয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে নতুন বিষয়টি যুক্ত হয়েছে তা হলো খিলাফতের ধারণার নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ এবং নয়া ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠনের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া হতে শুরু করে নতুন ধারাটি হাসান আল বান্না, সাইয়িদ কুতুব, আবুল আলা মওদুদী, হাসান আল তুরাবী প্রমুখের লিখনীতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা বিশ্বব্যাপী মুসলিম মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রেক্ষিতে তাদের চিন্তাদর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

সূচনাতেই বলতে হয়, সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদগণ খিলাফতের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে পুনর্জীবিত করা দরকার বলে মনে করেন না। তারা খোলাফায়ে রাশেদা'কে ইসলামী সমাজ ও সরকারের চরম উৎকর্ষ হিসাবে মনে করেন, যা ইবনে তাইমিয়ার মতে ইতিহাসে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তারা বিশ্বজনীন খিলাফত বা রাজনৈতিক বিশ্বজনীনতার কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও মনে করেন না। তাদের মতে যেহেতু উম্মতের ধারণা ভূ-খণ্ড ভিত্তিক নয় বরং সমগ্র বিশ্বব্যাপী, তাই বহু মুসলিম রাজনৈতিক সরকার ও ইসলামী ভূ-খণ্ডের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ও গ্রহণযোগ্য। ইবনে তাইমিয়ার মতে তাই সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে একটিমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে আনয়ন বা ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের কোন আবশ্যকতা নেই। বরং ইসলামী দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম দেশসমূহের সমবায়ে কনফেডারেশন গঠন করা যেতে পারে।'[৪৭] ১৯৬৫ সালে সাইয়েদ মওদুদী একইভাবে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান জানান।[৪৮] এসব মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট খিলাফত হচ্ছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে, এমন একটি ব্যবস্থা, যার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালার ভিত্তিতে মানবতার কল্যাণ সাধন। সংক্ষেপে খিলাফত হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার আলোকে একটি সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা। আবদুল হামিদ- আবু সুলায়মান মন্তব্য করেছেন যে :

নিজেদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহ্ যে ধরনের সরকার নিজেদের জন্য পছন্দ ও বাঞ্ছনীয় মনে করবে তাকেই খিলাফত ব্যবস্থা হিসাবে মনে করতে হবে এবং সে ব্যবস্থাকেই উম্মাহর সমর্থন করা প্রয়োজন।[৪৯]

ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে খিলাফতকে অস্বীকার করা যায় না, অধিকন্তু ইহা ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল চিহ্ন ও তাৎপর্যবহ।

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠন

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজস্ব আদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বাতন্ত্রমণ্ডিত। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যতত্ত্ব বিশারদগণ 'ধর্মতন্ত্র' (থিউক্রেসী বা এক বা একাধিক দেবতার ধারণামাত্রিক সরকার)' 'বিশ্বজনীন রাজতন্ত্র' (এক ধরনের আইনমাত্রিক সরকার) প্রভৃতি যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা ইসলামী রাজনৈতিক সরকারকে চিহ্নিত করার উপযোগী পরিভাষা বা প্রকৃত সংজ্ঞা নয়।[৫০] ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় চিন্তা, দর্শন ও প্রথার সাথে অনৈসলামিক রাষ্ট্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তবে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা মৌলিকভাবে, '... এমন বৈশিষ্ট্য ও মাত্রিকতা রয়েছে যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, আধুনিক পাশ্চাত্যমডেল হতে তা বিপুলাংশে পৃথক এবং কেবলমাত্র নিজস্ব প্রেক্ষাপটে ও স্বকীয় পরিভাষা দ্বারাই একে সফলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।'[৫১] ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্মাণে সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদীর ভাষায়, (ইহা) আল্লাহর বান্দা হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য সম্মিলিতভাবে কর্মরত কতিপয় মানুষের সমবায় ও প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।'[৫২] মোহাম্মদ আসাদের মতে এ ব্যবস্থা 'জাতির জীবনে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সচেতন প্রয়োগ ও রাষ্ট্রের মৌলিক সংবিধানে ঐসব নীতি আদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন' দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ'।[৫৩] যেহেতু এ ব্যবস্থাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে সংস্থাপিত তাই এর রয়েছে কতিপয় গতিশীলতা এবং ... এতে বহুরকম মডেলের অবকাশ রয়েছে, যার সাথে একটি সমাজের বিকাশের স্বাভাবিক এবং সমকালীন সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের দাবী মেটাবার স্থিতিস্থাপকতা ও সামঞ্জস্যশীলতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামের সামগ্রিক ধারণা এসব মডেলগুলোর শেষ প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়।'[৫৪]

শাসনতান্ত্রিক সরকার

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে মানব জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার সকল দিক ব্যাপ্তকারী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে স্থাপিত একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।[৫৫] সাইয়েদ মওদুদীর মতে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত :

ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, ব্যক্তিচরিত্র, নৈতিকতা, অভ্যাস, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি, প্রশাসন, নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার, বিচার ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।[৫৬]

জাতীয় নৃতাত্ত্বিক ও সম্প্রদায়গত ভিন্নতা নির্বিশেষে ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা ও সামষ্টিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ বিশেষভাবে শুরা'র কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়। শরীয়াহ্ রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠনশৈলী ও কার্যবৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেয়নি। শরীয়াহ্‌র এ অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপকতা ও গতিশীলতা ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগ রেখেছে, এ শর্তে যে গৃহীত কোন পদ্ধতি শরীয়ার অনুশাসনের মর্মবস্তুর সাথে সংঘাতপূর্ণ হবে না।[৫৭] ফলে মুসলিম পণ্ডিতগণ ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম পন্থা উদ্ভাবনে শক্তির সমন্বয়ে নীতির কথা ব্যক্ত করেছেন। মোহাম্মদ আসাদের মতে এ নীতি-দর্শন 'রাজনৈতিক তত্ত্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিশেষভাবে ইসলামী মূল্যবোধে জারিত অবদান সঞ্চারিত করেছে'।[৫৮] শক্তির সমন্বয়ের এই তত্ত্ব সরকারের নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধন করেছে, কেননা এই তিনটি বিভাগের প্রশাসনিক আদেশ, নীতি নির্ধারণ ও প্রণীত বিধান হতে উদ্ভূত সমস্যা ও বিরোধের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারের তিনটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

নির্বাহী বিভাগ

সরকারের নির্বাহী অঙ্গ হচ্ছে 'কর্তৃত্বের নিউক্লিয়াস অংশ এবং সরকারের সক্রিয় শক্তি।'[৫৯] কুরআন ও হাদীসে একে 'উল-আল আমর' ও 'উমারা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নির্বাহী বিভাগের নেতৃত্ব করবেন 'আমীর' (প্রধান নেতা), যিনি সর্বাধিক, সম্মানিত' এবং 'সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ' ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে ৩১ জন উমেলা' সমবায়ে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তা হবেন 'সর্বসময়ে একজন পুরুষ, যার ধর্মপরায়ণতা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং স্বচ্ছ ও সঠিক বিচার ক্ষমতার বিষয়ে জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের গভীর আস্থা থাকবে।'[৬০] মোহাম্মদ আসাদ বলেন, 'এটা সুস্পষ্ট যে কেবলমাত্র একজন মানুষ যিনি আইনের ঐশী উৎসে বিশ্বাসী তথা যিনি একজন মুসলিম শুধু তাঁকেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান করা যেতে পারে।[৬১] ধর্মপরায়ণতা ছাড়াও খলিফাকে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী ও দক্ষ প্রশাসক হতে হবে। সাইয়েদ কুতুবের ভাষায় শরীয়ার আইন বাস্তবায়ন ও উম্মাহ্‌র স্বার্থসংরক্ষণে দক্ষতার উপর খলিফার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।[৬২] সমাজের অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তাও সমভাবে আইনের আওতার অধীন। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাবে, অভিযুক্ত হলে তিনি কোনরূপ বিশেষ মর্যাদা বা সুযোগ পাবেন না এবং শরীয়ার অনুশাসনের গুরুতর লংঘনের ক্ষেত্রে তাকে অপসারিত করা যাবে। ফলে দেখা যায় প্রধান নির্বাহী শাসকর্তার কার্যাবলী ও ক্ষমতাকে লাগামবদ্ধ করা হয়েছে। আমীর তার নিজস্ব কোন ক্ষমতার কারণে ঐ উচ্চ পদে আসীন নন, অথবা বিশেষ কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেও নয় বরং উম্মাহ্‌র বিবিধ বিষয়াবলীর দায়িত্ব ও শরীয়ার সংরক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে ঐ

মর্যাদাবান আসনে আমীর সমাসীন। রাজতন্ত্র কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কেননা ইসলামে বাদশাহীতন্ত্রের কোন স্থান নেই, বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার নির্বাচনেরও কোন অবকাশ নেই।'[৬৩] যদিও শুরা'র নীতিমালার মাধ্যমে পরবর্তী খলিফা বা আমীর নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, তবু নির্বাচনের পদ্ধতির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়নি। ফলে উম্মাহ্ নির্বাচনের পদ্ধতি উদ্ভাবনে স্বাধীন- সে নির্বাচন প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, আনুপাতিক ইত্যাদি যে কোন প্রকরণের হতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এ পদ্ধতিসমূহ শরীয়াহ্র আক্ষরিক ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের সাথে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

আইন বিভাগ

আমীর কাজ করবেন আইন পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে। সমকালীন পণ্ডিতগণ আইন পরিষদকে 'শুরা', 'ইজতিহাদ' ও 'ইজমা' এর বহিঃপ্রকাশ ও সমার্থক মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাসান আল তুরাবী খিলাফত ব্যবস্থাকে 'নির্বাচিত পরামর্শক সংস্থা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে এই মহান প্রতিষ্ঠান বংশানুক্রমিক, স্বৈরাচারী বা বলপূর্বক দখলকারী রূপ পরিগ্রহ করে।[৬৪] এই পরামর্শ বা আইনসভা অবশ্যই পুনর্জীবিত করতে হবে এবং ইকবালের মতে এ পরিষদের আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের (ইজতিহাদ) এখতিয়ার থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে উম্মতের ঐকমত্য *(ইজমা)* স্থাপিত হবে। শুধু এভাবেই আইন ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সঞ্চালন করা সম্ভব হবে এবং এর কার্যভার ক্রিয়াশীলাবর্তিত অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে'।[৬৫] মুসলিম মনীষীগণ 'আহল-আল-হাল ওয়াআল-আকদ' ও 'শুরা'র ভিত্তিতে আইনসভার আঙ্গিকের তাত্ত্বিক রূপদান করেছেন; এ দু'টি ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী প্রতিষ্ঠান, যার প্রথমোক্তটি শেষোক্তটির চেয়ে আকৃতিতে ছোট। এ দু'টি প্রতিষ্ঠান খলিফা নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মিলিত হয়ে যৌথভাবে কাজ করে।

অধিকাংশ পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আইনসভার অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে হবে। তবে কিছুসংখ্যক সদস্য থাকবেন যারা হবেন আধুনিক আইনশাস্ত্র ও শরীয়াহ্র অনুশাসন উভয় বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত ও পারদর্শী। আইনসভা নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের নীতিমালা রচনা করবে।[৬৬] আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দু'টি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে; একটি হচ্ছে শরীয়াহ্র অনুশাসনের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় চরিত্র এবং অন্যান্য বাকী বিষয়াবলী প্রয়োজনমাফিক পরিবর্তনশীল ও স্থিতিস্থাপক। কুরআনে নির্দেশিত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, যা ইসলামী শাসনতন্ত্রের মৌলিক উপাদান, তার চরিত্র হচ্ছে স্থায়ী; এগুলির বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবেনা, বা এতে কোন রূপ পরিবর্তন আনা যাবেনা রবং হুবহু অনুসরণ করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্যান্য বিষয়াবলী, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসে কিছু বলা হয়নি, তা হলো ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল অংশ। এ অংশটির পরিধিও বিশাল, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির

চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনযোগ্য। সংক্ষেপে আইনসভার কাজ হচ্ছে শরীয়ার সুস্পষ্ট বিধানসমূহকে আইনের রূপ দান করা এবং যেখানে কুরআন-হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেখানে শরীয়ার সীমারেখার মধ্যে ন্যায়, সমতা ও বিচার বুদ্ধির ভিত্তিতে আইন ও বিধান রচনা করা।

ইসলামে আইন পরিষদের বিষয়টি কোন কোন মহলে এ ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে আইনসভার ভূমিকা শুধু মাত্র পরামর্শ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তার তা গ্রহণ বা বর্জন করার নিজস্ব এখতিয়ার রয়েছে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণাকে ইসলামী পণ্ডিত ও সাধারণ জনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাসান আল তুরাবী, সাইয়িদ কুতুব, আবদ আল কাদির আওদাহ (ইন্তেকাল হিজরী ১৩৭৫ সন/১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে) ও অন্যান্যদের মতে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য শুরার পরামর্শ অনুসরণ বাধ্যতামূলক এবং এ প্রক্রিয়ার (শুরা) সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের শাসকের জন্য অবশ্য পালনীয়। এমনকি সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী যিনি আইনসভার পরামর্শমূলক ভূমিকার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তিনিও মন্তব্য করেছেন শুরা'র সিদ্ধান্ত অনুসরণে বর্তমানে অনীহার ভাব পরিলক্ষিত হবার ক্ষেত্রে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত পরিপালনে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।[৬৭]

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ, যা 'কাদা' নামে অভিহিত, নির্বাহী বিভাগ হতে স্বাধীন এবং শরিয়ার কঠোর অনুবর্তিতার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা এর কাজ। উলেমা কনভেনশন তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের রূপরেখা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছে যে বিচার বিভাগ হবে সকল দিক থেকে স্বাধীন যাতে নির্বাহী বিভাগের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তভাবে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা।[৬৮] পণ্ডিতবর্গ সুদৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছেন যে শাসক কর্তৃক বিচারপতিদের নির্বাচন দ্বারা কোনভাবে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। শরীয়ার একই আইন দ্বারা নির্বাহী ও আইন বিভাগ পরিচালিত; তাই শরীয়ার বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের অন্যকোন কর্তৃপক্ষ হতে কর্তৃত্ব লাভের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অপরদিকে বিচার বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলীর পরিধি এত ব্যাপক যে সরকারের সকল অঙ্গ ও কার্যাবলী বিচার বিভাগের পরিসীমার মধ্যে পড়ে। অন্য সকল নাগরিকের মত প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তা বা সরকার প্রধানকেও বাদী বা বিবাদী হিসাবে আদালতের আদেশ বিচারালয়ে হাজিরা হতে হয়। আল তুরাবী মন্তব্য করেছেন যে :

তিনি (শাসক) কোনরূপ দায়মুক্তির সুবিধা ভোগ করেন না এবং তার সরকারী বা ব্যক্তিগত যে কোন কর্মকাণ্ডের জন্য তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করা যেতে পারে। এ হচ্ছে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আইনের মূলনীতি, যা শরিয়ার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[৬৯] অন্যান্যসহ বিচার বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি, অন্যায় কার্যের প্রতিরোধ এবং বিচারিক ঘোষণার ইস্যু অন্তর্ভুক্ত।[৭০] বিচার বিভাগীয় রিভিউ এর

ক্ষমতার বিষয়ে কিছুটা মতদ্বৈতা রয়েছে।" কিছু আধুনিক চিন্তাবিদ বিচার বিভাগকে আইনের সাংবিধানিক বিষয়টি বিচার ক্ষমতা প্রদানকে সমর্থন করেন না। তারা বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও ভূমিকাকে শুধুমাত্র আইনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন তার অভিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা অবলোকন ও পরিবীক্ষণের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন।[৭১] হাসান আল তুরাবী বিপরীত মত পোষণ করে 'বিচারকদের শরীয়ার অভিভাবক হিসাবে গণ্য করে আইনের সকল ক্ষেত্রে তাদের রায় প্রদানের ক্ষমতার অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।'[৭২] এই মতামতের সাথে মোহাম্মদ আসাদ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং আবদুল কাদির কুর্দি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[৭৩] সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর মতে যদিও খোলাফায়ে রাশেদার সময় বিচার বিভাগের এ ধরনের কোন ক্ষমতা ছিলনা, কিন্তু বর্তমান সময়ে যেহেতু মানুষের কুরআন হাদীসের জ্ঞানের বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নেই, তাই তিনি কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থীভাবে রচিত সংবিধান, আইন ও বিধিকে অবৈধ ও আইনগত ভিত্তিহীন হিসাবে ঘোষণা করে বাতিল করে দেয়ার ক্ষমতা বিচার বিভাগকে প্রদান সমীচীন বলে মনে করেন।[৭৪] শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানী উলেমাবৃন্দ, মোহাম্মদ আসাদ ও আনসারী কমিশন রিপোর্ট এ মত সমর্থন করে।

সরকারের গঠন ও ধরন

সমকালীন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে কুরআন ও সুন্নাহ কোন বিশেষ ধরনের সরকারের রূপরেখা অথবা বিস্তারিত শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব বর্ণনা করেনি। এ হতে মতামত উপস্থাপিত হয়েছে যে ইসলামে রাজনৈতিক সরকার নানা রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, 'এটা কোন যুগে মুসলমানরা কি ধরনের সরকার চায় তথা যেটি তাদের উপযোগী সেভাবেই মুসলিম জনগণ সরকার গঠন করবে।'[৭৬]

খলিফার ধারণার সাথে সমধর্মী বিধায় মোহাম্মদ আসাদ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানকে হতে হবে প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্পন্ন যার হাতে জাতির সকল বিষয় নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। রাষ্ট্রপতির আস্থাভাজন থাকা পর্যন্ত মন্ত্রীবর্গ তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রপতির সার্বিক কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।[৭৭] সাইয়েদ মওদুদী ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণ হবার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন। এ ধরনের সরকার বর্তমান প্রচলিত কোন ধরনের সরকারের মত নয়।[৭৮] এ সরকার সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির সরকার- এটি একটি ধর্মাশ্রয়ী গণতন্ত্র, একটি ঐশ্বরিক গণতান্ত্রিক সরকার, কেননা এর অধীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে মুসলমানদের সীমিত জনগণতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব প্রদান করা হয়েছে।[৭৯]

আনসারী কমিশন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ন্যায় একজন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হিসাবে নির্বাচনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। কমিশন অবশ্য ইসলামী সরকার ব্যবস্থা মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসিত, বৃটিশ পার্লামেন্টারী বা ফরাসী পদ্ধতির অনুসরণ হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেনি। বরং

কমিশন একে শুরা পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছে যাতে উপর্যুক্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা সমূহের ভালো দিক সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।[৮০] 'নেতা সর্বদা শরীয়াহ ও ইজমার অনুবর্তী থাকবে এই শর্তে সরকারের নির্বাহী বিভাগের যে কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারবে মর্মে হাসান আল তুরাবী অনাপত্তি ব্যক্ত করেছেন।[৮১] অধিকন্তু ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কিছু ভারসাম্যমূলক বিধি নিষেধ আরোপ করার পর ইসলামী সরকারের তিনটি বিভাগীয় কার্যাবলীর সুনির্দিষ্ট বিভক্তিকরণের কোন কঠোর তত্ত্ব যৌক্তিক ও সমন্বিতভাবে উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়।[৮২] সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিতবর্গ যে ধরনের সরকার পছন্দ করেছেন তার রেখচিত্র ছক ৬.১ এ প্রদর্শিত হয়েছে। যে ধরনের সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধান আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বা মজলিসে শুরা ব্যবস্থা তা ছক ৬.২-এ প্রদর্শিত হয়েছে। উভয় মডেলেই শরীয়ার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক শক্তি সমন্বয় ও সংহতিকরণ দেখান হয়েছে, যা শুধুমাত্র ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য। সরকারের তিনটি অঙ্গসংস্থার একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সরকারের ত্রয়ী বিভাগের মধ্যে সংঘাতমুক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করবে।

উপসংহার

কুরআন ও সুন্নাহ কোন শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব উপস্থাপন না করলেও এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করেছে যা সর্ব অবস্থায় বাস্তবায়নযোগ্য। মুসলমান সমাজ সাধারণভাবে ঐকমত্য পোষণ করে যে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাওহীদ, শরীয়াহ, শুরা, ন্যায়বিচার, সমতা ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই নীতিমালা যুক্তিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জাতিসত্তা বা অন্য কোন রূপ বিবেচনা দ্বারা সীমায়িত নয়। এ ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদ, জনগণতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব ও সরকারের তিনটি বিভাগে কঠোর বিভাজনমূলক ধারণা সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পক্ষান্তরে এ ব্যবস্থা বিশ্বজনীন মূল্যবোধ, শরীয়াহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সমন্বয় ও সংহতিকরণের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে।

সরকারের প্রশাসনের নির্বাহী দায়িত্ব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা- খলিফা বা আমীর এর উপর ন্যস্ত। নির্বাহী কর্মকর্তার ধরন যা'ই হোক না কেন, আমীর সবসময়ই নির্বাচিত হবেন এবং সর্বদা শরীয়াহ ও তার অধীনে প্রণীত ইজমা'র অনুবর্তী হবেন। আমীর একটি পরামর্শক মণ্ডলী দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত হবেন, যে সংস্থাটি 'লাগাম ধরা ও ছাড়ার কাজে' পারদর্শী। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এই 'পরামর্শ সভা' বর্তমানে প্রচলিত আইনসভার অনুরূপ বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তবে পরামর্শক মণ্ডলী কর্তৃক আইন প্রণয়নের কাজটি শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কার্যক্ষেত্রের দিক থেকে বিচার বিভাগ একটি স্বাধীন সংস্থা, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শরীয়াহর আলোকে বিচার পরিচালনা করবে ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করবে।
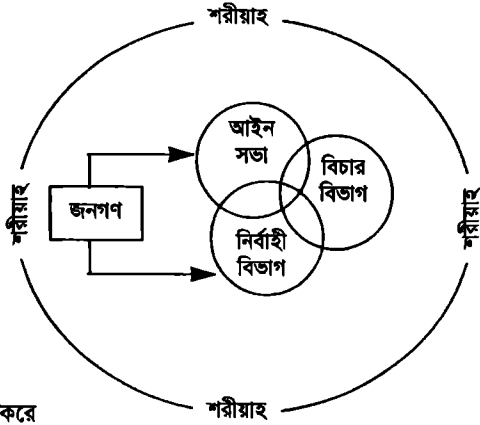
ছক ৬.১ : ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা : জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাহী বিভাগ
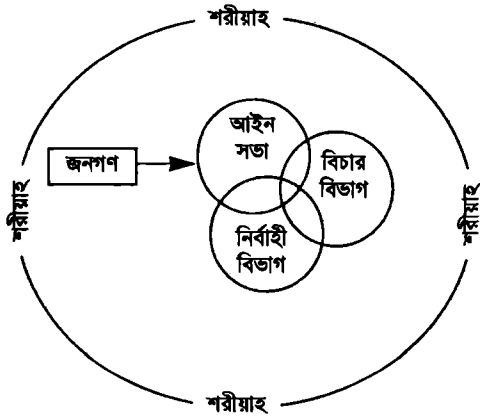
ছক ৬.২ : ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা : পরোক্ষাভাবে নির্বাচিত নির্বাহী বিভাগ

যে নীতিমালা, মূল্যবোধ, গঠন কাঠামো উপরে বর্ণিত হয়েছে তা হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইসলামী সরকারকে রাষ্ট্রশাসিত বা পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের মত কোনটাই বলা যায়না। আইনের শাসন, আলোচনা ও নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে আপাত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক জীবন দর্শনের কোন সামঞ্জস্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানবরচিত আইনের সাথে শরীয়ার কোন মিল নেই, ইজতিহাদ বলতে চিন্তাভাবনার লাগামহীন স্বাধীনতা বোঝায় না, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে শূরা ব্যবস্থার কোন সামঞ্জস্যতা নেই।

গণতন্ত্র হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতার সামগ্রিক বিবর্তনের ফসল; এর ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান হচ্ছে শতাব্দীব্যাপী চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের বিজয় জনিত ফলাফল; জনগণের ভোটের অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দল গঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ হলো উনবিংশ শতকে উদীয়মান শিল্প শ্রমিকদের দাবির ফল। সংক্ষেপে গণতন্ত্র হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শনের এমন ফসল যেখানে মানুষের সবকিছু কেবলমাত্র বস্তুগত মানদণ্ডে বিচার করা হয় এবং যেখানে মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়টি সামান্যতম গুরুত্বও লাভ করেনা। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা আইন ব্যক্তিমানুষের যা খুশী করার স্বাধীনতার উপরই জোর দিয়ে থাকে। ধর্ম থেকে রাজনীতির বিচ্ছেদ নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করেছে। ক্ষমতা দখলের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় এবং দুর্বলের প্রতিপক্ষ হিসাবে সবলের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রণীত হয়। যে সুবিচারের নীতির কথা তারা বলে তা তাদের স্বার্থের অনুকূল না হলে তাকে হিমাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ন্যায়ের নামে বস্তুত পেট্রোলিয়াম তৈলের জন্য কুয়েতকে রক্ষার নামে ইরাককে গুড়িয়ে দেয়া হয়। তৈল না থাকলেও বসনিয়াকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় আর জালিম সার্বদের মুসলিম গণহত্যা চালিয়ে যেতে দেয়া হয়। এ রূপধারী গণতন্ত্র তাই ইসলামী পরিমণ্ডলে অগ্রহণযোগ্য।

ইসলামী রাজনৈতিক সরকার মানুষের পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে তাদের ইহকালীন জীবনের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিসীমা সুবিস্তৃত এবং তার সীমারেখা বস্তুগত জীবনকে ছাড়িয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ পরকালীন জীবনের দিকে ধাবিত। ইসলামী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়া, একই সাথে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদান করা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শরিয়তের সীমারেখাকে ডিঙ্গিয়ে না যায়। ব্যক্তিমানুষের সুস্থ জীবন, জীবনবোধ ও তার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা শান্তিশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ ছাড়া কুরআনের ভাষায় ইসলামী রাজনীতির দায়িত্ব ও লক্ষ্য হচ্ছে :

সালাত (প্রার্থনা ও আরাধনা) কায়েম করা, জাকাত (শুদ্ধকারী কর) আদায় করা, ন্যায় ও সত্যকে উৎসাহিত করা এবং ভ্রান্তি ও অনাচারকে দূর করা। সকল বিষয়ের শেষ ফয়সালা মহান আল্লাহর সমীপে (২২:৪১)।

মুহাসাবাহ্ : ইসলামে জবাবদিহিতা

ইসলামে জবাবদিহিতা

প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুসলিম চিন্তাবিদগণ সংশ্লিষ্ট ইসলামী সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে আদি হতে যে বর্ণাঢ্য মুসলিম সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চলে আসছে তাতে নাগরিকদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা ও সরকারের নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এসেছেন। সমাজের অস্তিত্ব ও অধিকার রক্ষায় সরকারের বিশেষ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে তারা শরীয়াহর বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা শাসক শ্রেণীকে আইনের শাসন মেনে চলা এবং নাগরিক শ্রেণীকে অবৈধ আদেশ লংঘন করার নির্দেশনা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। যে বিষয়ে লেখাসমূহ পরিলক্ষিত হয়নি তা হচ্ছে- ক. শাসক ও শাসকের আদেশের আইনগত বৈধতা নির্ণয়ের নীতিমালা খ. অবহেলা ও অসদাচরণের দোষে দোষী শাসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যে বৈধতা প্রয়োজন তার প্রয়োগ পদ্ধতি নিরূপণ। ইসলামের আর্থ-সামাজিক বাস্তবায়নের যে আন্দোলন আজকে বিশ্বব্যাপী চলছে তার প্রেক্ষিতে এ ইস্যু দু'টি ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে এর সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে বের করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের আইন ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতার মুখোমুখি থাকার জন্য কি কাঠামো ও উপদেশমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

আইনসভা : প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা

সরকারের যে অঙ্গকে অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বা আইনসভা। প্রদত্ত অনুসন্ধানের এ ক্ষমতাটি একটি অপরিহার্য ক্ষমতা এবং আইনসভার আইন প্রণয়নের পাশাপাশি একটি ক্ষমতা। হ্যারল্ড লাস্কির মতে, এই অনুসন্ধানের ক্ষমতা, 'সরকারের অসততা বা অদক্ষ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা।'[১]। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে :

'আইনসভার প্রকৃত কাজ হচ্ছে সরকারকে অবলোকন করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা- এবং যদি সরকারের অধীনস্থ লোকেরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অথবা এমনভাবে কাজটি করে যা ন্যায়পরায়ণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে।'[২] আইনসভা যদি নির্বাহী বিভাগের কাউকে অপসারণ করতে চায় তা অভিশংসনের মাধ্যমে করতে হবে।

অভিশংসন মানে চার্জ বা অভিযোগ আনয়ন।[৩] এটা গ্রান্ড জুরি কর্তৃক অভিযুক্তকরণের সমতুল্য। মার্কিন ইতিহাসের বৃহদাংশ জুড়ে নিম্নপদস্থ বিচারকদের' তাদের 'নোংরা অসদাচরণের জন্য' অপমানের নিমিত্তে অভিশংসন প্রথা ব্যবহৃত হয়েছে।[৪] যাহোক প্রকৃত প্রস্তাবে অভিশংসন প্রথাটি রাষ্ট্রপতিকে রাজনৈতিক বা ফৌজদারী অপরাধের জন্য অপসারণার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১নং আর্টিকেল-এ রাষ্ট্রপতিকে তার পদ হতে 'বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ অথবা অন্যকোন বড় অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধান আইনসভাকে অভিশংসনের ক্ষমতা দিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য বিচার হবে কিনা তার ক্ষমতা দিয়েছে। আইনসভার অধিকাংশ সদস্য অভিশংসনের পক্ষে ভোট দিলে বিষয়টি সিনেটে প্রেরিত হয়। সিনেটের সব সদস্য মিলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে অভিশংসন বিচারালয় সংগঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে পারেন অথবা অনুরোধপূর্বক হাজির হওয়া হতে অব্যাহতি পেতে পারেন। উভয় পক্ষের শুনানীর পর, সিনেট ভোট প্রদান করে। অভিশংসনের প্রতিদফার অপরাধ সাব্যস্ত হবার জন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। এ পর্যন্ত একজন রাষ্ট্রপতি এন্ড্রু জনসনকে সিনেটের সামনে হাজির হতে হয়েছে, কিন্তু এক ভোটের জন্য তিনি অভিশংসন হতে রক্ষা পান। আরেক জন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন নিশ্চিতভাবে অভিশংসিত হয়ে যেতেন, কিন্তু পদত্যাগের মাধ্যমে তিনি নিজকে রক্ষা করেন। অভিশংসনে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি পদ হতে অপসারিত হন এবং ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সম্মানজনক ও বিশ্বাসের পদে আসীন হতে পারেন না।

যে কোন ক্ষমতার ন্যায়, অনুসন্ধানের ক্ষমতাও দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। অভিশংসনের বিধান কোন অজনপ্রিয় রাষ্ট্রপতিকে পদ থেকে অপসারণের জন্য রচিত হয়নি, যদিও এ উদ্দেশ্যেই ১৮৬৮ সালে রাষ্ট্রপতি এন্ড্রু জনজনের বিরুদ্ধে অভিশংসনের ক্ষমতাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অভিশংসন পদ্ধতির অপব্যবহার হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা প্রয়োগের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে অভিশংসন প্রথার ব্যবহার হতে পারে।

শাসন কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য কুরআন ও সুন্নাহ

শাসকের কর্তৃত্ব এবং শাসিতের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনের সূরা ৪ এর আয়াত ৫৯-এ বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাঁদেরকেও (ওয়া উলি আল-আমর মিনকুম)।'[৫] কর্তৃত্বশীলদের পূর্বে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্রিয়াপদ 'মান্য করা' উহ্য রেখে বা বাদ দিয়ে শাসকের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসূলের (দ:) প্রতি আনুগত্যের শর্তাধীন করা হয়েছে। এ শর্তটি হচ্ছে 'সঠিক ঈমান' এবং রীতিনীতি যথাযথ মান্য করা। অধিকন্তু

শাসকদের বা কর্তৃত্বশীলদের অবশ্যই জনগণের মতামত নিতে হবে এবং একবার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর তা প্রয়োগ করতে হবে (৩:১৫৯)। সরকারকে আমানত হিসাবে ঘোষণা করে, কুরআন শাসকদের ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করতে (৪:৫৮) ও নির্দয়তা পরিহার করতে (৩:১৫৯), জনকল্যাণমূলক কাজ করতে, অভাবী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং ধনীদের স্বার্থে সমাজের ক্ষতি না করতে (৫৯:৭) আহ্বান জানিয়েছে।

জামাখসারী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী আদেশ জারী করার দ্বারা শাসকশ্রেণী জনগণের আনুগত্য পাওয়ার অধিকার হারায়।[৬] কুরআনে বেশ কিছুসংখ্যক আয়াত রয়েছে যেখানে সুস্পষ্টভাবে তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা 'নিজেদের খেয়ালখুশী মতে নির্দেশ জারী করে (১৮:২৮)' এবং 'যারা আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লংঘন করে (২৬:১৫)'। বস্তুত কুরআন বিশ্বাসীদের উপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধ্যতামূলক করেছে, যখন জুলুম আসে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা রচনা করতে (১৩:৩৯) এবং 'আল্লাহর পথে এবং সহায়হীন নর, নারী ও শিশু, যারা নির্যাতিত তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে (৪:৭৫)' আহ্বান জানিয়েছে।

উপরোক্ত কুরআনের দ্ব্যর্থহীন আহ্বান কতিপয় হাদীস দ্বারাও শক্তিশালী হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের শাসনকর্তৃত্বকে মান্য করতে বলা হয়েছে শুধু তাদের ছাড়া যারা 'পাপ কাজ করতে আদেশ করে।'[৭]

এ ধরনের ক্ষেত্রে আনুগত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়, কেননা, 'স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন আনুগত্য নেই।'[৮] আনুগত্য 'শুধুমাত্র পুণ্য কাজে বাধ্যতামূলক'।[৯] বস্তুত নবী করিম (সা.) বিভ্রান্ত ও দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তোলা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন :

'আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সত্যকে তুলে ধরবে এবং অন্যায়কে রোধ করবে এবং তোমরা দুষ্কৃতকারীর হাত প্রতিহত করবে, যে হাতকে মুচড়ে সত্যের (আল-হাক্ক) অনুবর্তী করবে এবং ন্যায় কাজ করতে তাকে বাধ্য করবে- সংখ্যায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে একে অন্যের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবেন।'[১০]

অধিকন্তু নবী করিম (সা.) এর সমগ্রজীবন ছিল নির্যাতন, নিগ্রহ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত যুদ্ধ স্বরূপ। তার সমগ্র জীবন ছিল সত্যের মূর্তপ্রতীক (উসওয়াহ হাসানাহ) যা মুসলমানদের জন্য সতত অনুসরণযোগ্য।

খোলাফায়ে রাশেদীন

সুন্নী মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে খোলাফায়ে রাশেদা কুরআন ও সুন্নায় বিধৃত আদর্শ মানদণ্ড কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। 'ন্যায়পরায়ণতা উজ্জ্বলতায় পূর্ণ' এ যুগ ছিল আদর্শ বিচার ও বৈধতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কেউ, বংশানুক্রমিক রাজত্বের গোড়াপত্তন করেননি বা কেউ বলপ্রয়োগপূর্বক বা ছলনা দ্বারা ক্ষমতা দখল করেননি।[১১] তাঁরা আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে তথা নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফতের আসনে আসীন হয়েছিলেন এবং তারা শরীয়াহ অনুসারে ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আনুগত্যকে যে শর্তাধীন করা হয়েছে তা উজ্জ্বলভাবে প্রথম খলিফা আবু বকরের উদ্বোধনী ভাষণে বিবৃত হয়েছিল :

'হে লোকসকল, আমাকে আপনাদের বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তবে আমাকে সাহায্য করুন আর আমি যদি বিপথগামী হই তবে আমাকে শুধরে দিন সঠিক পথে পরিচালনা করুন... আমাকে ততক্ষণ মান্য করুন যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে মান্য করি। যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুশাসন ভঙ্গ করি, তবে আমি আপনাদের আনুগত্যের দাবীদার হতে পারি না। আপনারা আপনাদের পছন্দমত যোগ্য নেতা নির্বাচিত করতে পারবেন।"[১২]

একইভাবে তার উত্তরসূরী ওমর ঘোষণা করেছিলেন :

'অবশ্যই আমি আপনাদের একজন, আমি চাইনা যে আপনারা আমার খেয়ালখুশীকে অনুসরণ করবেন'[১৩] তৃতীয় খলিফা ওসমান শুধু কোরান সুন্নাহকে অনুসরণ করেননি, বরং মুসলমানগণ তাঁকে তাঁর দু' যোগ্য পূর্বসূরীর পথ অনুসরণে বাধ্য করেছিল। তিনি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনায় বিশ্বাস করতেন এবং শরীয়াহকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। এটা সত্য যে তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা তার পদত্যাগের দাবীকে মেনে নেননি। এর কারণ হচ্ছে এ পদত্যাগের দাবী 'আহল আল শুরা' হতে আসেনি, বরং এসেছিল বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে যারা তলোয়ারের মুখে পদত্যাগ দাবী করেছিল। বস্তুত 'শুরা'র একজন সদস্য মুয়াধ ইবনে জাবাল খলিফাকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করেন যাতে তা তার উত্তরসূরীর জন্য নজীর সৃষ্টি না করে।[১৪] চতুর্থ খলিফা আলী গোপনে অথবা জনগণের অনুমোদন ব্যতিরেকে খলিফার পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। খোলাফায়ে রাশেদার কেউ সম্রাটের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন না এবং শর্তহীনভাবে জনগণের আনুগত্য দাবী করতেন না।

খিলাফতের আদর্শ ব্যবস্থার বিশুদ্ধরূপ ও জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন বজায় রাখতে পারেননি। নির্বাচিত খিলাফত ব্যবস্থা সহসা উমাইয়া খলিফাদের হাতে একনায়কতন্ত্রে পরিবর্তিত হল এবং আব্বাসীয় খিলাফতের হাতে পরবর্তিতে আরো বেশী দুর্নীতিপরায়ণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। খিলাফত ব্যবস্থার এ অবস্থায় মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদদের খিলাফত কাঠামোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করল।

মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ ও চিন্তাবিদগণ

খোলাফায়ে রাশেদার সময়কাল ছিল এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শে চিহ্নিত উৎসস্থল, যাকে ভিত্তি ও অনুসরণ করে মুসলিম চিন্তাবিদগণ একটি আদর্শ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নকসা

প্রণয়ন করেন। মাওয়ার্দী থেকে মওদুদী পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ ও চিন্তাবিদগণের লিখনীতে এ রূপরেখা পাওয়া যায়। সময়ের বিবর্তনে খিলাফত অর্থহীন সম্মানসূচক এক খোলসে পরিণত হল; স্থানীয় শাসকরা বলপূর্বক ঐ সকল অঞ্চল শাসন করতে থাকে; অন্যান্যরাও খলিফা দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন না। এ ধরনের একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মুসলিম সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলল। আল মাওয়ার্দী এ ধরনের পরিস্থিতিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ শর্তে যে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী স্থানীয় শাসকদের শরীয়াহর নির্দেশনা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে।[১৫] আল গাজ্জালী উপলব্ধি করলেন যে, সমকালীন সরকার বস্তুত: সামরিক শক্তিতে পরিচালিত সরকার'; তাই তিনি নামেমাত্র খলিফা ও প্রকৃত শাসন 'সুলতানদের' মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে এক নতুন সম্পর্ক বিন্যস্ত করতে চাইলেন।[১৬] ইবনে জামাহ তাঁর 'কাহর ওয়া খালবাহ (শক্তি ও বিজয়)' তত্ত্বে সামরিক শক্তিকে শাসনকর্তৃত্বের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেন।[১৭] এই ধরনের ধারণা ও লিখনী সমূহ খলিফাকে এমনকি শরীয়াহ লংঘনকারী শাসককেও অমান্য করার নীতির সুর গরম করে তোলো।

প্রচলিত পরিস্থিতির আলোকে আইন শাস্ত্রবিদগণের চিন্তাধারা নতুনভাবে বিনির্মাণের প্রচেষ্টাকে বিভিন্নভাবে দেখা হল- যুক্তি প্রদর্শন করা হল যে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ খলিফাদের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন।[১৮] পক্ষান্তরে ক্ষমতা দখলকারীদের বাস্তব শাসন ক্ষমতা ও খলিফার নীতিগত ক্ষমতা উভয়কে সামঞ্জস্য বিধান করার পক্ষপাতি আইনশাস্ত্রবিদগণ এমন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতত্ত্ব উপস্থাপন করেন যেখানে বাস্তব ক্ষমতাভোগকারী শাসনকর্তাদের শরীয়াহ্ অনুবর্তী থাকা ও সমাজের স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার উপর জোর প্রদান করা হয়। খিলাফতের প্রতিষ্ঠানটিকে তারা শরীয়াহর সার্বভৌম প্রতীক হিসাবে গণ্য করে উম্মাহর অবিভাজ্যতা কামনা করেন। যদিও খিলাফত ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়েছে, তবুও এটা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন যাতে খিলাফতের নামে আদালত কর্তৃক আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয় এবং রাষ্ট্রের ভিতর আর্থিক লেনদেনের আইনগত ভিত্তি থাকে। বর্তমান স্থিতাবস্থা মেনে নেয়া মানে একে আইনগত বৈধতা প্রদান করা নয় বরং স্বৈরতান্ত্রিক সরকার পরিবর্তন করে বৈধ সরকার না আসা পর্যন্ত একটি সাময়িক অবস্থা হিসাবে মেনে নেয়া মাত্র। আল গাজ্জালীও স্বীকার করে নেন যে এ ধরনের অনভিপ্রেত অবস্থা মেনে নেয়া পরিস্থিতির শিকার হওয়া মাত্র। তিনি একে বাধ্য হয়ে মৃতপশুর মাংস ভক্ষণের সমান হিসাবে তুলনা করেছেন।[১৯] তার পূর্বে আল মাওয়ার্দীও স্বীকার করেছেন যে অবৈধ আমীরকে স্বীকৃতি প্রদান আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ, তবে জনশৃংখলা বিনষ্ট হতে পারে এ আশংকায় এ ব্যবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া অত্যন্তর নেই।[২০] কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বর্তমান স্বৈরশাসনের চেয়েও আরো বেশী জনগণের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়ে তুলবে। তাই এসব আইনশাস্ত্রবিদগণ 'দু'টি মন্দের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম মন্দ'কে গ্রহণের নীতি গ্রহণ

করলেন। কেননা, বিদ্রোহের দ্বারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভাঙ্গন জনগণের জন্য অধিকতর অমঙ্গল ও দুঃখ-দুর্দশা ডেকে আনবে। তবে এমন একজন আইনশাস্ত্রবিদও পাওয়া যাবেনা যিনি এমন ফতওয়া বা মতামত প্রদান করেছেন যে ইসলাম সকল অবস্থাতে সকল শাসকের আনুগত্য করতে মুসলমানদেরকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে স্বৈরশাসনকে মেনে নিলেও, আইনশাস্ত্রবিদগণ শাসন ক্ষমতার অপরিহার্য অংশ হিসাবে ন্যায়পরায়ণতা, অবিচার ও অন্যায়ের ধ্বংসাত্মক পরিণতি, আল্লাহর রাহে কাজ করা ও জনগণের কল্যাণার্থে সর্ববিধ কাজ করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান থেকে বিরত থাকেনি। আল গাজ্জালী, নিজাম-উল-মূলক (মৃত্যু হিজরী ৪৮৫ সন/১১৯২ খ্রি.) ও শাসকদের আচরণ ও কার্যবিধি বিষয়ে লিপিবদ্ধকারী প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ উপরোক্ত মর্মে প্রচুর সারগর্ভ গ্রন্থ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। আল মাওয়ার্দী এমনকি প্রয়োজনের চাপেও খলিফার গুণাবলী হ্রাসে সম্মত ছিলেন না এবং শর্তহীন আনুগত্যের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম আবু হানিফা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে শরীয়ার বিধান লংঘনকারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক এবং স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধে এরূপ বিদ্রোহ শুধুমাত্র 'প্রাণ ও শক্তি ক্ষয়ের' মাধ্যমে বিলীন হয়ে যাওয়া উচিৎ নয়।[২১]

সাসানীয়ান সাম্রাজ্যের শাসকদের প্রতি ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক খোলাফায়ে রাশেদার পদাংক অনুসরণের আহ্বান কার্যত তাদের শাসনপ্রণালীর সমালোচনা হিসাবে গণ্য।[২২] ইবনে জামাহ বল প্রয়োগপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীদের স্বীকৃতি প্রদান করলেও, ঐসব শাসকবর্গকে ধর্মের মর্মবাণী রক্ষা, আইনগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, শরিয়াহ নির্ধারিত পন্থায় কর আদায় ইত্যাদি ইসলামী বিধি বিধান পালন যে বাধ্যতামূলক তা উল্লেখ করেছেন।[২৩] আবু আলী ইবনে সীনা (হিজরী ৩৭৯-৪২৮ সন/৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) জবর দখলের নিন্দা করেছেন, অত্যাচারীর মৃত্যুদণ্ড দাবী করেছেন, অদক্ষ শাসকের অপসারণ অনুমোদন করেছেন এবং অযোগ্য খলিফার বিরুদ্ধে যোগ্য বিদ্রোহী' কে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন।[২৪]

এ বিষয়ের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া আরো কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তিনি ইবনে জামেয়ার মতামতের জন্য তার নিন্দা করেন এবং শাসকশ্রেণীর উপর তাদের নীতিবিচ্যুতির জন্য এমন সুদৃঢ় আক্রমণ পরিচালনা করেন যে প্রায়শ:ই তাকে কারাবরণ করতে হত। তিনি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। বিশ্বাসীদের তাদের নিজেদের বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে কুরআন সুন্নাহ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৫] তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সরকার হচ্ছে একটি আমানত এবং শাসক ও শাসিত উভয়ে মিলিতভাবে এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করবে- যাতে ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হয়- এ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ইচ্ছামাফিক শাসন পদ্ধতি পরিচালনার বিরোধী এবং এ ব্যবস্থা শরীয়াহ

নির্দেশিত সমতার ভিত্তিতে রচিত শাসন ব্যবস্থা; শাসকের প্রতি আনুগত্য শাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বৈধ ও আইনসঙ্গত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার উপর নির্ভরশীল; স্বৈরশাসক 'যারা শরীয়াকে পরিত্যাগ করেছে যদিও তারা কলেমা শাহাদাতের দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করেছে' তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং এভাবে শাসককে অমান্য করা ধর্মীয় কর্তব্য।[২৬]

ইবনে তাইমিয়ার এ বলিষ্ঠ ও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক উপস্থাপন ও তত্ত্ব পরবর্তীতে ইবনে খালদুন, আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল (হিজরী ১২৯০-১৩৫৭ সন/১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রি.) সাইয়েদ কুতুব, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ও অন্যান্যদের লিখনীতে বলিষ্ঠতরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁদের সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী লিখা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন সমূহকে প্রেরণা শক্তি জুগিয়েছে।

অভিশংসনের ভিত্তিভূমি

সরকার ও শাসন কর্তৃত্বের উপর আল মাওয়ার্দী হতে আজ পর্যন্ত সকল প্রখ্যাত লেখকদের লিখনী পাঠ করলে আশ্চর্য হতে হয় যে তারা কতিপয় বিষয়ের উপর আপোষহীনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন এবং এতে কোন ছাড় দেননি, যদিও তারা ভালোভাবেই জানেন যে, কেবলমাত্র খোলাফায়ে রাশেদার সময়েই এসব নীতিগত বিষয় বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। সরকারের নির্বাহী বিভাগের সাথে জড়িত এসব নীতিমালা সমূহ 'আইনসঙ্গতা' ও বৈধতা' এই দু'টি ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এই দু'টি নীতির যেকোন একটির লংঘন অধিষ্ঠিত শাসনকর্তার অপসারণের ভিত্তিভূমি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

বৈধতা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা শাসনকর্তা সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতগণ বিশাল অভিসন্ধর্ভ রচনা করেছেন, তাতে এপদের নির্বাচনী প্রকৃতির উপর সবচেয়ে বেশী জোর প্রদান করা হয়েছে। তারা 'গণমানুষের উপর ঐশী নির্দেশনা এবং ইজমার অভ্রান্ততার' উপর অনমনীয়ভাবে নির্ভর করেছেন।[২৭] আল মাওয়ার্দী খলিফা নির্বাচনে নির্বাচনী পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন; সাইয়েদ কুতুবের মতে যিনি (খলিফা) একটি উৎস শরীয়াহ্ ও শাসিত মানুষের ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্খা' হতে সকল অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।[২৮] আল্লামা মওদুদীর মতে কেবলমাত্র তিনটি নীতি প্রতিফলিত হলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে :

১. প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তার নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে সাধারণ জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে, কারো নিজকে বলপূর্বক শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা বা অধিকার থাকবে না।

২. কোন বিশেষ গোষ্ঠি বা শ্রেণীর শাসনকর্তৃত্বের উপর একচেটিয়া ক্ষমতা বা অধিকার থাকবেনা;

৩. নির্বাচন সকল প্রকার চাপ বা প্রভাবমুক্ত হবে।[২৯]

সরকারের এইসব উচ্চতম আদর্শের মানদণ্ড ঐশী গ্রন্থে বিধৃত 'শুরা'র উচ্চতম আদর্শ এবং ভালো কাজকে উৎসাহিত ও মন্দ কাজকে রোধ করার অনুশাসন হতে আহরণ করা হয়েছে এবং বস্তুত পক্ষে প্রথম চারজন মহৎ খলিফার স্বর্ণযুগে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। মধ্যযুগের খলিফাদের সময় ঐ সব নীতিমালার বাস্তবায়ন কল্পনাতীত ছিল, তাই আইনশাস্ত্রবিদগণ তখন প্রত্যেক ব্যক্তির খলিফা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারের প্রতি সমর্থন প্রদান করেননি। তারা অবশ্য কখনো বংশানুক্রমিক শাসন পদ্ধতিকে সমর্থন করেন নি, যদিও তা তথাকথিত প্রচলিত বায়াত প্রথার মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিকতার আলখেল্লায় আবৃত করা হতো। তারা নির্বাচনকে একটি সামষ্টিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন; এ নির্বাচন পদ্ধতি তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হতে হবে যারা খলিফা পদের জন্য কারা সবচেয়ে বেশী যোগ্য তা বিচার বিশ্লেষণ করা যোগ্যতা রাখেন।

এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইসলাম কোন বিশেষ ধরনের নির্বাচনকে নির্দিষ্ট করে দেয়নি। নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য আরো অনেক বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তার পদে নির্বাচন বিশেষ কোন পদ্ধতিকে যাজক সম্প্রদায়ের তথাকথিত বাহ্যিক পবিত্রতা দ্বারা মণ্ডিত করারও প্রয়োজন নেই।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাচনের আপাত সহজ যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তা হতে অনুমান করা সঙ্গত হবে না যে নির্বাচন প্রার্থীর যোগ্যতায় কোনরূপ ন্যূনতা বা কমতি থাকতে পারবে। মুসলিম পণ্ডিত ও সকল ধর্মতাত্ত্বিক মাজহাবের প্রধানগণ সামান্য তারতম্য সত্ত্বেও এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে নেতৃত্বের দাবীদারকে অবশ্যই একজন মুসলিম, পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি হতে হবে।[৩০] ইসলামী সমাজের প্রধান হবার জন্য এসব হচ্ছে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা; আরো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী হচ্ছে :

ক. ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার ও আনুগত্যশীলতা বা 'ওয়ারা';

খ. ইসলামী ব্যবস্থার দাবী সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি জ্ঞান বা ইলম;

গ. প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করার দক্ষতা ও যোগ্যতা বা কাফা'আহ এবং

ঘ. ন্যায়পরায়ণতা সমুন্নত রাখার সুদৃঢ় মনোভাব' অঙ্গীকার বা আদালাহ।

এইসব গুণাবলী আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রশ্নে, সমকালীন চিন্তাবিদগণ আল মাওয়ার্দী, আল গাজ্জালীসহ অন্যান্য পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের চিন্তাধারার উপর নির্ভর করেছেন।

প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তা নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচক মণ্ডলী প্রার্থীর যোগ্যতাসমূহ সবিশেষ বিবেচনা করবেন মর্মে তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইবনে সীনা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, 'নির্বাচকমন্ডলী অবিশ্বাসীতে পরিণত হবেন (ফা-কাদ কাফারু বি আল্লাহ্)

যদি তারা নেতা নির্বাচনে ভুল করেন।'[৩১] এ মতামত পূর্ণাঙ্গভাবে যুক্তিযুক্ত না হলেও ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নেতা নির্বাচন যে কত গুরুতর বিষয় তা নির্দেশ করে। যাহোক, ইসলামী ব্যবস্থায় নেতা নির্বাচিত হয় কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী ও শর্তসাপেক্ষে এবং মুসলমানদের ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা মোতাবেক। নেতা যদি এসব গুণাবলী বা শর্তের কোনটি লংঘন করেন অথবা কোনপ্রকার চাতুরীর আশ্রয় নেন বা বল প্রয়োগ করেন তবে তাকে অব্যাহতি দেবার বা ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার উম্মাহ সংরক্ষণ করে।

আইনসঙ্গতা

যদি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি হয় নির্বাচনমূলক তবে 'আইনসঙ্গতা' দাবী করে যে এ ব্যবস্থায় জনগণের অনুমোদনের সাথে শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বউর্ধে থাকবে।[৩২] প্রথম থেকেই ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বলা হয়েছে সরকারী ব্যবস্থার ভিত্তি হবে আলাপ আলোচনামূলক। এ প্রসঙ্গে কুরআন ঘোষণা করেছে যে, 'মুসলমানরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিষয় নিষ্পত্তি করবে (১২:৩৮) এবং 'যখন তোমরা কোন সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হবে (৩:১৫৯)।'

সমগ্র মুসলিম চিন্তাধারায় এমন কোন নিবন্ধ পাওয়া যাবে না যেখানে উপর্যুক্ত আয়াত দু'টি একসাথে উদ্ধৃত হয়নি। আলাপ আলোচনার পরিধি প্রশ্নে তাদের মধ্যে কিছু মতের ভিন্নতা ছিল। কেউ কেউ আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের শুধুমাত্র জনগণের প্রতিনিধি হতে হবে মর্মে মনে করতেন, অন্যরা সকল মুসলমান যারা ইসলামী আইনের বিষয়ে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন। অধিকাংশ চিন্তাবিদদের মতে সর্বসম্মত ঐকমত্যের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক মতামত প্রদানকারী এক ও অভিন্ন মত প্রদান করবেন। বরং এর অর্থ অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক যে রায় প্রদত্ত হয়েছে। মতামত প্রদানের পদ্ধতিটি জনগণ নির্ধারণ করবেন। তবে এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পারস্পরিক আলোচনার নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা যাবে না অথবা এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না যা পারস্পরিক আলোচনার উদ্দেশ্যকে অকার্যকর ও ব্যর্থ করে দেয়। উমর বিন খাত্তাব ঘোষণা করেছেন যে, 'পারস্পরিক আলোচনা ব্যতিরেকে খিলাফত হতে পারে না।'[৩৩] ঐক্যমত্যের বৈধতা নির্ভর করে এটা শরীয়াহর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে কিনা তার উপর। আইনের কারণেই রাজনীতি বেঁচে থাকে, বিপরীত পন্থায় নয়। শরীয়াহ্ সকল প্রজন্মের মুসলমানদের মন মানসিকতা দখল করেছিল এবং এ শরীয়াহ্ হচ্ছে নৈতিক, আদর্শিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমন্বিত সর্বোচ্চ আইনের উৎস। এটা হচ্ছে সত্যিকার ইসলামী চেতনার প্রতিবিম্ব, ইসলামী চিন্তার বহি:প্রকাশ এবং ইসলামের সার নির্যাস।[৩৪] ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য যে শরীয়াহ হচ্ছে দেশের আইন, এটা এতো সার্বিক যে এতে আপোষের

কোন স্থান নেই। খলিফা বা আমির নিজ ইচ্ছায় নয় বরং এই শরীয়াহর কার্যনির্বাহক হিসাবে কাজ করেন; তিনি শরীয়াহ ও জনগণের নির্দেশিকা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করবেন। শরীয়াহর আইনের প্রতিষ্ঠা, তার পবিত্রতা সংরক্ষণ এবং এর আওতাধীন সকল কিছুর পরিচালনার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। জনগণ তাকে শরীয়াহর আইনের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য সমর্থন বা ভোট প্রদান করেছে। জনগণ তাকে অপসারিত করে অন্য একজনকে নির্বাচিত করবে যদি তিনি এমন কাজ করেন যা তার অপসারণ দাবী করে।[৩৫]

খিলাফত বা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন অধিকার নয় বরং জনগণের পক্ষে সম্পাদনের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব। শরীয়াহ ক্ষমতা জবরদখল করাকে বা রাজনৈতিক বৈধতা লাভের উদ্দেশ্যে বংশানুক্রমিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। ইহা ব্যক্তিগত কর্তৃত্বকে ঘৃণা করে এবং ইকবালের ভাষায় ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিরোধী।[৩৬] আমীর শাসন করার ক্ষমতা হারায় যদি তাঁর নৈতিক মর্যাদার কোন বিচ্যুতি ঘটে, যদি তিনি প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হন, শরীয়ার কোন বিধান লংঘন করেন অথবা যদি তিনি শারীরিকভাবে এমনভাবে বিকলাঙ্গ হন যা তাকে নেতৃত্বের কার্যাবলী সম্পাদনে অক্ষম করে তোলে। একজন বিপথগামী আমিরের বিষয়ে জনগণের করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবী মুয়াধ ইবনে জাবালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের নেতা আমাদেরই একজন, যদি তিনি আমাদের উপর কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন প্রয়োগ করেন। যদি তিনি তা লংঘন করেন, আমরা তাকে অপসারণ করব। যদি তিনি চুরি করেন আমরা তাঁর হস্ত কর্তন করব। যদি তিনি ব্যভিচার করেন, আমরা তাকে বেত্রাঘাত করব, তিনি নিজকে আমাদের নিকট হতে গোপন বা লুক্কায়িত রাখবেন না, তিনি প্রতারণা ধর্মীও হবেন না... তিনি আমাদের সমপর্যায়েরই একজন মানুষ।[৩৭]

অভিশংসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম

উপরের আলোচনা হতে সুস্পষ্ট যে আইনসম্মত নয় এমন নির্বাহী কর্মকর্তা শাসন করার অধিকার হারান এবং তাকে তার পদ হতে অপসারণ করা যায়। তবে এটা পরিষ্কার নয় যে কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে তাকে তার পদ হতে অপসারিত করা হবে, কেননা কোন ট্রাইবুনাল বা পদ্ধতির কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, যার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলাম অনেক অনিষ্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক বিষয় কুরআন হাদীসের আলোকে মানুষের বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিষ্পন্নের জন্য রেখে দিয়েছে। প্রথম যুগের আইনজ্ঞগণ সরাসরি বিদ্রোহের কথা বলেছেন যেহেতু একজন বিপথগামী আমীরকে অপসারণের অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। স্বৈরতন্ত্রের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় ও একজন নির্বাহীকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় অপসারণের সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায়, সাংবিধানিক পন্থায় সীমারেখার মধ্যে থেকে প্রধান নির্বাহীকে অপসারণের পন্থা নিরূপণের চেষ্টা করা

হয়। অভিশংসনের জন্য তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা প্রস্তাব করা হয়েছে; বিচার বিভাগ, উলেমা বা নেতৃত্বপরিষদ এবং শুরা পরিষদ :

বিচার বিভাগ

যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঐশীসূত্রে প্রাপ্ত শরীয়াহ্ বা ইসলামী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত; তাই শুধু এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। শরীয়াহ্ প্রয়োগের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু এর জন্য নতুন কোন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা নেই। শরীয়াহ্র বিধান অনুযায়ী সরকারের নির্বাহী ও আইন বিভাগের উপর বিচার বিভাগ স্থান পায়।

ইসলামী সরকারের আমীর ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ তিনি পরিপূর্ণভাবে শরীয়াহ্ প্রয়োগ করে থাকেন। পূর্ব নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় বিধি বিধানের সীমারেখার মধ্য থেকে আমীর তার কার্যসম্পাদন করেন। আমীরের কার্যকলাপ সার্বক্ষণিক নজরে রাখা প্রয়োজন; এ জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন ইসলামী বিচারকবৃন্দ যাদের শরীয়াহ্ বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও গভীর জ্ঞানের জন্য তাদের বিচারক হিসাবে নিয়োজিত করা হয়।[৩৮] ফলশ্রুতিতে কুর্দী ও অন্যান্যরা বিচারকবৃন্দকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করেছেন তথা সরকার প্রধানসহ নির্বাহী ও আইন বিভাগের যে কোন কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদান, রিট ইস্যুকরণ, অভিশংসন অথবা কারাদণ্ড প্রদান।[৩৯]

ঐতিহাসিকভাবে যে সংস্থাটি প্রশাসনের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করে তা 'দিওয়ান আল নাযর ফি আল মাজালিম' নামে অভিহিত। শাসকশ্রেণী কর্তৃক নিপীড়নমূলক ও অন্যায় কার্য প্রতিরোধের জন্য 'দিওয়ান' মামলা বা আপীল রুজুর আদালত হিসাবে কাজ করত। 'দিওয়ান' এর উৎস নবী করিম (দ:) এর জামানা হলেও চতুর্থ খলিফা আলী ব্যক্তিগতভাবে শাসক ব্যক্তির অবৈধ কার্যকলাপ ও তার ফলে জনগণের দু:খ-দুর্দশার বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। আবদ-আল-মালিক ইবনে মারওয়ান (হিজরী ৬৮৫-৭০৫ সন/১২৮৬-১৩০৫ খ্রি.) হতে উমাইয়া খলিফাগণ প্রত্যেক সপ্তাহের সুনির্দিষ্ট দিনে ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ের শুনানী গ্রহণ করতেন।[৪০]

'দিওয়ান আল-মাজালিম' প্রধান শাসনকর্তাসহ সকল কর্মচারীদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দাবি করার আইনগত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কেউই, এমনকি খলিফাও কোন প্রাধিকারমূলক সুবিধা ভোগ করতেন না। অসংখ্য নজীর রয়েছে যেখানে ক্ষমতাসীন খলিফাকে সাধারণ আসামীর মত আদালতে কাজীর সামনে হাজির হতে হয়েছিল। তবে আদালত খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল না। আল মাওয়ার্দী সম্ভবত: প্রথম মুসলিম চিন্তাবিদ যিনি সুবিন্যস্তভাবে 'দিওয়ানের' গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি 'দিওয়ান-আল মুজালিম' এর বিস্তারিত কার্যাবলী, কোন ধরনের বিষয়সমূহ বিচারের আওতাধীন হবে, কোন ধরনের কর্মচারীদের বিচারের আওতায় আনা যাবে ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি প্রধান নির্বাহী

শাসনকর্তাকে তদন্তের অধীনে এনে দিওয়ানের মাধ্যমে তাঁকে অভিশংসনের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে যেহেতু 'দিওয়ান' খলিফার কার্যালয়ের একটি বিভাগ হিসাবে কাজ করত, ফলে দিওয়ানের পক্ষে খলিফাকে অপসারণ করার সম্ভাবনা তিরোহিত ছিল।

ঐতিহাসিকভাবেও এমন কোন উদাহরণ নেই যে বিচার বিভাগ কর্তৃক কোন খলিফা অপসারিত হয়েছেন। প্রথমত খলিফাকে অভিশংসনের কোন বিধানই ছিলনা। যদি এ ধরনের অভিশংসনের ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকারও করে নেয়া হয়, তবুও তা কার্যকর করার কোন উপায় বা কার্যকর পদ্ধতি ছিলনা। অপসারণ ও ক্ষমতারোহন তলোয়ারের শক্তির দ্বারাই নির্ধারিত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে আব্বাসীয় আমলে অপসারণের কাজটি অন্য ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক বল প্রয়োগের মাধ্যমে করা হতো। আদালতের বিচারককে শুধু এই অপসারণ কাজটি সত্যায়নের জন্য ডেকে আনা হতো। অতঃপর পদত্যাগকারী খলিফা জনগণের সামনে তার পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করতেন।

ফলে দেখা যায় কাজীর (বিচারক) কাজ ছিল শুধু পদত্যাগের বিষয়টি সত্যায়ন করা, খলিফাকে অপসারণ করা নয়। আব্বাসীয় আমলে কাজীদের এরূপ ক্ষমতা ও কার্যপরিধি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত ছিল। বিষয়টি আব্বাসীয় খলিফা আল কাহির বি আল্লাহ (হিজরী ৯৩২-৯৩৪ সন/১৫২৫-১৫২৭) খ্রি.) এর পদত্যাগের ঘটনার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। খলিফা পদত্যাগে অস্বীকার করলে এবং কাজীকে ডেকে আনা হলে কাজী প্রশ্ন করেন, 'আমাকে কেন ডেকে আনা হয়েছে যখন খলিফা নিজে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন?' এতে আলী ইবনে ইছা মন্তব্য করেন যে, তাঁর আচরণ দুষ্কৃতিমূলক এবং তাই তাকে অপসারণ করা উচিত।' কাজী এর উত্তরে বলেন, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কাজ নয়, তলোয়ারের শক্তিধারী ব্যক্তিবর্গই এ কাজটি সম্পাদক করে থাকেন। আমরা শুধু পদত্যাগ করার পর তা সত্যায়ন করি।[৪১] সুতরাং দেখা যায় যে যারা সরকার প্রধানকে অপসারণে বিচার বিভাগের ক্ষমতা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তাদের সমর্থনে তেমন কোন দালিলিক প্রমাণ বা সমর্থন নেই।

অভিভাবক পরিষদ

'মুজালিম' আদালত যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন ঐ সকল ক্ষমতা ইরানী সংবিধানে "সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল" কে অর্পণ করা হয়। এই সংবিধান ভোটদাতাদের ৯৮.২% দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ১৯৭৯ সালে এ সংবিধান বলবৎ হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের কোন ধারা লংঘন করলে তা বিবেচনা করার ক্ষমতা 'সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল'কে প্রদান করা হলেও, রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করার ক্ষমতা এ কাউন্সিলকে প্রদান করা হয়নি।[৪২] এ ক্ষমতাটি বেলায়েতে ফকীহ'কে প্রদান করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রধান। ১৯৭৯ সালের ইরানী সংবিধানের ৫ ধারা, যা শিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিবৃত করেছে, তাতে বলা হয়েছে,

"ওয়ালী-আল-আসর' এর গুপ্ত থাকার সময় (আল্লাহ তার আগমনকে ত্বরান্বিত করুন) ওয়ালিয়াহ ও উম্মতের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় ন্যায়পরায়ণ (আদিল) ও ধর্মপরায়ণ (মুত্তাকী) ফকিহ-এর উপর যিনি তার যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল; সাহসী, প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং প্রশাসন পরিচালনায় ক্ষমতাসম্পন্ন; জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দ্বারা নেতা হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত; আর যদি সর্বজনগ্রাহ্য এমন কোন ফকিহ বিদ্যমান না থাকেন তবে অভিভাবকমণ্ডলীর নেতা বা অভিভাবকমণ্ডলী, যারা ফকিহদের দ্বারা গঠিত ও উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন তাদের উপর সংবিধানের ১০৭ ধারা অনুযায়ী এ দায়িত্ব অর্পিত হয়।'

সংবিধানের ১০৯ ধারা অনুযায়ী নেতা বা অভিভাবকমণ্ডলীর সদস্যদের বিশেষ গুণাবলী হবে নিম্নরূপ :

ক. 'মুফতী' ও 'মারজী'র কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পাণ্ডিত্য ও ধর্মপরায়ণতা;

খ. রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বচ্ছ জ্ঞান, সাহস, শক্তি ও নেতৃত্ব প্রদানের প্রশাসনিক ক্ষমতা।

সংবিধানের আর্টিকেল ১১০ বেলায়েতে ফকীহ'কে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করেছে, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টকে 'ফকিহ' এর কর্তৃত্বের অধীন করেছে। রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে 'অভিভাবক পরিষদের' কাজ হল অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নরূপ :

ক. রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ফরমান স্মারক করা;

খ. দেশের স্বার্থে এবং সুপ্রীম কোর্ট যদি রাষ্ট্রপতিকে সাংবিধানিক দায়িত্ব লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তবে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা অথবা যদি আইন পরিষদ তার অযোগ্যতার প্রশ্নে ভোট দেয় সেক্ষেত্রেও তাকে অপসারণ করা যেতে পারে (আর্টিকেল ১১০; সেকশন ৪ এবং ৫)। এসব ধারা যে কোন অন্তসারশূন্য বক্তব্য নয় তা যথাযথভাবে আয়াতুল্লাহ খোমেনী (হিজরী ১৩২০-১৪১০ সন/১৯০২-১৯৮৯ খ্রি.) প্রদর্শন করেছেন। ১৯৮১ সালে প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ড: আবু হাসান বনি সদর অভিশংসিত হন, তার পদ থেকে অপসৃত হন এবং তার স্থলে ইসলামী রিপাবলিকান পার্টির অন্য একজন নেতাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়।

ইরানী সংবিধান ইসলামী রাষ্ট্রের শিয়া ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে, যার ভিত্তি হচ্ছে নবী করিম (সা) এর জামাতা ও চাচাত ভাই আলী ইবনে আবি তালিব এর ইমামত এবং তাঁর সূত্রে তাঁর ১১ জন অধঃস্তন পুরুষের ইমামত। যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মহানবী (সা) এর তিরোধানের পর মুসলমানদের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ইমামদের উপর অর্পিত হয় এবং ইমামতের চক্র' শেষ হবার পর তথা শেষ ইমামের অন্তর্ধানের পর একই দায়িত্ব ঐশী গুণাবলী সম্পন্ন উলামা ও মুজতাহিদগণকে গ্রহণ করতে হবে।[৪৩] এভাবে ইরানী সংবিধান বেলায়েতে ফকীহ'কে সরকারের সকল কাজ তত্ত্বাবধান, ইসলামী আদর্শের সাথে সরকারের কাজের সামঞ্জস্য বিধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে। শিয়া

ঐতিহ্যের যে রাজনৈতিক ধারাভাষ্য তা শিয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ইরানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা বাস্তব কারণেই কায়েম করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সুন্নী উলেমারা শিয়া উলেমাদের মত তেমন উচ্চ কর্তৃত্ব ও প্রাধিকার সুবিধা ভোগ করেন না। সুন্নী উলেমারা কেন্দ্রীয়ভাবে সংঘবদ্ধ নন; তারা মাঠ পর্যায়েও জনগণের শর্তহীন আনুগত্য লাভ করেন না এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে তাদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই।[৪৪] তারা জনজীবনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অটোম্যান খিলাফতের সময়ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে এবং কাজী হিসাবে বিচারালয়ে বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিল। হডজসন মন্তব্য করেছেন যে, সরকার ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উলেমারা কার্যকর চাপ প্রয়োগ করতেন, তবে সে চাপ কখনো চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।[৪৫]

শুরা পরিষদ

সরকার সম্পর্কে সুন্নী মতামত হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তির উৎস দু'টি: ঐশী আইন শরীয়াহ ও বিশ্বাসী জনগণের সমন্বয়ে গঠিত উম্মাহ। আলীর বংশধরদের ইমামতের ধারণার সাথে সুন্নী মতামতের এভাবে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। সুন্নী মতামত অনুযায়ী খিলাফত খলিফার নিজস্ব কোন অধিকার নয়, বরং জনগণের পক্ষ থেকে তিনি কার্যনির্বাহক মাত্র। সকল বিশ্বাসীদের ক্ষমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং উম্মতের সম্মিলিত দায়িত্ব 'সর্বজ্ঞানী' শাসকের ধারণাকে বাতিল করে দেয় অথবা এমন একশ্রেণীর 'বিশেষজ্ঞ উলেমাদের' ধারণাকেও বাতিল ঘোষণা করে যারা জনগণের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এভাবে সুন্নীমতে শুরা বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কার্যকর তত্ত্বাবধান ও নৈতিক পরিদর্শন যেখানে সৎকাজকে উৎসাহিতকরণ ও মন্দ কাজকে নিরোধ করা হয়েছে।

শুরা ব্যবস্থা নবী করিম (সা) এর সময় চালু ছিল, খোলাফায়ে রাশেদা তা অনুসরণ করেছেন এবং ইসলামী ব্যবস্থার প্রত্যেক নেতার জন্য তা বাধ্যতামূলক। আমীর শুধু নিজকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত ও জ্ঞাতকরণের জন্য শুরাপদ্ধতি তথা আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না, বরং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তও তিনি বাস্তবায়িত করবেন।[৪৬] মুসলিম আইন শাস্ত্রবিদ ও চিন্তাবিদগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে উম্মাহর বিষয়াবলী নিষ্পন্ন করার জন্য যার উপরই দায়িত্ব অর্পিত হোক না কেন, তিনি 'আহল-আল শুরা' এর সাথে পরামর্শক্রমে তার দায়িত্ব পালন করবেন।[৪৭] সাইয়েদ রশীদ রিদা (হিজরী ১২৮২-১৩৫৪ সন/ ১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রি.) বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন যে 'আহল-আল-হাল ওয়া-আল আকদ (মজলিসে শুরা) এর ভিত্তিতে অতীতের জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞজনেরা অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করেছিলেন এবং এসব পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গই খলিফার আচরণ বিধির ন্যায়সঙ্গতা সম্পর্কে অভিমত প্রদানে সক্ষম

ছিলেন এবং শরীয়াহ্ ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে খলিফার অপসারণের পক্ষে মত দিতে পারতেন।[৪৮]

'আহ্ল আল শুরা' কর্তৃক অভিশংসনের ক্ষমতা প্রয়োগের ঐতিহাসিক নজীর খোঁজা অর্থহীন। সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে তলোয়ারের অগ্রভাবে খলিফাদের অপসারণ করা হয়েছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের সময় ৫১ জন খলিফার মধ্যে ৪২ জন নিহত হয়েছিলেন বা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ৫ জন স্বেচ্ছায় পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, ৩ জনকে অন্ধ করে অযোগ্য করে দেয়া হয়েছিল এবং ১ জনকে অভিশংসিত করা হয়েছিল। খলিফা রশিদ বি আল্লাহ (হিজরী ৫২৯-৩০ সন/১১৩৫-৩৬ খ্রি.) একমাত্র খলিফা যাকে 'আহ্ল আল শুরা'র সাথে পরামর্শের পর অভিশংসিত করা হয়েছিল। সুলতান মাসুদ কর্তৃক আহূত এই শুরা কাউন্সিলে কাজী, পণ্ডিতবর্গ ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা লিখিত আবেদন পত্রটি পরীক্ষা করে দেখেন যাতে খলিফা রশিদের অন্যায় অত্যাচার, নিপীড়ন, সম্পত্তি জবরদখল, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, মদ্যপান ইত্যাদির সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। পরীক্ষান্তে তারা খলিফাকে অভিশংসিত করেন। আবু আবদুল্লাহ এম আল মুকতাকী লি আমর আল্লাহ (হিজরী ৫৩০-৫৫৫ সন/ ১১৩৬-৬০ খ্রি.) নতুন খলিফা হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।[৪৯]

পশ্চিম আফ্রিকার সকোতো সাম্রাজ্যের সুলতান আলী ইউ বাব্বা'র (হিজরী ১২৫৮-১২৯৬ সন/১৮৪২-১৮৫৯ খ্রি.) বিরুদ্ধে অভিশংসনের চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। শুরা'র ৬ জন অগ্রগণ্য সদস্য সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে,

প্রথমত: তিনি শরীয়ার বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করে সকল রাজস্ব ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেন। দ্বিতীয়ত: তিনি সকোতো খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা নির্মিত মসজিদ শেহু ও মসজিদ সকোতোর দেয়াল নষ্ট হলে পুনর্নির্মাণে হাত দেন নি। তৃতীয়ত: তিনি কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন নি। এবং এরূপ কোন আহ্বানও জানান নি।[৫০]

তারা সুলতান হতে তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করেন এবং সম্ভাব্য বিকল্প খলিফা হিসেবে দু'জন যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন। সুলতান বাব্বা দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন, শুরার সদস্যদের সামনে হাজির হন এবং নিজের স্বপক্ষে শুনানী প্রদান করেন। 'খলিফা অভিযোগ সমূহ হতে মুক্ত হয়েছেন' এই মর্মে রায় দিয়ে শুরার সদস্যগণ আবার খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেন।[৫১] অতঃপর খলিফা তাঁর কার্যকলাপের উন্নতি বিধান করেন এবং জিহাদের আহ্বান জানান।

শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্বে নিয়োজিতদের জবাবদিহিতা কিভাবে শরীয়াহর নির্দেশনা মোতাবেক নিশ্চিত করা হত তার প্রয়োগ পদ্ধতির কতিপয় উদাহরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

রশিদ রিদা ও অন্যান্য সমকালীন চিন্তাবিদগণ আধুনিক সময়ের শুরা ব্যবস্থাকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত আইনসভা দ্বারা প্রতিস্থাপনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫২]

সাইয়েদ মওদূদী বলেন, ফিকাহ্ শাস্ত্রে যাকে 'আহ্‌ল আল হাল ওয়া আল আকদ' (মজলিসে শুরা) বলা হয়েছে তা বর্তমান পরিভাষায় আইনসভা নামে অভিহিত।[৫৩] এসব চিন্তাবিদ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগের অনুবর্তীতার কথা বলেন। আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ ফজলুর রহমান তাদের সমর্থনে বলেন যে, 'জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বড় ধরনের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে সরকার প্রধানকে অপসারণ করা যেতে পারে।[৫৪] জুলাই, ১৯৮৩ সালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠন পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক যে কমিশন গঠন করেছিলেন তাতেও এর শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া যায়।

২২ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কমিশনে (১৬ জন সদস্য, ৩ জন সহযোগী সদস্য ও ৩ জন সম্মানসূচক সদস্য) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় উলামাবৃন্দ, বর্তমান ও ভূতপূর্ব বিচারপতিবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও ফেডারেল কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী কমিশনের সভাপতিত্ব করেন। কমিশন অভিমত প্রদান করে যে প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তা মজলিসে শুরা'র (পরামর্শ সভা) সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন; শরীয়া লংঘন, আইন অমান্য, গুরুতর অসদাচরণ, যে সব গুণাবলীর জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন সেগুলি পরিত্যাগ করলে শুরা তাকে অভিশংসিত করতে পারবে। মজলিসের যে কোন সদস্য আইন সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন নিয়ে অভিশংসন অভিযোগ আনয়ন করতে পারবেন। অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবার ১০ দিনের মধ্যে আনীত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করবেন। যদি আইন সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তার বিরুদ্ধে ভোট দেয় তবে তিনি ক্ষমতা হতে অপসারিত হবেন।[৫৫]

ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সালে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তি হিসাবে সাংবিধানিক কাঠামোর গুরুত্ব অনুধাবন করে 'A Model of an Islamic Constitution' রচনা করেন। কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল মডেলটি 'প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত, আইনশাস্ত্রবিদ, রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ ও ইসলামী আন্দোলন সমূহের নেতৃবৃন্দের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফসল হিসাবে অভিহিত করেন।'[৫৬] মডেল সংবিধানের আর্টিকেল ২৬-এ বর্ণিত হয়েছে যে 'ইমাম সকলের আনুগত্য পাবেন এমনকি যদি তাদের মতামত ইমামের মতামত হতে ভিন্নও হয়। তবে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) অনুশাসন লংঘন করেন তবে তিনি আনুগত্যের হকদার হতে পারেন না। আর্টিকেল ৩১ এর উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

ইমাম মজলিসে শুরা কর্তৃক প্রণীত আইন মান্য করবেন এবং যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবেন। মজলিসের কোন আইনকে ভেটো দেয়ার তার কোন ক্ষমতা থাকবে না...।

আর্টিকেল ৩৩ এ আছে-

ক. ইমাম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধানের কোন ধারা লংঘন করেন, শরীয়ার গুরুত্ব বিধান ভঙ্গ করেন, তবে মজলিসে শুরার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তাকে অভিশংসিত করে অপসারণ করা যাবে;

খ. ইমামের অভিশংসন ও তার অপসারণের পদ্ধতি আইনের অধীন বিধি বিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে;

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী নিয়োজিত একটি কমিটি যে খসড়া ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন করেছে তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা ইমামকে নির্বাচিত করবেন তাদের আইনের অধীনে বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী ইমামকে অপসারিত করারও ক্ষমতা থাকবে (আর্টিকেল ৫০)। আর্টিকেল-৮৩ নির্বাহী বিভাগের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা আইনসভা বা মজলিসে শুরার হাতে অর্পণ করেছে (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)।

ইমামের অভিশংসনের পূর্বে মজলিসের জন্য সমীচীন হবে দক্ষ আইনশাস্ত্রবিদ ও বিচারপতিদের সমন্বয়ে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা, যে ট্রাইবুনাল বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সুপারিশ করবে।

উপসংহার

বিশ্বাসীদের আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করা এবং কর্তৃত্বশীলদেরকেও অনুসরণ করা মর্মে কুরআনের বিখ্যাত আয়াত শুধুমাত্র ইসলামের রাজনৈতিক কর্তব্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেনি বরং সংগঠিত কর্তৃত্বকে কি প্রেক্ষিতে ও কি পরিসরে মান্য করতে হবে তার সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইহা সরকার প্রধানের প্রতি আইনের আনুগত্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং শানিতদের অবৈধ আদেশ অমান্য করার নির্দেশ প্রদান করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং খোলাফায়ে রাশেদার সময়কার বাস্তব কর্মকাণ্ড তার জ্বলন্ত সাক্ষ্যবাহী।

আদর্শ খিলাফত ব্যবস্থার পতন ও অবক্ষয়ের পর মুসলিম চিন্তাবিদ ও আইনশাস্ত্রবিদগণ শাসকদের বলপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টিকে উম্মাহর দুর্দশা লাঘবের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে আপাতত: স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে তারা কখনো এ ধরনের অবৈধ স্থিতাবস্থার পক্ষে বৈধতা প্রদান করেননি এবং কখনো তারা সর্বাবস্থায় আনুগত্য করে যেতেই হবে মর্মে রায় প্রদান করেননি। তারা একমত ছিলেন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জনগণের আস্থাশীল হতে হবে; শাসক ও শাসিত উভয়কেই শরীয়াহকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও প্রাধান্য প্রদান করতে হবে। ইমামের প্রতি আনুগত্য তাঁর শরীয়ার অনুবর্তীতা ও ন্যায়দণ্ড সমুন্নত রাখার শর্তাধীন হবে। এসব ক্ষেত্রে শাসকের ব্যর্থতা তার অপসারণ দাবি করে এবং চরম ক্ষেত্রে সরাসরি বিদ্রোহের মাধ্যমে তা করতে হবে।

অদক্ষতা ও অযোগ্যতার জন্য সরকার প্রধানকে অপসারণের অনুমোদন প্রদান করলেও মুসলিম পণ্ডিতগণ অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন আল মাওয়ার্দী যিনি সুবিন্যস্তভাবে ইমামের অপসারণের ভিত্তিমূলক কারণ সমূহ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অপসারণের পদ্ধতি কি হবে সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেননি। পণ্ডিত ও আইন শাস্ত্রবিদগণের অপ্রতুল লিখনী এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুশাসন হতে সরকার প্রধানকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের দু'টি মৌলিক ভিত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়: 'বৈধতা' ও 'আইনসঙ্গতা'। প্রথমটি তথা বৈধতার বিষয়টি খলিফা নির্বাচনের জন্য তার প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কিত। সরকার প্রধানকে অবশ্যই মুসলমান, পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ্ মস্তিষ্কের তথা ওয়ারা, ইলম, কাফা'য়াহ্ ও আদালাহ্ ইত্যাদি গুণাবলী সম্পন্ন হতে হবে। জনগণ কর্তৃক মুক্ত ও অবাধ ভোটের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয়ত: তথা 'আইনসঙ্গতা'র বিষয়টি হচ্ছে ইমামকে শরীয়ার কাঠামোর ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হবে। একজন অবৈধ ও বেআইনী শাসক শাসন করার অধিকার হারান এবং তিনি অপসারণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হন।

সরকার প্রধানের অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের পদ্ধতির বিষয়ে কুরআন হাদীসে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। বৈধতা' ও 'আইনসঙ্গতার' নীতিমালার উপর ভিত্তি করে মুসলিম চিন্তাবিদগণ উলেমা কাউন্সিল, বিচার বিভাগ ও আইন সভার সমন্বয়ের মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রস্তাবনা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মতামত হচ্ছে একজন অযোগ্য ও অদক্ষ সরকার প্রধানকে অপসারণ করার দায়িত্বভার 'আহ্‌ল আল শুরা'র উপর অর্পণ করা উচিৎ। মুসলিমে শুরা কর্তৃক এ ধরনের অভিশংসনের ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে। এ অভিমত পাকিস্তানের আনসারী কমিশনের সদস্যদের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করেছে। ইসলামী কাউন্সিল অব ইউরোপ ও আল আজহার কমিটি মজলিসে শুরা'কে একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রূপরেখা প্রদানের প্রস্তাব করে, যাতে পারস্পরিক আলোচনা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিষয়টি কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তির গোড়াপত্তন করা যায়।

পরিশেষে ইসলাম শাসকের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যকে প্রত্যাখান পূর্বক যে সকল নেতা ঐশী নির্দেশনা লংঘন করে তাদেরকে অমান্য ও বিরোধিতা করার জন্য উম্মতের উপর বাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করেছে। কুরআন যারা কর্তৃত্বশীল পদে রয়েছে তাদেরকে মান্য করার নির্দেশ দিয়েছে। একই কুরআন নেতৃবৃন্দকে শরীয়ার অনুশাসন মেনে চলার এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার আদেশ প্রদান করেছে। এসব বিষয়াবলী হতে শাসকের বিচ্যুতি তার অপসারণ দাবি করে। আইনসভা বা মজলিসে শুরা অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু করার সময় একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিষয়টি ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে তদন্তপূর্বক পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

নাহ্দাহ্ : ইসলামী পুনর্জাগরণ

ইসলামী আন্দোলন

ইসলাম একই সাথে একটি ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা। ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন নীতিমালা অনুযায়ী সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। যেহেতু ইসলাম মানেই প্রায়োগিক আচরণ ও ব্যবহার, তাই ইসলাম সকল জাগতিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে, বস্তুগত সকল বিষয়ে বিশ্বাসী মানুষের ধার্মিক ও সৎচরিত্রের উৎঘাটন চায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিক আচরণের সর্বোচ্চ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে বলে। ফলশ্রুতিতে সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে মুসলিম সমাজ দেহ হতে বিজাতীয় চিন্তাবলী অপসারণ, একটি কার্যকর সভ্যতা নির্মাণ ও শরীয়ার ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চলছে।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান যেসব ইসলামী আন্দোলন চলছে তার গভীর শিকড় রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়কালের মধ্যে নিহিত। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকগণ এসব আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক অর্থে মৌলবাদ বলে অভিহিত করেছে এবং আদি আন্দোলনের পুনর্জাগরণের ব্যাখ্যা না পেয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। 'মুসলমানদের নিজেদের ধারণা ও ভূমিকার আলোকে এসব ইসলামী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করা হবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।'[১] এসব ইসলামী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বদৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণকে অস্বীকার করার ফলে এসব আন্দোলনের ভুল নামকরণ হয়েছে এবং একই সাথে এসব আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় চরিত্র বুঝতেও অক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। এ অধ্যায়ে মৌলবাদ অভিধাটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং বর্তমান ইসলামী আন্দোলন সমূহকে মৌলবাদ আখ্যা দেয়ার উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এসব আন্দোলনের অভ্যুদয়ের বিকল্প ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে এবং পরিশেষে বিভিন্ন আন্দোলনের আলাদা আলাদা স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এসব আন্দোলনসমূহ হলো মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াসের (হিজরী ১৩০৩-১৩৬৩ সন/১৮৮৫-১৯৪৭ খ্রি.) তবলীগ জামাত আন্দোলন, পাকিস্তানে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নেতৃত্বে জামাত-ই-ইসলামী আন্দোলন এবং আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর (হিজরী ১৩২১-১৪০৯ সন/১৯০২-১৯৮৯ খ্রি.) নেতৃত্বে ইরানের বিপ্লব।

মৌলবাদ বনাম নাহদাহ বা পুনর্জাগরণী আন্দোলন

মৌলবাদ পরিভাষাটি ঐসব আন্দোলন সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে যারা এমন ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে শরীয়াহকে জনসাধারণের

সামনে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং আইনসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা।[২] শব্দটির উৎপত্তিস্থল আমেরিকা এবং মার্কিন প্রটেস্ট্যান্টবাদ সম্পর্কে অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছিল, যে প্রটেস্ট্যান্টবাদের লক্ষ্য ছিল 'আধুনিক ও উদারনৈতিক' মতবাদ সমূহকে প্রতিরোধ করা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শব্দটির উৎপত্তি হয় এবং এই প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ ঐশীবাণীর অভ্রান্ততা, কুমারী মাতার গর্ভে যীশুর জন্ম, পরিবর্তক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, যীশুখ্রিস্টের শারীরিক পুনরুত্থান, এবং অলৌকিক ঘটনার সত্যতা।[৩] ১৯২০ দশকের আমেরিকান মৌলবাদীরা এক ধরনের অপশক্তির মত কাজ করে, যখন তারা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারনা শুরু করে। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা এক সাংস্কৃতিক উপ-সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে 'মরাল মেজরিটি' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৪]

উৎসের দিক থেকে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও মৌলবাদ শব্দটি মৌলিক ইসলামী আন্দোলন যা অন্যকোণ অমুসলিমদের অনুরূপ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৫] ব্রুস লরেন্স প্রদত্ত নতুন সংজ্ঞা অনুসারে 'মৌলবাদ হচ্ছে এমন এক ধরনের আদর্শবাদী সংগঠন বা আন্দোলন যা আধুনিকতার পরিপন্থী এবং তার সমস্ত শক্তি আধুনিকতার সকল লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।' এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধুনিকতা পরিপন্থি ও বিরুদ্ধবাদী। সে হিসাবে সমস্ত আধুনিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী।[৬]

জন ও ভল ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যে, এটা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থে এবং উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং কঠোরভাবে ইসলাম ধর্মের সামাজিক-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য কাজ করে।[৭]

এ দৃষ্টিভঙ্গি হতে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানই 'মৌলবাদী' কেননা সকল ধর্মপরায়ণ মুসলমানই আল্লাহর সার্বভৌম একত্বে বিশ্বাস করে, কুরআনকে ঐশীবাণী রূপে বিশ্বাস করে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য করণীয় হিসাবে পালন করে। মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মকে একটি সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে মনে করে, যা ইহজীবন ও পরজীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন যুগ সমস্যার সমাধান মেনে নেয়া বা প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের বিরোধী। তাই মুসলমান বা মুসলমানদের কোন দল নিজেদের মৌলবাদী মনে করে না। এই পরিভাষাটির আরবীতে কোন প্রতিশব্দ নেই কিংবা কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষাতেও শব্দটি নেই। যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত তারা নিজেদেরকে শুধু মুসলমান মনে করে, তারা ইসলাম নিয়ে কথা বলে এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধ আমদানীকে ঘৃণা করে। লক্ষ্য করা উচিত, যে বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে অহরহ মৌলবাদী হিসাবে অভিহিত করা হয় তারা সহিংস পদ্ধতি বা রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না বরং শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে তা করতে চায়। পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়ামী ও মধ্যযুগীয়

মানসিকতাকে অহরহই মৌলবাদ হিসাবে চালিয়ে দেয়া হয়- এ অপ-মানসিকতার মধ্যদিয়ে প্রচারণাকারীদের আসল চরিত্রই ধরা পড়ে।

অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতের বিবেচনায়, মৌলবাদ শব্দটি যা খ্রিস্টান জগতে ঘটনাচক্রে জন্মলাভ করেছে, তা ইসলামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইসমাইল আল ফারুকী মৌলবাদের পরিবর্তে *'নাহদাহ'* বা পুনর্জীবন শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[৮] আরবী *'নাহাদা'* শব্দটি হতে নাহদাহ্ শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া; আরো বিশেষ অর্থ একটি শিশুর মাঝে সে সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে তাকে জাগ্রত করা। এটা সমাজের জন্যও প্রযোজ্য।[৯] তাই এ কথা সঙ্গত যে মুসলিম বিশ্ব 'নাহদাহ' এর মধ্যদিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে (অর্থাৎ মুসলিম সম্ভাবনার অংকুর সজীব বৃক্ষের রূপ নিচ্ছে)। আসলে ইসলাম সবসময়ের জন্যই অপরিবর্তিত থাকছে। এর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ধীরে ধীরে মুসলিম জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ফলে তারা তাদের যুগসমস্যার প্রেক্ষিতে ইসলামকে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

নাহ্দাহ্ বা ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং ইসলামী বিশ্বদৃষ্টি

গঠন, প্রকৃতি, লক্ষ্য, বিষয়বস্তু নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন পশ্চিমাদের অনেক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পশ্চিমা দেশসমূহের জন্য তৈল উৎপাদনকারী আরবদেশ সমূহের গুরুত্ব, ১৯৭৯ সালে ইরানে সফল বিপ্লব, সোভিয়েত দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে প্রতিরোধ আন্দোলনের পররাষ্ট্র বিষয়ক গুরুত্ব এবং অনুরূপ অনেক ঘটনা পশ্চিমে উদ্বেগ ও সতর্ক মনোভাব তৈরীর ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। আধুনিক তাত্ত্বিকদের অনেকেই মুসলিম নাহদাহ আন্দোলন সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং তাই সমাজের দ্বৈত বা সংকর চরিত্র লক্ষণের উপর বেশ জোর প্রদান করে।[১০] শেষের মতবাদটি দু'টি আকর্ষণ বিন্দু তত্ত্বের উপস্থাপন করে: একটি হচ্ছে ইসলাম, তা গতিশীল, স্থবির বা সংস্কারধর্মী যাই হোক না কেন; দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশ্চিমের প্রভাব, যা মুসলমানদের জন্য বৈরী ও চ্যালেঞ্জমুখী। যার সাথে মুসলমানদের মুখোমুখি হতে হবে, সমঝোতা আসতে হবে এবং এ অবস্থাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। অন্যকথায় পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক বা মার্ক্সবাদী মহল মুসলমানদের ব্যাপার যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ঐসব ভাবনাচিন্তা বিভিন্ন সমীক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানগণ শুধু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে কিন্তু কোন ইতিবাচক বা পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে পারেনি।

বিশ্বের সামনে আন্দোলন ও মূলনীতির উপস্থাপনা ও মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অনুপ্রবেশের বিষয়ে সাধারণ আলোচনা হলেও ইসলামের সাথে ইসলামী আন্দোলনগুলির সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা তেমন আলোচিত হয়নি। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের প্রশ্নে ইসলামী আন্দোলন সমূহ প্যালেস্টাইনের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে জোরালো সমর্থন যোগালেও এই সমর্থন সামগ্রিকভাবে একই প্লাটফর্ম হতে ইরোপীয়

আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারেনি। প্যালেস্টাইনের ধর্মীয় গুরুত্ব এবং ইসলামী সহমর্মিতার কারণে প্যালেস্টাইনের সপক্ষে মুসলিম দলগুলি সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছিল এ কথাও সমানভাবে সত্য। একইভাবে ইরানী বিপ্লবকে পাশ্চাত্য সভ্যতা (পাশ্চাত্যের সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি) ও আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা... যেতে পারে। ইমাম খোমেনীর ভাষায় বলা যায়, 'যদি ইরানের শাহের বিরুদ্ধে ইরানী জনগণ বিদ্রোহ করে থাকে, তবে তা তারা ইসলামী কর্তব্য হিসাবে করেছে।'[১১]

চলমান নাহ্দাহ্ আন্দোলন তথা পুনর্জাগরণী আন্দোলন সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা এমন একটি বিশ্বে বাস করে যেখানে ধর্ম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে। ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার নাম। খ্রিস্টধর্মের মত ইসলাম সীজারের অংশ সিজারকে, আল্লাহর অংশ আল্লাহকে দাও এমন দর্শনে বিশ্বাস করে না। ইসলাম এমন একটি সার্বিক জীবন বিধান যা ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি সবকিছুকে সম্পৃক্ত করে নেয়। ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে তাওহীদে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌম একত্ব, বিশ্বাসীদের ঐক্য এবং জীবনের সামগ্রিকতার ঐক্য এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐক্যকে। মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী মানব জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে যথাযথ ঐশী নির্দেশনা দেয়া আছে।

এটা সত্য যে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে পাশ্চাত্য শিক্ষিত নাগরিক ও ধনিক শ্রেণী শিথিলতা প্রদর্শন করেছে। পক্ষান্তরে গরীব, অশিক্ষিত ও গ্রামীণ লোকেরা সরলভাবে আল্লাহর রহমত, বরকত ও সার্বভৌম ঐশ্বরিক ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে জীবন যাপন করে। এ পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্মে বিশ্বাস ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে একই প্লাটফর্মে আনয়ন করে একই সামাজিক আদর্শে আবদ্ধ করে। এ সচেতনতা হয়ত অপরিণত ও অস্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু এ সচেতনতার যথার্থতা ও বাস্তবতার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনের বাণী, রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময় সাহাবীদের অভিজ্ঞতা ও জীবনাচরণ থেকে জানা যায় যে জীবন যাপন করত তাকে তারা সত্য হিসাবে জানত এবং তাতে গর্ববোধ করত।

প্রথম যুগের মানুষেরা যে সভ্যতা লাভ করেছিল তাতে তারা দুনিয়াবী সকল সাফল্যের সাথে পরকালীন মুক্তিরও নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। ক্ষমতা ও মর্যাদা ছাড়াও তারা বস্তুগত সমৃদ্ধি ও উচ্চতম সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা লাভ করেছিল। এসব কিছুর উপলব্ধি সমকালীন মুসলমানদের তাদের জীবনের বড় মিশনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের গৌরব গাঁথা মুসলমানদের ভাগ্য সম্পর্কে আশাবাদে অভিসিক্ত করে, যার ফলে তারা আল্লাহর রাহে জিহাদে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সাইয়েদ মওদূদী মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তারা যদি মহানবী (সা) প্রদর্শিত পথে ইসলাম প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে 'একই ফলাফল পুন:প্রাপ্তি ঘটবে'।[১২] এই আশাবাদ মুসলমানদের মধ্যে

আত্মশক্তির জাগরণ ও প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। জেহাদের ধারণা ও তার ফলে সৃষ্ট আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ মুসলমানদের মধ্যে চালিকা শক্তি হিসাবে *নাহদাহ* ইসলামী পুনর্জাগরণের চলমান প্রক্রিয়ায় সামিল রেখেছে। ইসলামের মধ্যেই গতিশীল *নাহদাহ* এর বীজ সুপ্ত আছে, যা এ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে, 'প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন মুজাহিদ আবির্ভূত হবেন, যিনি ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য লোকদের আহ্বান করবেন।'[১৩]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে সারা মুসলিম বিশ্বে নাহদাহ্ আন্দোলন আধুনিক কোন ঘটনাও নয়, নতুন কোন আন্দোলনও নয়। এ আন্দোলন শুধু পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া নয় বরং এ হচ্ছে ক্রটিপূর্ণ পৃথিবীর নবুয়তী কার্যের অনুসরণে মুসলিম সমাজকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা।

সালাফিয়াহ্ আন্দোলন

মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল ওয়াহহাব (হিজরী ১১১৫-১২০৭ সন/১৭০৩-১৭৯২ খ্রি.) এর সালাফিয়া আন্দোলন এই ধারায় একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী আবদ আল ওয়াহহাব শাসকবর্গ ও জনসাধারণের ভোগবিলাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি কুরআন সুন্নাহর ও ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর সুন্নী ফিকাহের দিকে জনগণকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। আর সবকিছুকে তিনিও তার সহকর্মীরা বিদাত বলে ঘোষণা করেন। পীরপূজাকে ধ্বংস সাধনের জন্য চিহ্নিত করলেন, যা কিছু শির্ক (মূর্তিপূজা) এর পর্যায়ের তাকে বাতিল ঘোষণা করলেন এবং সুফীবাদকে প্রবলভাবে আক্রমণ করলেন। ইবনে আবদ-আল-ওয়াহহাব আরবের দিরিয়স্থ (বর্তমান রিয়াদ) স্থানীয় নেতা মোহাম্মদ ইবনে সউদ (মৃত্যু হিজরী ১১৭৯/১৭৬৫ খ্রি.) সাথে সংঘবদ্ধ হলেন এবং তার হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করলেন। এর ফলে সৌদি রাজকীয় পরিবার ও ওয়াহাবী ধর্মীয় সংঘের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি জন্ম নেয়, যা অদ্যাবধি সৌদি আরবে বহাল আছে।[২৪]

সোকোতো জিহাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান নাইজেরিয়ায় ইসলামী বিশ্বাস ও আচার শুদ্ধিকরণের জন্য একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এখানে অনৈসলামিক প্রথা সমাজকে দুষিত করে তুলেছিল। এ আন্দোলন উপজাতি হাউসল্যান্ডের নেতা ও তাদের সহকর্মীদের অবিশ্বাসী হিসাবে চিহ্নিত করে।

তারা গাছের পূজা করত, প্রসাদ বিতরণ করত ও ময়দা দিয়ে রং মাখাত। তারা ছিল অবিশ্বাসী[১৫]।

এ জিহাদের পিছনে ছিলেন শেখ উসমান ইবনে মুহাম্মদ ফূদি (হিজরী ১১৬৮-১২৩৩ সন/১৭৫৪-১৮১৭ খ্রি.) তিনি শেহু (আরবী ভাষায় শেখ) উসমান দান ফোদিও নামে

পরিচিত ছিলেন। তার প্রদত্ত মেনিফেস্টো অনুযায়ী সেহু'র জিহাদের লক্ষ্য ছিল কলুষমুক্ত সত্য ইসলাম প্রচার করা এবং শরীয়াহর ভিত্তিতে সরকার গঠন করা। ফুলানী ও হাউসা কৃষকদের সহায়তায় তিনি একটি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন যার শীর্ষে ছিলেন মুজুলসী বা আমিরুল মোমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা)। এ জিহাদের মাধ্যমে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা সোকোটো খিলাফত হিসাবে পরিচিত। সে ব্যবস্থায় শরীয়াহ ও ইসলামী সংস্কৃতি ছিল বাধ্যতামূলক। রাজনৈতিক ব্যবহারের আইনগত ভিত্তি ছিল শরীয়ার অনুশাসন।

মাহদীয়াহ্ আন্দোলন

মোহাম্মদ আহমাদ ইবনে আবদ আল্লাহ (হিজরী ১২৫০-১৩০৩ সন/১৮৩৪-১৮৮৫ খ্রি. নেতৃত্বে মাহদিয়াহ আন্দোলন আল্লাহ ও বিচার দিবসের শত্রু ও ভুয়া মসিহের (আল দাজ্জাল) আগমন ও যুদ্ধের পূর্বে বিশ্বজনীন সুবিচার ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। মাহদী ও তার অনুসারীদের অটোম্যান মিশরীয় শাসকদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ছিল, তারা 'আল্লাহর রাসূল ও নবীদের আদেশ অমান্য করেছিল,... মোহাম্মদ (সা) এর শরীয়া পরিবর্তন করেছিল, আল্লাহর প্রতি ধর্মদ্রোহীতা প্রদর্শন করেছিল।'[১৬] বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া, মদ্যপান ও গানবাদ্য ইত্যাদির সাহায্যে সুদানী সমাজের দুর্বৃত্তায়নে তারা ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সালাফিয়া আন্দোলনের মত মাহাদী পন্থীরা ইসলামী বিশ্বাস ও আচরণে পরিশুদ্ধতা আনতে চেয়েছেন, ধর্মদ্রোহী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকার উৎখাত করে মদীনা মডেলের অনুকরণে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। মাহদীপন্থী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ১৪ বৎসর স্থায়ী ছিল। কিন্তু ১৮৯৯ সালে ইন্দো-মিশরীয় শক্তির হাতে তারা পরাজয় বরণ করেন।

মোহাম্মদ ইবনে আবদ আল ওয়াহহাবের সালাফীয়াহ আন্দোলন বা পশ্চিম আফ্রিকায় শেখ উসমান দাউ ফদিও-এর নেতৃত্বে সকোতো জেহাদ স্বদেশে ইসলামী ব্যবস্থার বিকৃতি ও দুর্নীতির বিষয়ে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। পাশ্চাত্য প্রভাবে ইসলামী শক্তির অবক্ষয় হয়েছে এ দৃষ্টিকোণটি তারা তাদের আন্দোলনী মনোভাব বা কার্যপরিধিতে আনতে পারেননি। একইভাবে ইসলামী সমাজের অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে সুদানে মাহাদীপন্থী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ হয়ত এ আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ হতে এ আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি। আরব বিশ্বের ইখওয়ানুল মুসলিমুন, দক্ষিণ এশিয়ার তাবলীগ জামাত আন্দোলন ও জামাত-ই-ইসলামী, অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন এবং একই রাজনৈতিক প্লাটফর্মে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স গঠন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মুসলিম নাহদাহ তথা পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ বলে পরিগণিত হয়েছে।

উপরের বিবরণ যদি আজকের মুসলিম নাহদাহ আন্দোলন সমূহের উৎপত্তি, লক্ষ্য, উৎসের কারণ হয়, তবে যে সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার কথা এ আন্দোলন সমূহ উপস্থাপন

করেছে তা হচ্ছে বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন। এর আহ্বান রয়েছে কুরআনে 'তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং নিষেধ কাজ প্রতিরোধ কর।'

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় ইসলাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে- এ হতে ইসলামের মৌলিক ধারা তথা পুনর্জাগরণী নাহদাহ আন্দোলন সমূহের স্বরূপকে খাটো করে দেখা বা অবমূল্যায়নের কোন অবকাশ নেই। পাশ্চাত্যের প্রভাব এ *নাহদাহ* আন্দোলনগুলোর একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা খুঁজে নেবার অন্বেষাকে বেগবান করেছে।

মুসলিম নাহদাহ'র বিভিন্ন প্রকার রূপ

মূলধারার *নাহদাহ* আন্দোলনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : প্রথমভাগে যে আন্দোলন তার কেন্দ্রীয় সুর শুধু ধর্মীয় এবং দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে ঐ আন্দোলন যার সমাজ-রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রথমভাগে ফেলা যায় মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াসের তাবলীগ জামাত আন্দোলনকে এবং দ্বিতীয় ভাগে পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামী আন্দোলন ও ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ সবগুলো আন্দোলনই প্রথমে বিশুদ্ধ ইসলামে ফিরে যাবার সংকল্প নিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথমত: তারা কেউই ইসলামকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম হিসাবে দেখেনি রবং একটি জীবন বিধান হিসাবে অবলোকন করেছে, দ্বিতীয়ত আন্দোলগুলো ইসলামের বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাস করে এবং জাতি, বর্ণ, সীমান্ত রেখার প্রাচীর ভেঙ্গে সমস্ত মুসলমানদের এক জাতি বা উম্মাহ হিসাবে গণ্য করে। তৃতীয়ত: তারা পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদকে মানব রচিত বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিশ্বাস করে এগুলো মানুষের সুখ সমৃদ্ধির বিধান করতে পারবে না। মুসলিম সমাজের দুর্দশার কারণ হিসাবে তারা ধর্মকে অবহেলা করে পাশ্চাত্য বস্তুবাদের পেছনে ছুটাকে দায়ী করেছে। চতুর্থত: তারা অন্ধ অনুসরণ ও আনুগত্য তথা (তাকলীদ)কে প্রত্যাখ্যান করে এবং সুন্নাহর নির্দেশনা মোতাবেক ইজতিহাদের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। চতুর্থত: তারা সবাই একটি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিরামহীন চেষ্টায় বিশ্বাস করে।

যদিও সমকালীন সকল নাহদাহ আন্দোলন মুসলমানদের একটি আদর্শ ব্যবস্থা অর্জনের প্রত্যাশার ধারাবাহিকতা, তবুও নতুন নতুন নাহদাহ আন্দোলনে যে সব নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়েছে তা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত: বর্তমান নাহদাহ আন্দোলন ভৌগোলিকভাবে পূর্বের চেয়ে অনেক স্থানে চলছে। আন্দোলনসমূহ কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ না থেকে স্ব স্ব চরিত্র ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে জড়িত করেছে। দ্বিতীয়ত অতীতের আন্দোলনসমূহ যেরূপ ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা চালিত হতো, বর্তমানে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম এমন সব অন্যান্য বিভিন্ন পেশার লোকও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠিত ছাত্র, শ্রমিক, সেনাবাহিনী ইত্যাদির মধ্যে বর্তমান *নাহদাহ* আন্দোলন প্রভাব বলয় বিস্তার করে আন্দোলনের গণভিত্তি রচনা করেছে, যাতে বাইরের ও ভিতরের বৈরী চাপ মোকাবেলা

করা যায়। তৃতীয়ত- অধিকাংশ মুসলিম দেশ এসব আন্দোলনের চাপের মুখে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামী আদর্শ সংযোজন করে চলেছে। ৫২টি মুসলিম দেশের মধ্যে ২৬টি দেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিধা প্রতীকি হলেও, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এর নানা প্রভাব রয়েছে। সর্বশেষে ১৯৭৯ সালে সংঘটিত হয়েছে ইরানী বিপ্লব যা, 'সাম্প্রতিক সামগ্রিক ইসলামী ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্যসাধারণ ঘটনা।'[১৭] শাহের স্বৈরাচারী শাসনের সকল চিহ্ন মুছে দেবার জন্য গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে উলেমা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দুর্বলতা ও গতিশীলতা এবং পরবর্তীতে একটি ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বিশ্বের সকল পরাশক্তি ও তাদের ক্রীড়নকদের প্রবল বাধার মুখে ইরানী বিপ্লবের সফলতা ইসলামে অন্তর্নিহিত শক্তির শক্তিশালী প্রমাণ এবং কুফরের শক্তির জন্য একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা।

তাবলীগ জামাত

১৯২০-এর দশকের প্রথমদিকে ভারতের দিল্লী ও এর আশে পাশে 'ঈমানী আন্দোলন' নামে পরিচিত তাবলীগ জামাত আন্দোলন জন্মলাভ করে। ভারতের উত্তরাঞ্চলে গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত মেওয়াত নামক স্থানের মুসলিম অধিবাসীদের অবক্ষয়িত নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণ সংশোধনের জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ দ্বীনি নেতা মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস এ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[১৮] তাবলীগ জামাত ইসলামের জন্য নিবেদিত সম্ভবত: এটিই সবচেয়ে বড় অরাজনৈতিক দল। জ্যানসেনের ভাষায় এ আন্দোলনের লক্ষ্য নৈতিক সসস্ত্রীকরণ'।[১৯] উম্মতের ভিতর থেকে পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে তাবলীগ জামাত আন্দোলন রাজনীতি থেকে দূরে থেকে নিয়তের বিশুদ্ধতা, ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি, শুদ্ধভাবে এবাদত বন্দেগী তথা প্রার্থনা করা, জ্ঞান অর্জন, জীবনের সকলক্ষেত্রে শরীয়াহ পালনের মাধ্যমে ইসলামের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে। সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রকে শরীয়ার আওতাধীনে আনা। তাবলীগ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার মতে, 'নৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক সম্পর্ক শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়েও শুদ্ধতা আসবে।'[২০]

এ আন্দোলনের কোন স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো নেই বা স্থায়ী সদস্যপদও নেই। স্বেচ্ছামূলকভাবে নিজ খরচে জামাতে অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে ঈমান আকিদা শিক্ষা ও প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় মসজিদকে অস্থায়ী আবাসস্থল করে তারা দেশের দূরবর্তী কোণায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা দুয়ারে দুয়ারে, জনে জনে মানুষকে মসজিদে এসে আল্লাহ ও রাসূলেরর কথা শোনার দাওয়াত দেয়, ছয় উসুল বা দফার মাধ্যমে তারা তাদের ইসলামী দাওয়াতের বাণী উপস্থাপন করে:

১. কলেমা শাহাদাত বা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়া, তার শুদ্ধ উচ্চারণ এবং তার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা, ২. সালাত বা আল্লাহর আনুগত্য হিসাবে দৈনিক ৫ বার নামাজ

আদায় করা। ৩. জিকির বা ধর্মভীরুতা অর্জনের জন্য সর্বসময় আল্লাহকে স্মরণ করা, ৪. ইকরামুল মুসলেমীন ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে ও দাওয়াতের কৌশল হিসাবে মুসলমানদের সম্মান বা সেবা করা, ৫. দাওয়াত বা নিজের বাসগৃহের বাইরে দলবদ্ধ অবস্থায় আল্লাহ-রাসূলের বাণী প্রচার করা ৬. ইখলাস বা শুদ্ধ নিয়ত তথা ধর্মীয় কাজে নিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাবলীগের কাজ করা।[২১] তাবলীগ জামাত আন্দোলন সংবাদ প্রচারণা মাধ্যমকে পরিহার করে এবং সংবাদ মিডিয়ায় তাদের কোন প্রচারণা প্রেরণ করে না; এতদসত্ত্বেও এটা মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী নাহদাহ আন্দোলনের প্লাটফরম। এ আন্দোলন প্রমাণ করে যে ইসলামী পুনর্জাগরণের বীজ ইসলামের ভিতরেই অন্তর্নিহিত আছে।

তাবলীগ জামাত নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার করার উপর বিশেষ জোর দেন এবং সমাজ-রাষ্ট্রীক গুরুত্বপূর্ণ কোন রাজনৈতিক কাজে নিজেদের সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরা অবশ্য ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তবে মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম রাজনীতিকে অগ্রাধিকার হিসাবে স্বীকার করেন না। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা শুদ্ধরূপ ইসলামকে বিকৃত করবে এবং জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবে বলে তারা মনে করেন।[২২] তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী মর্মবাণীর প্রকৃত উপলব্ধির পূর্বেই ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হলে মুসলমানদের ঈমান আকিদার দুর্বলতার কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই 'রাজনীতি পরিহার'? ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ বা ভিত্তি বলে তারা মনে করেন। ইসলামের বৈরী শক্তির মোকাবেলা, তাদের মতে, ইসলামী বিশুদ্ধ তাবলীগের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে, ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের বাস্তব জীবনে অনুশীলন করতে হবে, আল্লাহর সাথে ভয় ও ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং শেষ পদক্ষেপ হিসাবে হিজরত ও জিহাদের পন্থা অবলম্বন করতে হবে।[২৩]

তাবলীগ জামাত আন্দোলনের সফলতার পরিমাণগত মান নির্ণয় দুরূহকর্ম। পৃথিবীর ২৪টি দেশে তাবলীগ জামাত আন্দোলনের কাজ চলছে। বিভিন্ন দেশে তাবলীগ জামাতের বার্ষিক সম্মেলনে সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। এ আন্দোলন বহু বুদ্ধিজীবীকেও তাবলীগ জামাতে সামিল করতে পেরেছে। বৎসরে একবার সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ তবলিগ জামাতের আমল আকিদায় বিশ্বাসী মুসলমানগণ বাংলাদেশে একত্রিত হন যাকে বলা হয় "বিশ্ব ইসতেমা"। এ সম্মেলন তিনদিন চলে?

জামাত-ই-ইসলামী

১৯৪১ সালে পাকিস্তানের লাহোরে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী জামাত-ই-ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা রাজনৈতিক দল হিসাবে নয় বরং একটি আদর্শিক আন্দোলন হিসাবে জন্মলাভ করে। ইসলামের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকের উপর

সাইয়েদ মওদূদীর বিস্তৃত ও সুগভীর জ্ঞান ও দখল রয়েছে বলে পাকিস্তানে তার ব্যাপক স্বীকৃতি রয়েছে। জামাতে ইসলামী নামে গঠিত দলটির একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে এবং এ দলের একনিষ্ঠ মনোযোগ ও অঙ্গীকার রয়েছে এবং এ দল একনিষ্ঠ মনোযোগ ও অঙ্গিকারের সাথে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।'[২৪] মওদূদীর মতে ইসলাম হচ্ছে একটি সর্বাত্মক বিশ্বজনীন জীবন বিধান, এটা একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা, জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর এতে রয়েছে। এর মৌলিক কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আল্লাহর সর্বপ্লাবী সার্বভৌমত্বের ঐক্য। ইসলামের জীবন ব্যবস্থা শরীয়াহ নামে অভিহিত, যা গভীর ঈমানের উপর সংস্থাপিত। এ ভিত্তির উপরই ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

মওদূদীর মতে আদর্শ ইসলামী ব্যবস্থা গঠিত হতে পারে একমাত্র এমন লোক সমষ্টির সাহায্যে যারা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুর আনুগত্য হতে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে; এরূপ সমাজ-রাষ্ট্র হবে ধর্মীয়গণতান্ত্রিক' এবং এর নাগরিকগণ হবে চিরুনীর ফলার মত সমান। মুসলমানদের পরিচয় হচ্ছে 'উম্মাহ ওয়াসাহ' (ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যমূলক সমাজ) এবং তাই তারা 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা' দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর মতে কুরআন শুধুমাত্র খানকাহ, মঠ ও বিদ্যালয়ে চর্চার জন্য কোন তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় হেয়ালীপূর্ণ পুস্তক নয় বরং এটি হচ্ছে সক্রিয় আন্দোলনের নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব।[২৫] ফলে ইসলাম হচ্ছে বিপ্লবী সংগ্রাম ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার (জিহাদ) ধর্ম, যার লক্ষ্য হচ্ছে সকল মিথ্যাদেবতাদের সকল ভাবমূর্তি চূর্ণ করে ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী বিপ্লবের সংজ্ঞা নির্ণয়ে মওদূদী রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিবর্তনের কথা বলেছেন, যে রাষ্ট্রযন্ত্র- মিথ্যা ভাবমূর্তি, বিকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

এ উদ্দেশ্যে সাইয়েদ মওদূদী জামাত-ই-ইসলামী গঠন করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কর্মপদ্ধতি দলের মৌলিক নীতিমালা ও কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথমেই আল্লাহর আপোষহীন সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে সর্বাত্মক বিপ্লবী কাজে ঝাপিয়ে পড়তে হবে এবং সঠিক আঙ্গিকে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও অনুশাসন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত যারা এ আহ্বানে সাড়া দেবেন তাদের এক প্লাটফর্মে সংগঠিত করে তাদের নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য একটি সুসমন্বিত পরিকল্পনা ও প্রোগ্রাম রচনা করতে হবে। তৃতীয়ত মুসলিম সম্প্রদায়ের সামষ্টিক জীবনকে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্জীবিত করার জন্য একটি সর্বপ্লাবী আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। সর্বশেষে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই বিপ্লবী আন্দোলনের মতে শাসন ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা ছাড়া কোন বিকল্প পন্থা নেই, কেন না রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া যে ধর্মপরায়ণ ব্যবস্থার কথা ইসলামে বর্ণিত রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হয় আল্লাহর ঐশী নির্দেশনা মোতাবেক। তাই প্রকাশ্যে ও শান্তিপূর্ণ

পদ্ধতিতে, আইন ও সংবিধানের কাঠামোর মধ্য থেকে এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

"যে সব আইনের বিরুদ্ধে আমি সারা জীবন লড়াই করেছি সে সব আইনও আমি কখনো ভঙ্গ করিনি। আমি আইনসঙ্গত ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে তা পরিবর্তন করতে চেয়েছি এবং কখনো আইন অমান্যের পন্থা অবলম্বন করিনি।"[২৬] (মাওলানা মওদূদী)

স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে জামাত সদস্য সংগ্রহ করে। ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে জামাত নতুন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জন সদস্য নিয়ে শুরু করে ১৯৭৮ সালে জামাতের রোকন বা সক্রিয় সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৫০০ জন, যার সাথে রয়েছে পাকিস্তানের প্রায় ৫ লক্ষ সহযোগী সদস্য। চারটি দেশে এর সহযোগী সংগঠন রয়েছে। জামাত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে যেখান হতে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সংগঠন ৩০০ এর অধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ ৫০টি স্থায়ী হাসপাতাল ও ১১টি অস্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে সাইয়েদ মওদূদী লক্ষ লক্ষ মানুষের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছেন, যাদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অন্যতম। জিয়াউল হক সরকার জামাতের বহু শীর্ষ নেতার পরামর্শ ও সাহায্যে অনেক ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আরো কিছু ইসলামী নীতিমালা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন।

ইরানী বিপ্লব

কেবলমাত্র ইরানী ইতিহাসের গভীর শিকড় অনুসন্ধান ও ইসলামের ভিতর ইতিহাসের মর্মবাণীর উপলব্ধির মাধ্যমেই ইরানী বিপ্লবকে অনুধাবন করা সম্ভব। এ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।[২৭] ইরানী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ মুসাভী খোমেনী। তিনি আধ্যাত্মবাদী শিক্ষক হিসাবে প্রথমে খ্যাতি লাভ করেন। আলগার সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, 'ইমাম খোমেনীর জীবন নির্দেশ করে যে ইসলামী বিপ্লব আবশ্যিকভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ হতে সংঘটিত হয়।'[২৮] ইমাম খোমেনীর মতে ইসলাম সকল কাজের নির্দেশনা ও মূল্যবোধ ঠিক করে দিয়েছে। ইসলামী আইন হচ্ছে বিশ্বজনীন, অপরিবর্তনীয় এবং তাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেহেতু ইমামগণ ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী নবী করিম (সা) কর্তৃক নিযুক্ত হন, তাই ইমামদের অনুসারীদের জন্য ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক।[২৯] শেষ ইমামের গায়েরে থাকা অবস্থায় (গায়েবাহ), ঐশী বিধান অনুযায়ী ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ শাসনকার্য পরিচালনা করবেন; 'ফকিহরাই হচ্ছেন প্রকৃত শাসক।'[৩০]

খোমেনী খোলাফায়ে রাশেদার সময়কার মদীনার যুগ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহর জামাতা আলীর খিলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে শির্ক (বহুত্ববাদ)

অর্থনৈতিক দমন ও শোষণের মাধ্যমে সমাজে প্রবেশ করে। ইরানে আলীপন্থী ধর্মানুসারীরা সাফায়ী শাসনকর্তাদের বিরোধিতা করেন, যে শাসকবৃন্দ ধর্মকে কলুষিত করেছিল, ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষা করত এবং সামাজিক বৈষম্যকে বৈধতা দান করত। শাহের রাজতন্ত্রের যে সমালোচনা খোমেনী করেন তা ছিল প্রধানত ইরানে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য কেন্দ্রিক। তিনি জনগণকে পবিত্র জিহাদে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানান :

ইসলাম সাহসী ব্যক্তি সমষ্টির ধর্ম যারা সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইহা তাদের ধর্ম যারা মুক্তি ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এটা তাদের ধর্ম যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।'[৩১]

জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা' করা এমন বৈষম্যহীন সমাজ যেখানে প্রত্যেক মানুষের পরিশীলিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। জিহাদের জন্য ইমাম খোমেনী যে পথ, পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা হলো: ১. পাহলভী রাজতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিরোধিতা, ২. তিনি শাহের সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ক্রীড়নক হিসাবে চিহ্নিত করেন। ৩. তিনি খণ্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন সংস্কার ধর্মী পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনি ধর্মীয় ফরমান ও ভাষণের মাধ্যমে জনগণকে শাহের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করেন, এসব বক্তৃতার অনেকগুলো ছিল তাঁর নির্বাসিত জীবন কালের ও ক্যাসেটে ধারণকৃত, যা- 'ক্যাসেট বিপ্লব' শিরোনামটির জন্ম দেয়। তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'ইসলামী আইনের চলিষ্ণুতার বিষয়ে লিখুন ও পুস্তক প্রকাশ করুন, যাতে ইসলামের কল্যাণমুখী দিকগুলি জনগণ জানতে পারে। আপনাদের প্রচারণার ধরন ও পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আরো সমৃদ্ধশালী ও উন্নতকরণ... নিজেদের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখুন এবং জেনে রাখুন এ পবিত্র কাজটি আপনারা অবশ্যই সম্পাদন করতে পারবেন।'[৩২]

রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে খোমেনীর বাণী সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করে। তিনি দেশ-বিদেশের সকল নির্যাতীত মানুষ, শ্রমিক, বিত্তহীন ও সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা সোচ্চারভাবে ব্যক্ত করেন। যেভাবে ইরানের শাহের পতন ঘটান সম্ভব হয়েছিল তা ইসলামের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শক্তির পরিচয়বাহী। পাহলবী রাজতন্ত্র ইমামের নেতৃত্বে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। তিনি 'বেলায়েতে ফকীহ' ধারণা ও পদবী উপস্থাপন করেন, যার মর্যাদা ও ক্ষমতা সরকারের উর্ধে। ইমাম খোমেনীকে ইরান জাতি এ পদবীতে ভূষিত করে। ইমাম খোমেনীর মতে 'বেলায়েতে ফকীহ' কে ইরানী হতে হবে এমন শর্ত নেই, যদি তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক গৃহীত হন। জাতীয়তার উর্ধ্বে ইসলামী চেতনাকে স্থান দান ইরানী সংবিধানের একটি অনন্য ধারার সংযোজন, যার তুলনা অন্যকোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পাওয়া যাবেনা। ইরানে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও

ইরানী ইসলামী রিপাবলিকান রাষ্ট্র একটি অনন্য সাধারণ উদাহরণ, যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইরানের সীমারেখার বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩৩]

একটি তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত

ইরানের নাহদাহ আন্দোলনের প্রক্রিয়া ও বিজয়ের সাথে তুলনা করলে জামাত-ই-ইসলামী ও তাবলীগ আন্দোলনের অর্জন তাৎপর্যহীনতায় ম্লান হয়ে যায়। কারণগুলি সুস্পষ্ট। বিপ্লবের পথ রচনার জন্য সাইয়েদ মওদূদীর সামনে তেমন কোন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ভাবমূর্তি ছিল না। পক্ষান্তরে ইমাম খোমেনী উত্তরাধিকার সূত্রে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকদের ভাবধারা ও অস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার সাথে নিজের জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু সুন্নী মতবাদের বিপরীতে শিয়া মতবাদে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী ভাবধারা অন্তর্নিহিত রয়েছে। শিয়ারা ইমামবৃন্দ এবং তাদের মনোনীতদের কর্তৃত্বের সঠিক অধিকারী বলে মনে করেন। অন্যরা সবাই অবৈধ এবং তাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে বলে মনে করতেন। এখানেই মূল বিষয়টি নিহিত: 'সুন্নী দেশসমূহের মুসলমানরা শাসকদের মান্য করায় বিশ্বাস করে, পক্ষান্তরে শিয়ারা সব সময় বিদ্রোহ-বিপ্লবে বিশ্বাস করে- কখনো কখনো তারা বিদ্রোহ করতে পেরেছে আবার কখনো অবস্থার চাপে তারা নীরব থেকেছে।'[৩৪] পরিশেষে সাইয়েদ মওদূদীর প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের ইসলামের পরিধির মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিলেন। ইরানে ড: আলী শরীয়তি এ কাজটি সফলতার সাথে সম্পাদন করেছিলেন। উলেমা সম্প্রদায়ের অর্থপূর্ণ অবদানের অনুপস্থিতির কারণে পাকিস্তানে সাধারণ জনগণের মধ্যে কোন জাগরণ সৃষ্টি হয়নি এবং এমতাবস্থায় জাতীয় নির্বাচনে জামাত জনসমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। ইরানের ক্ষেত্রে উলেমাবৃন্দ ইমাম খোমেনীর চারপাশে জনগণকে সমবেত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন; তাছাড়া ইমাম খোমেনীও ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন আলেম। এভাবে কোন সংযোগহীনতা না থাকায়, ইরানে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

উপসংহার

বিশ্বব্যাপী মুসলিম পুনর্জাগরণের যে ধারাক্রম চলছে তাকে মৌলবাদ, ইসলামী পুনরুত্থান, রেনেঁসা ও অন্যান্য নানা নামে অভিহিত করা হচ্ছে। পশ্চিমে এই শব্দও পরিভাষার উদ্ভব বিধায়, এগুলি একদেশদর্শীতা, ভয় ও আবেগের জন্ম দিচ্ছে এবং এ শব্দগুলি অপপ্রয়োগ মাত্র। মুসলিম পুনর্জাগরণের এই ধারাকে আরবী শব্দে বা ইসলামী নাহদাহ পুনর্জাগরণ নামে অভিহিত করা অধিক যুক্তিসঙ্গত, কেননা বাস্তবতার নীরিখে মুসলিম অভিজ্ঞতা একে বাস্তব যৌক্তিকতা প্রদান করেছে (নাহাদাত অর্থ শিশুর মাঝে সুপ্ত সম্ভাবনা)।

ইসলামী প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নাহাদাত আন্দোলনের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য কি এ প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ্য জনসাধারণের উপর ইসলামের প্রভাব বিপুল। মুসলমানগণ নিজেদেরকে ন্যায়পরায়ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের সদস্য হিসাবে মনে করে। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ এরূপ দু'টি পৃথক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ইসলাম স্বীকার করে না। চার্চের সাথে রাষ্ট্রের বিভেদকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের ভূমিকা রয়েছে বলে মুসলমানরা মনে করে। আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষিত মুসলমানরা যেখানেই শাসন ক্ষমতা পাবে সেখানেই তারা অর্পিত দায়িত্ব হিসাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করবে। মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীরা এ জিহাদ পরিচালনা করে গৌরবময় মুসলিম সভ্যতার পত্তন করেছিলেন। মুসলিমরা সে সভ্যতার জন্য সব সময়ে গর্বিত। জিহাদ, আশাবাদ ও সাফল্য হচ্ছে নাহদাহের চলমান প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি। এই উপাদান এবং প্রতি শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের আগমন সম্পর্কে নবী করিম (সা) এর ভবিষ্যৎবাণী মুসলমানদের বিশুদ্ধ ইসলামের উত্থানের জন্য সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। *নাহদাহ* আন্দোলনকে তাই শুধুমাত্র ইসলামের কাঠামোর ভিতর থেকেই বোঝা সম্ভব। বিশেষ ধরনের সামাজিক অবস্থা ও বিশেষ রাজনৈতিক চাপ অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে এই আন্দোলনকে গতিশীল ও জোরদার করেছে।

নাহদাহ আন্দোলনের নানা প্রকরণ রয়েছে। কিছু আন্দোলন শুধু নৈতিক সংস্কারের সাথে জড়িত, কিছু আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক লক্ষ্য রয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপের ভিতর আবার শ্রেণী বিভাজনমূলক ধারা রয়েছে, যেগুলোর স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ উপলব্ধি করতে হবে। এ সবগুলো আন্দোলনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, যা হচ্ছে একটি সুস্থ মানবিক বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ করা। তবে লক্ষ্য সাধনের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ফলাফলের দিক থেকে তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। ইরানী অভিজ্ঞতা হতে বলা যায় সাফল্য আসে বহু ত্যাগ, রক্তপাত, ঘাম, সংকল্প ও আল্লাহর উপর গভীর আস্থা থেকে। এটি রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতির এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, বুদ্ধিজীবী ও গণমানুষের শক্তির মনোগত সফল ঐক্য এবং একটি মনোভঙ্গি ও মনস্তত্ব যা প্রতিরোধ ও শাহাদাত বরণকে উচ্চতম মর্যাদা প্রদান করে।

পরিভাষা

'আদালাহ্' (ধাতুগত রূপ 'আদল') নৈতিক সঠিকতা, ন্যায়ানুগভাবে কাজ করা, প্রত্যেককে তার ন্যায্য হিস্যা প্রদান করা। 'আদালাহ্' পরিভাষাটি 'সুবিচার' শব্দটি হতে অনেক বেশী ব্যাপক এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। একজন মানুষের নিজের প্রতি বা অন্যান্য সকলের প্রতি যা কিছু করা কর্তব্য তা 'আদালাহ্' এর পরিধির মধ্যে পড়ে।

'আদিল্লাহ' (একবচন দালিল) প্রমাণ, ঐশীগ্রন্থ বা প্রতিষ্ঠিত আইন হতে আহরিত সাক্ষ্যপ্রমাণ বা বিধি।

'আদল' : চরিত্রের সঠিকতা, সুবিচার, আল্লাহর আনুগত্য অনুসারে কাজ করা।

'আহদ' : প্রামাণিক পদমর্যাদা, চুক্তি, অঙ্গীকার।

'আহকাম' (একবচন হুকুম) : আইন, বিধিবিধান; ঐশী নির্দেশনা সম্পর্কিত; সীমিত অর্থে কতিপয় আইনগত রায়।

'আহকাম কুল্লিয়াহ ওয়া ফারিয়াহ' : সাধারণ বা সম্পূরক ধরনের শরীয়াহর অনুশাসন, কোনটি একাধিক বিষয় আওতাভুক্ত করে, আবার কোনটির সীমিত অর্থ রয়েছে।

'আহল আল-হাল ওয়াল আক্দ' যা বন্ধন কঠোর ও শিথিল করে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ, মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ও ব্যক্তিবর্গ যারা শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করে অথবা পদচ্যুত করে (খিলাফত)।

'আহল আল কিতাব' : কিতাবী লোকগণ; বিশেষভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বোঝায়, তবে জরোস্ত্রিয়ানদের বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।

'আহল আল শুরা' আলাপ আলোচনা বা পরামর্শে অংশগ্রহণ করা, পরামর্শ সভার সদস্যবৃন্দ (পার্লামেন্ট বা আইনসভা)।

'আহল হাদি আল সাহিফাহ' : চুক্তিবদ্ধ লোকসমষ্টি।

'আলী' : সমুন্নত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

'আলীম' (বহুবচন উলমা) : পণ্ডিত, জ্ঞানী, যিনি ধর্ম বিজ্ঞানে সবিশেষ জ্ঞান রাখেন।

'আমানাহ' : আমানত, আমানতদারী, আস্থা, নির্ভরযোগ্যতা। ইহা শুধুমাত্র লোকসমষ্টির মধ্যে আচরণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না বরং আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারও বোঝায় যে তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি "খিলাফতের' দায়িত্ব একটি 'আমানত'।

'আমীর' : আদেশদাতা, নেতা।

'আমীর আল মুমিনীন' : ঈমানদারদের নেতা, দ্বিতীয় খলিফা ওমর এই উপাধি প্রবর্তন

করেন এবং পরবর্তীতে খলিফা পদবীর জন্য এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

'আমর বি আল-মারুফ ওয়া নেহী আন-আল মুনকার' সত্যের উদ্বোধন ও মিথ্যার প্রতিরোধ করা।

'আনসার' : সাহায্যকারী, অনুসারী, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী; উম্মতের প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কার মোহাজের মুসলমানদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসারী যে সব মদীনাবাসীরা যোগ দেন।

'আসাবীয়াহ' : দলগত আনুগত্য, সম্প্রদায়ের স্বার্থ, সামাজিক দলের সংহতি প্রকাশ।

'আওয়ান' : সাহায্যকারী, সহায়তাপ্রদানকারী, সহযোগী।

'আওলিয়া' : সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, সহায়তাকারী।

'আয়াত' : সৃষ্ট মহাবিশ্বে আল্লাহর চিহ্নসমূহ; কুরআনের পংতি।

'আয়াত আল আহকাম' : কুরআনের প্রত্যাদিষ্ট আয়াত যাতে আইনগত মূল্যবোধ বিধৃত আছে; অথবা কুরআনের আয়াত হতে অনুসৃত বিধান।

'আইন আল-ইয়াকীন' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি' পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নিশ্চয়তার সাথে প্রাপ্ত জ্ঞান।

'বায়াত' চুক্তি, সমঝোতার ব্যবস্থা, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, কোন শাসক বিশেষ করে খলিফার কাছে আনুগত্যের শপথ করা।

'বায়াত আল আম' : সর্বসাধারণ কর্তৃক আনুগত্যের শপথ।

'বায়াত আল খাস' : জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক আনুগত্যের শপথ।

'বিদাত' বিশ্বাস বা কার্যক্ষেত্রে নতুন কিছুর উদ্ভাবন, রাসূলুল্লাহ (সা) বা খোলাফায়ে রাশেদার সময় যার কোন প্রচলন ছিলনা, এমতাবস্থায় কুরআন, সুন্নার বিরোধী।

'দারুল হরব' : 'যুদ্ধের আবাসস্থল', এমন ভূ-খণ্ড যা ইসলামের শত্রুদের অধীনে রয়েছে।

'দারুল ইসলাম' 'শান্তির আবাসস্থল' এমন ভূ-খণ্ড যেখানে শরীয়াহর অনুশাসন জারী রয়েছে।

'জরুরীয়াত' এমন সব দ্রব্যসামগ্রী যা ছাড়া জীবনধারণ করা সম্ভব নয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের সাধারণ সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা বুঝায়।

'দাওয়াহ' : আহ্বান, আবেদন, আমন্ত্রণ; অমুসলিমদেরকে মুসলমান হবার জন্য বা যে সব মুসলমান সত্যপথ হতে সরে গিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য দাওয়াতী বা মিশনারী কার্য।

'দাওলাই' : রাষ্ট্র, সরকার বা রাজনীতির ক্ষেত্র

'দায়া' : অপচয়, কারো সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করা যার কোন নৈতিক বিনিময় পাওয়া যাবে না।

'জিকির' : আল্লাহর স্মরণ; বিভিন্ন সুফী তরীকার আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার মূল বিষয়।

'দ্বীন' : বৃহত্তর অর্থে ধর্ম, যা মানবজীবনের সকল অঙ্গন পরিবেষ্টন করে আছে।

'আদ-দ্বীন লিল্লাহ ওয়া আল ওয়াতান লি- জামী' ধর্ম আল্লাহর জন্য এবং মাতৃভূমি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য।

'দিওয়ান' প্রশাসনিক কার্যালয়, ব্যুরো; সরকারী রাজস্বের হিসাব বহি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

'দিওয়ান আল মুজলীম' 'দিওয়ান আল নজর ফি আল- মুজালীম' এর সংক্ষিপ্ত রূপ

'দিওয়ান আল-নজর ফি আল-মুজালিম' যে সংস্থা ঐতিহাসিকভাবে শাসন বিভাগের প্রশাসনিক কার্যকলাপের উপর তত্ত্বাবধানমূলক নজরদারী করে এসেছে।

'দিয়াহ' : নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে প্রদত্ত রক্তপণ মূল্য।

'দুলাহ' : সময় সময় পরিবর্তন করা, সার্কিট তৈরী করা, বিকল্প ব্যবস্থা করা।

'ফালাসিফাহ' দার্শনিকবৃন্দ; মুসলিম পণ্ডিতবর্গ যারা গ্রীক ঐতিহ্য অনুযায়ী দর্শন চর্চা করতেন।

'ফা-কাদ কাফারু বি আল্লাহ': যারা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে।

'ফকিহ' (বহুবচন : ফুকাহা) : ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

'ফারাইদ' (একবচন: ফরজ) আল্লাহ মুসলমানদের উপর যেসব কার্যাবলী বাধ্যতামূলকভাবে অবশ্য করণীয় করেছেন।

'ফরজ' (বহুবচন ফারাইদ) পাঁচওয়াক্ত নামাজের মত বাধ্যতামূলকভাবে অবশ্য করণীয় কার্যাদি; যা পালন না করলে শাস্তি পেতে হবে, পালন করার ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হবে।

'ফরজে আইন' : ব্যক্তির উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

'ফরজে কিফায়াহ' সমাজের উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি তা পালন করলে, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি কর্তব্যকাজটি হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

'ফাতওয়া' (বহুবচন: ফাতাওয়া) কোন আইনগত বিষয়ের উপর কোন আইনবিশারদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত। যে ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করেন তিনি 'মুফতী' নামে অভিহিত।

'ফিকাহ' : শাব্দিক অর্থে উপলব্ধি করা, বুঝা জ্ঞান এবং বিশেষ অর্থে ইসলামী আইনশাস্ত্র বিজ্ঞানকে বুঝায়।

'ফুকাহা' (একবচন ফকিহ্) আইনশাস্ত্রবিদগণ বা ফকিহ্গণ যারা আইনের মর্মার্থ উপলব্ধিতে বিশেষজ্ঞ।

'হাদ্' (বহুবচন: হুদুদ) সীমারেখা, প্রান্তরেখা, নিষিদ্ধ যে সব কার্যকলাপের জন্য কুরআনে শাস্তি বিধান করা হয়েছে।

'হাদীস' : নবী করিম মোহাম্মদ (সা) এর সুন্নাহ তথা তার উক্তি, বক্তব্য, কার্যাবলী ও সাহাবীদের কারো কাজে মৌন সম্মতি।

'হাফিজ' : অভিভাবক, সংরক্ষণকারী; যিনি কুরআন হিফজ বা মুখস্থ্ করেছেন।

'হাজীয়াহ' ঐসব দ্রব্য সামগ্রী যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে অত্যাবশ্যক নয়।

'হজ' : মক্কাশরীফে তীর্থযাত্রা।

'হালাল' : আইন সঙ্গত; খাদ্য ও কার্যকলাপের বিষয়ে যেগুলি অনুমোদিত।

'হক' : সত্য।

'হক আল ইবাদ' ব্যক্তির নিজের প্রতি অন্যান্য মানুষের প্রতি ও অন্যান্য জীবজন্তু ও প্রাণীর প্রতি আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

'হাক্কুল্লাহ' : আল্লাহর প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

'হক্কুল ইয়াকীন' : স্বজ্ঞা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত পূর্ণ নিশ্চয়তামূলক জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জাত বা বিচারবুদ্ধিজাত কোন ভ্রান্তি থাকতে পারে না এমন নির্ভুল সত্যজ্ঞান।

'হারাম' বেআইনী, নিষিদ্ধ, হালালের বিপরীত; পবিত্র অর্থেও শব্দটি ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়।

'হিজাব' বোরখা, চাদর; মুসলিম মহিলাদের দেহ আবৃত করার জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদন।

'হিজরা বা হিজরত' : একস্থান হতে অন্য স্থানে গমন; বিশেষ করে মহানবী (সা.) কর্তৃক ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদীনা গমন। এই ঘটনাকাল হতে ইসলামী বর্ষপঞ্জী গণনা করা হয়।

'হিসবাহ' সত্যকে উৎসাহিতকরণ ও মিথ্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত দায়িত্ব; বাজার ও অন্যান্য স্থানের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারী কার্যালয়।

'হিযবুল্লাহ' : আল্লাহর দল; যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুসরণ ও কার্যকর করে।

'হুদুদ' (বহু বচন: হাদ) : কুরআন ও সুন্নায় সে সব অপরাধের শাস্তি বর্ণিত রয়েছে।

'হুদুল-আল-শরীয়াহ' : ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি।

'হুকুম' (বহুবচন: আহকাম) আইন, রায়, কর্তৃত্ব; কাজীর রায়, বিচারের রায়, ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা।

'আল-হুরমাহ' : পবিত্রতা, পংকিলতামুক্ত, মহা পবিত্র ও অলংঘনীয়তা।

'আল-হুররিয়াহ' : মুক্তি, স্বাধীনতা।

'ইবাদাহ' (বহুবচন: ইবাদত) উপাসনা, আরাধনা, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন; আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করা; চিন্তা ও কর্মে জীবনের প্রতি পদক্ষেপ আল্লাহর আদেশ মেনে চলা।

'ইজমা' ঐক্যমত্য; ইসলামী আইনের চারটি উৎসের একটি; কোন বিষয়ের উপর উলেমাবৃন্দ বা জনসাধারণের সর্ববাদিসম্মত একমত পোষণ করা।

'ইজতিহাদ' : আইনগত বৈধতার প্রশ্নে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগ; শরীয়াহর বিধি বিধানের প্রশ্নে ব্যাখ্যা প্রদান; কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা। যে যোগ্য ব্যক্তি 'ইজতিহাদ' পরিচালনা করেন তাকে 'মুজতাহিদ' বলা হয়।

'ইখলাস' : আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা।

'ইকরাম আল মুসলীম' : মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

'ইলাহ' দেবতা, ঈশ্বর (?)

'ইল্লাহ' : বিশেষ কার্য বা রায়ের অন্তর্নিহিত কারণ।

'ইলম' : জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা; কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা বিষয়ক জ্ঞান।

'ইলম-আল-কালাম': দ্বান্দ্বিক বা পদ্ধতিসুসমন্বিত ধর্মতত্ত্ব; ইসলামের একপ্রকার 'ধর্ম বিজ্ঞান'।

'ইলম-আল-ইয়াকীন' : যুক্তি, বুদ্ধি বা অবরোহগত জ্ঞান।

'ইমাম' নেতা, প্রধান, নাজাম পরিচালনাকারী; খলিফার সমার্থক শব্দ।

'ইমামহ' : ইমামত, খিলাফতের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

'ঈমান' বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ, নৈতিক মূল্যবোধের উৎস ইসলামে যা সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত।

'ইন্না ইয়াহুদ বনি আউফউম্মাহ মা'আ আল-মুমিনিন' বিশ্বাসীদের সাথে বনি আউফ গোত্রের ইহুদীরা একই উম্মতভুক্ত।

'ইসতিহসান' সম্মতি, অনুমোদন, আইনগত পছন্দ, কোন কিছুকে ভালো মনে করা, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতি রেখে আইনগত কোন সমস্যার ক্ষেত্রে বিবেক বুদ্ধি মতে সমাধান প্রদান করা, আইনগত সমাধানে পৌছার পদ্ধতি।

'ইসতিসহাব' কোন আইনগত নীতি বর্তমানে বিদ্যমান নই বা পরিবর্তিত হয়েছে এ মর্মে প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ আইনগত নীতির কার্যকারিতা বহাল থাকা।

'ইসতিসলাহ' জনস্বার্থ সম্পর্কিত; জনগণের কল্যাণ কামনা, আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত।

'ইজাহ' : আনুগত্য।

'জাহিল' : অজ্ঞ, ঐশী প্রত্যাদেশে বর্ণিত সুসভ্য জীবনে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে যে অক্ষম।

'জাহিলিয়াহ' : অজ্ঞানতার যুগ, প্রাক-ইসলামিক আরব ইতিহাসের যুগ, বর্তমান মুসলিম সমাজের দুর্নীতিপরায়ণ বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

'জামাহ' দল, সম্প্রদায়, উম্মাহর সমার্থক শব্দ, কিন্তু আরো সংকীর্ণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

'জিহাদ' : প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টা, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ, যিনি সক্রিয়ভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকেন তাকে

'মুজাহিদ' বলা হয়।

'জিহাদ ফি সাবিল আল্লাহ' : আল্লাহর পথে নিজ দায়িত্বপালনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা; নিজের ভিতর ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্য, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা।

'কাবাহ' : শাব্দিক অর্থে 'ঘনক্ষেত্র', মক্কায় অবস্থিত ইসলামের প্রধান পবিত্র স্থান।

'কাফাহ' : যোগ্যতা, দক্ষতা, উপযুক্ততা।

'কাফির' : অবিশ্বাসী, নাস্তিক, অকৃতজ্ঞ, যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী বিশ্বাস বা গ্রহণ করে না।

'কালাম' : বিশেষভাবে ধর্মীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতা ভাষণ।

'খলিফাহ' : যিনি পরে আসেন, উত্তরসুরী, বিশেষকারে নবী করিম (সা) এর প্রতিনিধি।

'খিলাফত' : উত্তরাধিকার, দুনিয়ার বুকে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধিত্ব করার পদ, ইমামত শব্দের সমার্থক।

'খিলাফত আল নবুওয়াহ' নবী করিম (সা) এর প্রতিনিধিত্ব, যা দ্বারা মদীনার যুগের খিলাফতকে বুঝায়।

'খাওয়ারীজ' : যারা বাহির হয়ে গেছে, ভিন্নমত পোষণকারী; সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় যারা চতুর্থ খলিফা আলীর দলত্যাগ করে এবং আলাদা দল গঠন করে।

'খোলাফায়ে রাশেদীন' : সঠিক পথে পরিচালিত উত্তরসূরীগণ, এ পরিভাষাটি প্রথম চার খলিফা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যারা নবী করিম (সা) এর সাহাবী ছিলেন এবং মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের শাসনকাল সর্বোচ্চ আদর্শ ও অনুসরণীয় বলে বিবেচিত।

'কিতাব' : লিখা, পুস্তক, গ্রন্থ।

'কুফর' : অবিশ্বাস, ধর্মদ্রোহিতা, অকৃতজ্ঞতা, নাস্তিকতা।

'মাজহাব' কার্যপ্রণালী, ইসলামী আইনশাস্ত্রের পদ্ধতি, চারটি সুন্নী তরিকা সম্পর্কে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়; হানবলী, মালেকা, হানাফী, সাফীঈ।

'মাহদী' : পথ প্রদর্শক, নেতা; সত্য, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

'মাহদীয়াত' : মাহদী সম্পর্কিত, মাহদীবাদ।

'মজলিস' : পরামর্শ সভা যেখানে জনস্বার্থমূলক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়।

'মজলিস আল বায়াত' : জাতীয় সংসদ

'মজলিসে শুরা' পরামর্শ সভা।

'মাকরুহ' অপ্রীতিকর, যেসব কাজ করতে মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে; যেসব কাজ না করলে পূণ্য অর্জিত হবে, কিন্তু করলে শাস্তি প্রদান করা হবেনা।

'মানদুব' : সুপারিশকৃত; যে সব কাজ করার জন্য মুসলমানদের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং যে সব কাজ করলে পুণ্য অর্জিত হবে, তবে না করলে শাস্তি প্রদান করা হবে না।

'মারিফাত' : আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা উপলব্ধি

'মারুফাত' : ভালো, উপকারী, উপযুক্ত; ঐশীপ্রত্যাদেশ বা যুক্তিবুদ্ধি যে সব পূণ্য কাজ করতে মুসলমানদের উৎসাহিত করেছে।

'মাওয়ালী' : পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু।

'মুজালিম' : মন্দকাজ, ভুলকাজ, বৈষম্য, অবিচারমূলক কাজ।

'মিজান' : দাড়িপাল্লা, ওজন, সমতা, সুষমতা।

'মুয়াখাত' : মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

'মুয়ামালাত' : অন্যের প্রতি আচরণ; ইসলামী আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক লেন-দেন।

'মুবাহ' : অনুমোদিত; যে কাজের জন্য মুসলমানগণ পুণ্য বা শাস্তি কিছু প্রাপ্ত হবে না।

'মুবিন' : সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল, স্থানকালের পরিসীমায় সমগ্র মানবতার জন্য বুদ্ধিগ্রাহ্য।

'মুফতী' : আইনশাস্ত্র বিশারদ; কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত।

'মুহাররামাত' নিষিদ্ধ শাস্তিযোগ্য; ক্ষেত্র বিশেষে 'পবিত্র' অর্থে নিষিদ্ধ মর্মেও পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

'মুহাসাবাহ' : জবাবদিহিতা; বিবেকের পরীক্ষা।

'মুহতাসীব' 'হিসবাহ' এর দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা।

'মুজাদ্দিদ' : ইসলামের সংস্কারক; কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনের বিচ্যুতি সংশোধন করে যিনি ইসলামকে পুনর্জীবন দান করেন।

'মুজাহিদ' : যিনি সক্রিয়ভাবে জিহাদে রত থাকেন।

'মুজতাহিদ' যিনি আইনগত প্রশ্নে প্রাজ্ঞ মতামত দিতে সক্ষম তথা 'ইজতিহাদ' পরিচালনা করেন।

'মুলক' : রাজত্ব, রাজকীয় মর্যাদা, শাসন, সরকার, অস্থায়ী কর্তৃত্ব।

'মুনকারাত' ঐশী প্রত্যাদেশ বা যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা যে সব পাপকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

'মুসাওয়াহ' : সমতা

'মুসেয়তীর' : বলপূর্বক কার্য সম্পাদনকারী; কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর অন্যের মত চাপিয়ে দেয়া।

'মুশরিকুন' : বহুত্ববাদী; যারা আল্লাহর সহিত কাউকে শরিক করে। কুরআন অনুযায়ী ইহা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

'মুসতাখলাফ' : জিম্মাদার, অভিভাবক।

'মুতাজিলাহ' ধর্মতত্ত্ব চর্চার একটি প্রণালী; 'আলাদাভাবে দণ্ডায়মান হওয়া' শব্দ হতে পরিভাষাটি এসেছে।

'মুত্তাকী' (ধাতুগত রূপ: তাকওয়া) যে ব্যক্তি আল্লাহ, প্রকৃতি ও মানব সমাজের প্রতি ইসলামী দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতন।

'মুওয়াহ্হীদ' : তাওহীদে বিশ্বাসী; চিন্তায় ও কার্যে সর্বদা ঐশী একত্বে বিশ্বাসী।

'নাহদাহ' : পুনর্জাগরণ; শিশুর মাঝে সুপ্ত শক্তির জাগরণ, পরিভাষাটি ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।

'নাসব' : বংশানুক্রমিকতা, আত্মীয়তা।

'নিয়ত' ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা, অভিপ্রায়, নামাজের মত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কাজের পূর্বে অভিব্যক্তি ইচ্ছা বা এরাদা।

'কাজা' : কাজীর কার্য ও কার্যাবলী, বিচার বিভাগ, কাজী কর্তৃক প্রদত্ত রায়।

'কাজফ' অবমাননাকর অভিযোগ

'কাজী' কাজী; নিয়োজিত কিন্তু স্বাধীন ধর্মীয় কর্তৃত্ব যিনি শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার করেন।

'কাহর ওয়া ঘালাবাহ' : শক্তি ও সীমাবদ্ধতা।

'কানুন' : খলিফার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক আদেশ।

'কাসামাহ' : ভাগ, অংশ, হিস্যা।

'কাওয়াইদ' : সাধারণ নীতিমালা।

'কওম' গোত্র, লোকসমষ্টি, জাতি।

'কিবলাহ' : মক্কার দিক, যে দিকে মুখ করে মুসলমানগণ নামাজ আদায় করেন।

'কিসাস' : প্রতিশোধ গ্রহণ করা, তার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করা হয়েছে তজ্জন্য।

'কিস্ত্' : সুবিচার, ন্যায়বিচার।

'কিয়াস' : অবরোহী পদ্ধতিতে যুক্তি প্রয়োগ। ইহা শরীয়ার চতুর্থ উৎস। ইহা ইজতিহাদ পরিচালনার বিশেষ পদ্ধতি।

'রাসূল' : বাণী বাহক; সমগ্র মানবতার জন্য ঐশী বাণী বাহক নবী।

'রে' : বিশেষত আইনগত প্রশ্নে ব্যক্তিগত মতামত।

'রিবা' : ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ, ইসলামে রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ।

'রিবাত' মুসলিম দেশের সীমান্তে সেনাবাহিনী স্থাপনা বা দুর্গ; সুফী সম্প্রদায়ের নির্জনবাসের আশ্রয়স্থল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'রিসালত' : নবী মারফত বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত ঐশী প্রত্যাদেশ; নবুয়তের পদ।

'সালাফিয়াহ' : যোগ্য উত্তরসুরী।

'সালামাহ' : নিষ্কলুষতা, ত্রুটিহীনতা, চারিত্রিক সংহতি।

'সা'ব' : আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকসমষ্টি।

'শাহাদাত' : বিশ্বাসের অঙ্গীকার; আল্লাহর একত্ব ও মোহাম্মদ (সা) এর রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান করা; গভীর বিশ্বাসের সাথে কলেমা শাহাদাত উচ্চারণ একজনকে মুসলমানে পরিণত করে; অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রমাণ।

'শারা' : ইসলামী আইনের ঐশী উৎসের ভিত্তিতে আইন প্রয়োগ করা।

'শারী' : আইনসম্মত, বৈধ।

'শরীয়াহ' : শাব্দিক অর্থে পানির উৎসের দিকে গমনের পথ। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রণীত ইসলামী আইন বা আচরণ বিধি। ইহা ইসলামী ব্যবস্থার সমগ্রতা।

'শিয়া' : দল, উপদল, সম্প্রদায়; যারা আলী ও তাঁর অধ্বস্তন পুরুষদের সঠিক খলিফা বলে মনে করেন।

'শির্ক' : বহুত্ববাদ, মূর্তিপূজা; যারা আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করে।

'শুরা' পরামর্শ, আলাপ আলোচনা; একটি রাজনৈতিক নীতিমালা যেথায় জনগণ নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করবে; ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী নেতা জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা, পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শুরা পার্লামেন্ট (মজলিসে শুরা) এর সমার্থক।

'সুউবিয়াহ' : আরবদের অধিক সুবিধা প্রদানের সমর্থক একটি আন্দোলন।

'সিহাহ' ইমাম আল বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ এবং আল তিরমিজী কর্তৃক সংকলিত নবী করিম (সা.) হাদীসসমূহের ছয়টি প্রামাণিক গ্রন্থ।

'সিরাত' : জীবন চরিত।

'সিরাতুল মুস্তাকিম' : সঠিক পথ, প্রত্যাদিষ্ট পন্থা।

'সিয়াসাহ' কর্তৃত্ব; শাসক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রশাসনিক বিচার কার্য; সরকারী প্রশাসন, নীতি, রাজনীতি।

'সিয়াসাহ আদিলাহ' : ন্যায়পরায়ণ সরকার।

'সিয়াসাহ আকলিয়াহ' : যুক্তিভিত্তিক সরকার।

'সিয়াসাহ দ্বীনিয়াহ' ঐশী ব্যবস্থাপনা।

'সিয়ামাহ শরীয়াহ' : শরীয়ত ভিত্তিক ব্যবস্থা

'সুফী' : মুসলিম আধ্যাত্মবাদী বা মরমীবাদী; যিনি ইসলামী আধ্যাত্মবাদ চর্চা করেন।

'সুলতান' : ক্ষমতা, দুনিয়াবী শাসনকর্তা, একজন স্বাধীন শাসক।

'সুন্নাহ' : নবী করিম (সা.) এর উক্তি, কার্য, জীবনাচরণ বা সাহাবীদের কারো কার্যে মৌন সম্মতিকে সমন্বিতভাবে সুন্নাহ বলা হয়। নবী করিম (সা.) এর সুন্নাহ শরীয়তের অন্যতম উৎস।

'সুরা' : কুরআনের অধ্যায়।

'তাবলীগ' : প্রচার, ঘোষণা; দাওয়াহ' এর প্রতিশব্দ।

'তাগুত' মন্দশক্তি, সীমা লংঘনকারী অপশক্তি, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মিথ্যা দেবদেবী, খারাপ কাজের মন্ত্রণাদানকারী।

'তাহসিনিয়াত' সৌকর্যবৃদ্ধিকরণ, সুন্দর করা, কোন কিছুকে নিখুঁত করে চরম উৎকর্ষে পৌছান।

'তাজদীদ' : পুনর্জ্জীবন, পুনরুত্থান; প্রামাণিক ও আদি উৎস অনুসারে ইসলামী শিক্ষার পুনর্জ্জীবন। যিনি 'তাজদীদ' চর্চা করেন তাকে 'মুজাদ্দিদ' বলা হয়।

'তাকলীদ' : অন্ধ অনুকরণ, স্বাধীনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কোন ধর্মতত্ত্ববিদ বা আইনশাস্ত্রবিদ যে পদ্ধতি প্রদান করেছেন তা অনুসরণ করে চলা।

'তাকলীদ আল- ইমামাহ' শরীয়াহর কোন বিধানের বিষয়ে ইসলামী আইনজ্ঞগণের প্রদত্ত রায় অনুসরণ করা।

'তাকওয়া' ধর্মপরায়ণতা, খোদাভীতি; ইহা বিশ্বাস, ধর্মানুগতা, আনুগত্য ও আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের সমন্বয়; ইহা আল্লাহর নৈকট্য ও তাকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টাকেও বুঝায়।

'তাশরী' : আইন প্রণয়ন।

'তাওহীদ' আল্লাহর ঐশ্বরিক একত্বতা, যা কালেমা শাহাদাতের প্রথম অংশে ব্যক্ত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। ইহা ইসলামের সামগ্রিকতার নির্যাস।

'তাউইল' মূল গ্রন্থে যার অস্পষ্টতা বা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে তার প্রতীকি ব্যাখ্যা।

'তা'যীর' : নিরোধক; কাজী কর্তৃক প্রদত্ত বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন শাস্তি।

'তাযীরাত' : নিরোধসমূহ; বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন শাস্তিসমূহ।

'উখুওয়াহ' (ধাতুগত রূপ: আখ্ বা ভাই) : ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব।

'উলামা' (একবচন: আলেম) : মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ, পণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ববিদ; যে ব্যক্তিবর্গ শরীয়াহর জ্ঞানে পারদর্শী।

'উলুল-আমর' : শাসক, আদেশ, প্রদানকারী, আইন শাস্ত্রবিদ; যারা জ্ঞান।

'উমাম' (উম্মাহ'র বহুবচন) : সম্প্রদায় সমষ্টি, লোক সমষ্টি।

'উমারা' (আমীর' এর বহুবচন) : শাসকবৃন্দ, আদেশদাতাগণ।

'উম্মাহ' সম্প্রদায়, দল, লোকসমষ্টি; ভাষা, বর্ণ, জাতিসত্তা, গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ একই ও অভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, আইন, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সুসমন্বিত ও সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় বা জাতি।

'উম্মাহ মুসলিমাহ' : জাতিসত্তা, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে ঈমানদারদের দল বা গোষ্ঠি।

'উম্মাহ ওয়াহিদাহ' একক সম্প্রদায়। কুরআন ১০:১৯ আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে একটি মাত্র সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করেছে।

'উর্‌ফ' : সমাজের রীতিনীতি, রীতিনীতির ভিত্তিতে সাম্প্রতিক কালের আইন বা প্রথা।

'উরুবাহ' : আরব জাতীয়তাবাদ, আরবীয় চরিত্র।

'উসুল আল ফিকাহ' : আইনশাস্ত্র বিজ্ঞান।

'উসওয়াহ হাসানাহ' : অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র।

'ওয়াজিব' : হানাফী মতে বাধ্যতামূলক, তবে ফরজের চেয়ে নিম্নমাত্রায়।

'ওয়াজিবাত' (ওয়াজিব এর বহুবচন) : বাধ্যতামূলকসমূহ।

'ওয়াকিল' : কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি; বিরোধ, বিবাহ, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এক বা উভয় পক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

'ওয়াক্‌ফ' সমাজকল্যাণ বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য গঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

'ওয়ারা' খোদাভীতি, আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা, ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার

'ওয়াসাত' : মধ্যপন্থা।

'উইলাইয়াহ' : জনগণের কাজ, দক্ষতা, অধিক্ষেত্র, সরকারী কার্যালয়, কর্তৃত্ব।

'জাকাত' একজন মুসলমানের সম্পদ ও আয়ের একটি অংশ নির্দিষ্ট গরীব ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া। ইহা অন্যতম বাধ্যতামূলক এবাদত। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনসম্পদের পরিশুদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

'জিনা' : ব্যভিচার।

'জুলুম' : নিপীড়ন, নির্যাতন, অবিচার, কারো ন্যায্য পাওনা প্রদান না করা, 'আদালাহ' এর বিপরীত শব্দ। কুরআনে শির্ক' করাকে 'জুলুম' এবং অবিশ্বাসীদের জালিমরূপে অভিহিত করা হয়েছে (আল কাফিরুনা হুম আল-জালিমুন)।

পরিশিষ্ট-ক

একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. ইসলামী উম্মাহ্

আর্টিকেল ১

ক. সব মুসলমান মিলে একটি একক উম্মাহ্ গঠিত

খ. শরীয়াহ্ সকল আইনের উৎস।

আর্টিকেল ২

ইসলামী উম্মাহ্‌র মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকতে পারে এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

আর্টিকেল ৩

একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্র বা একাধিক রাষ্ট্রের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই রাষ্ট্র গঠন করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অন্য কোনভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

আর্টিকেল ৪

জনগণ ইমাম, তার পরিষদবর্গ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীর উপর নজর রাখবে এবং শরীয়াহ্‌র বিধান অনুযায়ী তাদের দায়ী করতে পারবে।

২. রাষ্ট্রের দায়িত্ব

আর্টিকেল ৫

পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা সমাজের ভিত্তি গঠন করে।

আর্টিকেল ৬

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎকাজের উদ্বোধন ও মন্দকাজকে প্রতিহত করতে হবে; যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করবেনা সে গুনাহগার হিসাবে পরিগণিত হবে।

আর্টিকেল ৭

পরিবার হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক একক। এর অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে দ্বীন এবং নৈতিকতা। রাষ্ট্র পরিবারকে সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে, মাতৃত্ব ও শিশুদের সংরক্ষণ করবে এবং এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

আর্টিকেল ৮

পরিবার ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র বিবাহ প্রথাকে উৎসাহিত করবে এবং তজ্জন্য বস্তুগত সহায়তা যথা বাসস্থান অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী সরবরাহ করবে। বৈবাহিক

জীবনকে সম্মানের চোখে দেখা হবে এবং এমন ইতিবাচক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হবে যাতে স্ত্রী স্বামীর একজন ভালো সহযোগী হতে পারে, সন্তানদের দেখাশুনা করতে পারে, এবং পরিবারের যত্ন নেয়ার বিষয়টিতে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারে।

আর্টিকেল ৯

উম্মাহ তথা প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিরাময়ের জন্য রাষ্ট্র বিনা খরচে নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে।

আর্টিকেল ১০

জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা ও সে মর্মে নির্দেশনা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আর্টিকেল ১১

ধর্মীয় শিক্ষা সকল স্তরে মৌলিক নির্দেশ হিসাবে কাজ করবে।

আর্টিকেল ১২

ছাত্রদের শিক্ষাবর্ষের মধ্যে মহানবী (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদার নৈতিক ও অন্যান্য জীবনাচরণের শিক্ষা নির্যাস প্রদান করতে হবে।

আর্টিকেল ১৩

সর্ব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের মধ্যে কুরআন অধ্যয়নের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অনিয়মিত ছাত্রদের কুরআন হেফজ করার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্র কুরআন প্রকাশনা ও বিতরণের ব্যবস্থা করবে।

আর্টিকেল ১৪

কারো সম্পদ, অর্থকড়ি অথবা সরকারী কর্তৃত্ব জাহির করা অবৈধ এবং এসব প্রদর্শনী হতে বিরত থাকা বাধ্যতামূলক। জনচরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সরকার আদেশ জারী করবে এবং শরীয়াহর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করবে।

আর্টিকেল ১৫

আরবী হবে সরকারী ভাষা (অনারব দেশের ক্ষেত্রে সে দেশের ভাষা) এবং সরকারী চিঠিপত্রে হিজরী সনের ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক হবে।

আর্টিকেল ১৬

জনগণের সেবা তথা দ্বীন-ধর্মের সংরক্ষণ, চরিত্রের শুদ্ধতা, জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করার মধ্যে সরকারের কর্তৃত্ব নিহিত ও নির্ভরশীল।

আর্টিকেল ১৭

কোন লক্ষ্য বৈধ এটুকুই যথেষ্ট নয়। কোন কাজের বৈধতার জন্য যে পদ্ধতিতে বা পন্থায় লক্ষ্যটি অর্জন করা হবে সে পদ্ধতি বা পন্থাও বৈধ হতে হবে।

৩. ইসলামী অর্থনীতি

আর্টিকেল ১৮

দেশের অর্থনীতি ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক হবে। রাষ্ট্র মানব মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করবে; সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সাথে জীবনের অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এবং হালাল (আইনসঙ্গত) উপায়ে অর্জিত জীবিকাকে সুরক্ষা প্রদান করবে।

আর্টিকেল ১৯

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকর্মের স্বাধীনতা শরীয়াহর সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

আর্টিকেল ২০

রাষ্ট্র শরীয়াহর বিধান মোতাবেক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

আর্টিকেল ২১

রাষ্ট্র একচেটিয়া ব্যবসা ও মজুতদারী বন্ধ করবে এবং প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে।

আর্টিকেল ২২

রাষ্ট্র পতিত জমি আবাদ ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।

আর্টিকেল ২৩

রিবা বা সুদের ভিত্তিতে কোন লেনদেন সুদকে গোপন রাখার জন্য যে কোন কার্যকে রাষ্ট্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে।

আর্টিকেল ২৪

মাটির তলার সকল সম্পদ, খনি, কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হবে রাষ্ট্রের।

আর্টিকেল ২৫

মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং আইনদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তা বিলিবন্দোবস্ত, বণ্টন বা ব্যবহার করা হবে।

আর্টিকেল ২৬

রাষ্ট্র জনগণ প্রদত্ত জাকাত শরীয়াহর নির্দেশ মোতাবেক ব্যয় করবে।

আর্টিকেল ২৭

জনকল্যাণের জন্য ওয়াকফ করা বৈধ এবং এ বিষয়ে সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রয়োগ করা হবে।

৪. ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা

আর্টিকেল ২৮

সুবিচার ও সমতা সরকারের ভিত্তি। আত্মরক্ষার মামলা রুজু করার অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত।

আর্টিকেল ২৯

ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাস পোষণ, কাজের অধিকার, লিখিত বা মৌখিকভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা; দল, সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনে ও তাতে অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। এ সমস্ত অধিকার শরিয়াহ্‌র বিধানের মধ্যে রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

আর্টিকেল ৩০

বাসগৃহ, চিঠিপত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা পবিত্র দায়িত্ব এবং রাষ্ট্র এসবের গোপনীতা লংঘন প্রতিরোধ ও নিষিদ্ধ করবে। তবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা অনুরূপ গুরুতর অপরাধ সংঘটনের আশংকা থাকলে আদালতের আদেশে উল্লেখিত গোপনীয়তার বিষয়ে সরকারের নির্ধারিত পদ্ধতি হস্তক্ষেপ করা যাবে।

আর্টিকেল ৩১

রাষ্ট্রের সীমান্তের ভিতরে ও বাইরে চলাচল আইনত সিদ্ধ ও অনুমোদিত। বাংলাদেশের ভিতরে যে কোন স্থানে বসবাস বা বিদেশ ভ্রমণে কোনরূপ বাধা দেওয়া যাবে না। তবে এ ধরনের বিধিনিষেধ আদালতের আদেশে আরোপ করা যাবে এবং আদালত তার কারণ নিষেধাজ্ঞায় উল্লেখ করবে। কোন নাগরিককে দেশ থেকে বহিষ্কার তথা নাগরিকত্ব হরণ করা যাবে না।

আর্টিকেল ৩২

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান নিষিদ্ধ তথা অনুমোদিত নয়। তবে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা অনুযায়ী সাধারণ অপরাধীদের বিদেশে ফেরত প্রেরণ করা যাবে। রাজনৈতিক কারণে আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যাপারে কি হবে?

আর্টিকেল ৩৩

জনসাধারণকে নির্যাতন করা অপরাধ। এ রূপ অপরাধ সংঘটনকারীদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করা যাবে না। অপরাধী ও তার সহকারী উভয়ে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে (কারাদণ্ড ছাড়াও)। যদি কোন সরকারী কর্মকর্তার সহায়তা, সম্মতি, মৌন সমর্থনের মাধ্যমে অপরাধটি সংঘটিত হয়ে থাকে তবে তাকে অপরাধে সহায়তাকারী হিসাবে গণ্য করে ফৌজদারী বা দেওয়ানী শাস্তি প্রদান করা হবে এবং সরকার নিগৃহীত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

আর্টিকেল ৩৪

কোন সরকারী কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রীয় এলাকায় কোন অপরাধ সংঘটিত হলে এবং তার জানা থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করেন, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে আদালতের মাধ্যমে (তা'জীর) শাস্তি প্রদান করা হবে।

আর্টিকেল ৩৫

কোন রক্তপাত সংঘটিত হতে দেয়া যাবে না এবং সংঘটিত হলে তার অবশ্যই শাস্তি

বিধান করতে হবে। নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। যদি অপরাধ সংঘটনকারীকে খুঁজে পাওয়া না যায় অথবা সে দেউলিয়া হয় তবে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। তবে সাধারণত অপরাধীকেই দৈহিক বা আর্থিক অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

আর্টিকেল ৩৬

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তিনি আদালতে মামলা রুজু করতে পারবেন। যদি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কোন অপরাধ ঘটে অথবা সরকারী সম্পত্তির আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন নাগরিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবেন।

আর্টিকেল ৩৭

কাজ করা, জীবিকা অর্জন করা এবং তা ভোগ বা সঞ্চয় করার নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করবে। এসব বিষয়ে কারো দ্বারা কারো অধিকার লংঘন করা যাবে না। শুধুমাত্র শরিয়ার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা লংঘনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

আর্টিকেল ৩৮

শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে থেকে নারীগণ কাজ করার অধিকার পাবেন।

আর্টিকেল ৩৯

রাষ্ট্র জনগণকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। কোন পন্থায় সরকার জনগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। তবে আদালতের আদেশে জনস্বার্থে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে।

আর্টিকেল ৪০

ক্ষতিপূরণ প্রদানপূর্বক সরকার জনগণের সম্পত্তি জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন মোতাবেক সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে।

আর্টিকেল ৪১

রাষ্ট্র পত্র পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি প্রদান করবে। জনগণের সংবাদপত্রের প্রকাশনার স্বাধীনতা থাকবে, তবে এ ক্ষেত্রে শরীয়ার শর্ত বলবৎ থাকবে।...

আর্টিকেল ৪২

জনগণ আইনসঙ্গতভাবে দল, এসোসিয়েশন বা ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে। কিন্তু প্রকাশিত পত্র পত্রিকার বিষয়বস্তু সমাজ বিরোধী ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ধ্বংসাত্মক নয়, অথবা শরীয়ার বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে রাষ্ট্র এ ধরনের দল, এসোসিয়েশন বা ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

আর্টিকেল ৪৩

শরীয়াহর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সকল অধিকার ভোগ করা যাবে।

৫. ইমাম

আর্টিকেল ৪৪

রাষ্ট্রের একজন ইমাম থাকবেন। যদি কারো মতের সাথে তার অমিল হয় তবুও তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক হবে।

আর্টিকেল ৪৫

স্রষ্টার আদেশ লংঘন করলে কোন কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করা যাবে না। ইমাম আনুগত্য পাবার দাবীদার হবেন না, যদি তিনি শরীয়াহর কোন বিধান অমান্য করেন।

আর্টিকেল ৪৬

আইন জনগণের ইমাম নির্বাচনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেবে। এ নির্বাচন পদ্ধতি শরীয়াহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অনুকূল মতামত দ্বারা ইমামতি বা নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

আর্টিকেল ৪৭

রাষ্ট্রের প্রধান পদে প্রার্থী বা ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নিম্ন শর্তাবলী পালন করতে হবে :

ক. তিনি একজন মুসলমান হবেন: প্রকৃত অর্থে (মোত্তাকি)

খ. তিনি একজন পুরুষ হবেন;

গ. তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হবেন;

ঘ. তিনি একজন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি হবেন;

ঙ. তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হবেন;

চ. তিনি শরীয়াহর সকল বিধি বিধান ও অনুশাসন সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল হবেন।

আর্টিকেল ৪৮

আইন অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ভোটে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হবেন। অন্য যে কোন পদের জন্য ভোটে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যদি তিনি নির্ধারিত আইনের নির্ধারিত বিধি বিধান ও পদ্ধতির শর্ত পূরণ করতে পারেন।

আর্টিকেল ৪৯

আদালত তলব করলে রাষ্ট্রের প্রধান বিজ্ঞ আদালতের সামনে হাজির হবেন অথবা তাঁর প্রতিনিধি আদালতে হাজিরা দেবেন।

আর্টিকেল ৫০

রাষ্ট্রের প্রধান অন্যান্য নাগরিকদের মত সকল অধিকার ভোগ করবেন এবং অন্যান্য নাগরিকদের মত সকল দায়দায়িত্ব পালন করবেন। আর্থিক বিষয়ে তিনি আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

আর্টিকেল ৫১

ইমামের অনুকূলে কোন দলিল করা যাবে না এবং তাঁর ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের জন্য চতুর্থ ডিগ্রীর কোন ওয়াক্‌ফ গঠন করা যাবে না। তবে মিরাসী আইন অনুযায়ী তিনি

উত্তারাধিকার প্রাপ্ত হবেন। ইমাম রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা ভাড়া দিতে পারবেন না।

আর্টিকেল ৫২

ইমামকে প্রদত্ত উপহার সামগ্রী তার হাত, পায়ের শিকল স্বরূপ এবং এসব সামগ্রী রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে।

আর্টিকেল ৫৩

ইমামকে ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতা ও অন্যান্য সৎগুণাবলীতে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সকল কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রতিবছর তাঁকে মক্কায় হজ্ব মিশন পাঠাতে হবে, যারা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল সভায় অংশগ্রহণ করবেন।

আর্টিকেল ৫৪

শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ইমাম সেনাপতিত্ব করবেন। তিনি দেশের সীমান্ত রক্ষা করবেন, হুদুদ (শরিয়ায় বর্ণিত শাস্তি) প্রতিষ্ঠা করবেন, চুক্তি সম্পাদন ও তা অনুসমর্থন করবেন।

আর্টিকেল ৫৫

ইমাম ভালো কাজ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক কাজ করতে জনগণকে সক্ষম করে তুলবেন।

আর্টিকেল ৫৬

ইমাম রাষ্ট্রীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণপদে লোকবর্গকে নিয়োগ দান করবেন। তিনি তার নিয়োগ দানের কিছু ক্ষমতা তার অধীনস্থদের অর্পণ করবেন, যারা গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়া অন্যান্য পদে নিয়োগ দান করবেন।

আর্টিকেল ৫৭

কোন অপরাধ ক্ষমা করা যাবেনা, তবে আইনে ক্ষমা প্রদানের বিধান থাকলে ক্ষমা করা যাবে। রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও শরীয়তে বর্ণিত শাস্তি (হুদুদ) ব্যতিত অন্যান্য অপরাধ ইমাম ক্ষমা করতে পারবেন।

আর্টিকেল ৫৮

ইমাম বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন যদি দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, অথবা এমন পরিস্থিতি বিরাজ করে যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে, অথবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এমন অবস্থা বিরাজ করে, গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, অন্যরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের আশংকা থাকে। তবে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের এক সপ্তাহের মধ্যে তা আইন সভার নিকট পেশ করতে হবে। নির্বাচিত নতুন আইনসভা না থাকলে, পুরান আইনসভার অধিবেশন ডাকতে হবে। যদি এ পদ্ধতি অবলম্বন না হয় তবে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে এ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগকে আইনসঙ্গত রূপ প্রদানের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে এবং কোন্ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষমতাকে বৈধতা প্রদান করবে আইনে তা নির্দেশিত থাকবে।

৬. বিচার বিভাগ

আর্টিকেল ৫৯

বিচার বিভাগের বিচারপতিগণ শরিয়াহ্‌র বিধি বিধান মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

আর্টিকেল ৬০

বিচার বিভাগের সামনে আইনের চোখে সকল মানুষ সমান বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি বা দলকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

আর্টিকেল ৬১

বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ ও অবৈধ বিবেচিত হবে। কোন মামলা রুজুকারীকে প্রতিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

আর্টিকেল ৬২

ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে শুনানী গ্রহণে আদালতকে নিষেধ করা যাবে না বা বিচার কার্যকে বিঘ্নিত করা যাবে না।

আর্টিকেল ৬৩

রাহ্‌মানুর রাহিম আল্লাহ্‌র নামে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ করবে। বিচারকার্য পরিচালনায় বিচারপতিগণ শরীয়াহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কোন আইনের আশ্রয় নেবেন না।

আর্টিকেল ৬৪

আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে গাফিলতি বা ব্যর্থতা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

আর্টিকেল ৬৫

রাষ্ট্র বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এবং বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

আর্টিকেল ৬৬

রাষ্ট্র সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গকে বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত করবে এবং সুচারু বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা নিশ্চিত করবে।

আর্টিকেল ৬৭

শরীয়াহ্‌'য় বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধের (হুদুদ) ক্ষেত্রে অপরাধীকে আদালতে হাজির করতে হবে, তাকে তার মনোনীত আইনবিদ মনোনীত করতে দেয়া হবে; তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করবে।

আর্টিকেল ৬৮

আদালতের কার্যক্রম হবে মুক্ত এবং জনগণ তাতে হাজির থাকতে পারবেন। গোপনে আদালতের বিচার কার্য সম্পন্ন করা যাবে না, যদি না শরীয়াহ তা অনুমোদন করে।

আর্টিকেল ৬৯

জিনা, কাজফ (মানহানী), চুরি, দস্যুতা (হিরাবাহ্), মদ্যপান ও স্বধর্মত্যাগ প্রভৃতি অপরাধের ক্ষেত্রে 'হুদুদ আল শরীয়াহ'-এ বর্ণিত শাস্তি প্রদান করা হবে।

আর্টিকেল ৭০

হুদুদ ব্যতিত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত ও কাজীর বিচারবুদ্ধি (তা'জীর) অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে।

আর্টিকেল ৭১

অপরাধকারীর অপরাধ সংঘটনে কতটুকু দায়দায়িত্ব তা আইন নির্ধারণ করবে। তবে এ দায়ভার রক্তপণের সীমা অতিক্রম করবে না।

আর্টিকেল ৭২

আইন অপরাধীর অনুতপ্ত হবার ক্ষেত্রে তা গ্রহণের মানদণ্ড ও শর্তাদি নির্ধারণ করবে।

আর্টিকেল ৭৩

(উল্লেখ করা হয় নাই)

আর্টিকেল ৭৪

(উল্লেখ করা হয় নাই)

আর্টিকেল ৭৫

নারীর ক্ষেত্রে রক্তপণ পুরুষের সমান হতে পারে।

আর্টিকেল ৭৬

'উইসাস' প্রয়োগের শর্তাধীনে আদালতের পূর্ণ নিশ্চয়তা ও সমতা কার্যকরী হবে।

আর্টিকেল ৭৭

কাজীর বিচারের ক্ষেত্রে বেত্রদণ্ড সুল শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে, কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া কারাদণ্ড প্রদান করা যাবেনা এবং কারাদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সময় সীমা সীমিত হবে।

আর্টিকেল ৭৮

কারাবন্দীকে নির্যাতন, অত্যাচার বা মানহানি করা যাবে না।

আর্টিকেল ৭৯

একটি 'সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালত' গঠন করা হবে যা বিধি বিধান ইত্যাদি সময় সময় পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান করবে এবং তা শরীয়াহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবে। এই সর্বোচ্চ আদালতকে আরো কি ক্ষমতা দেয়া যায় তা আইন নির্ধারণ করবে। কারা হবে এর সদস্য?

আর্টিকেল ৮০

একটি 'দিওয়ান-আল-মুজালিম' গঠন করা হবে এবং এ আইন সংস্থার গঠন কার্যপরিধি ও সদস্যদের ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেবে।

৭. শুরা, তত্ত্বাবধান ও আইন প্রণয়ন

আর্টিকেল ৮১

রাষ্ট্রের একটি 'মজলিসে শুরা' থাকবে, যা (আইন পরিষদ) নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করবে :

১. শরীয়াহর অনুশাসন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা;

২. রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা এবং এর হিসাব নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান করা;

৩. সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করা;

৪. মন্ত্রীপরিষদের কার্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া এবং প্রয়োজনে মন্ত্রীসভা হতে অনুমোদন প্রত্যাহার করা।

আর্টিকেল ৮২

আইন মজলিসে শুরার নির্বাচন পদ্ধতি, শুরার সদস্য হবার যোগ্যতা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করে দেবে। বিজ্ঞজনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ বিধানাদি নির্ধারিত হবে, যাতে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের এবং জ্ঞানীগুণীজন তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। আইন শুরার সদস্যদের আর্থিক বিষয়াদিও নির্ধারণ করে দেবে। মজলিসে শুরা তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ পরিচালনা পদ্ধতি নিজে ঠিক করে নেবে।

৮. সরকার

আর্টিকেল ৮৩

সরকার সকল সরকারী কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্বাবদ্ধ থাকবে; শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী তা পরিচালনা করবে এবং ইমামের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে (যে সব রাষ্ট্রে 'মজলিসে শুরা' থাকবে সেখানে 'ইমাম' শব্দটির স্থলে 'মজলিসে শুরা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে)।

আর্টিকেল ৮৪

আইন মন্ত্রীবর্গের নিয়োগের শর্ত- নির্ধারণ করে দেবে, তাদের কার্যকালে যে সব তাদের জন্য নিষিদ্ধ তা উল্লেখ করবে, তাদের দায়িত্ব লংঘনের ক্ষেত্রে বিচারপদ্ধতি বর্ণনা করবে।

৯. সাধারণ অন্তর্বর্তীকালীন বিধান

আর্টিকেল ৮৫

... (শহরের নাম)   হবে দেশের রাজধানী।

আর্টিকেল ৮৬

আইন রাষ্ট্রের পতাকা ও প্রতীক নির্ধারণ করে দেবে এবং এ সংক্রান্ত সকল নিয়মকানুন উল্লেখ করবে।

আর্টিকেল ৮৭

বলবৎ হবার তারিখ হতে আইনসমূহ কার্যকর হবে। বলবৎ হবার পূর্ব কোন তারিখ হতে আইনসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা যাবে না। তবে আইনসভার দু'-তৃতীয়াংশ সদস্যের ইতিবাচক ভোটে ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোন আইনের বিষয়ে পূর্বকার্যকারিতা বা ভূতাপেক্ষিক অনুমোদন প্রদান করা যাবে।

আর্টিকেল ৮৮

আইন বলবৎ হবার দু' সপ্তাহের মধ্যে সরকারী গেজেটে তা প্রকাশ করতে হবে। অন্য কোন বিধান না থাকলে গেজেটে প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আইন কার্যকর হবে।

আর্টিকেল ৮৯

ইমাম এবং আইনসভা উভয়ে সংবিধানের এক বা একাধিক আর্টিকেল সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারবেন। যে বা যেসব আর্টিকেল সংশোধনের প্রস্তাব করা হবে তার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে হবে। যদি আইন পরিষদ এ সংশোধনী প্রস্তাব করে তবে সে প্রস্তাব আইন পরিষদের দু' তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। আইন পরিষদ সংশোধন প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করবেন এবং দু' তৃতীয়াংশ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে এক বছরের মধ্যে ঐ সংশোধনী প্রস্তাব পুন: আনয়ন করা যাবে না। যদি আইনসভা প্রথম পর্যায়ে সংশোধনটি অনুমোদন করে এবং দু'-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হয়, তবে বিষয়টি জনগণের সমর্থনের জন্য গণভোটে পেশ করা হবে।

গণভোটে সংশোধনীটি অনুমোদিত হলে গণভোটের রায় প্রকাশের দিন থেকে সংশোধনীটি কার্যকর হবে।

আর্টিকেল ৯০

এ সংবিধান বলবৎ হবার পূর্ববর্তী সকল আইন, বিধান, প্রবিধি ইত্যাদি বলবৎ ও কার্যকর থাকবে। তবে সংবিধানের আলোকে পূর্ববর্তী বিধিবিধানসমূহ সংশোধন বা বাতিল করা যাবে। যদি পূর্ববর্তী বিধি বিধান শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে যতটুকু সাংঘর্ষিক বা অসঙ্গতিপূর্ণ ততটুকু বাতিল করা হবে।

আর্টিকেল ৯১

উম্মাহ কর্তৃক গণভোটে সমর্থিত হবার দিন থেকে এ সংবিধান কার্যকর হবে।

(সূত্র : দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, ৯ (৬), এপ্রিল, ১৯৮২ পৃষ্ঠা ২৯-৩৪)

পরিশিষ্ট - খ

ইসলামী শাসনতন্ত্রের মডেল

প্রস্তাবনা

যেহেতু ইসলাম সকল যুগের সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং আল্লাহর বিধান বিশ্বজনীন ও চিরন্তন এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য;

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের আত্মমর্যাদা রয়েছে;

যেহেতু ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সকল ক্ষমতা শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য অর্পিত আমানত বা দায়িত্ব, যাতে ঐশীবাণী বিধান মোতাবেক সকল অবিচার ও অভাবমুক্ত জীবন নিশ্চিত হয় এবং মানব জীবন যাতে সামঞ্জস্যশীলতা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিপূর্ণতা দ্বারা উজ্জীবিত হয়;

স্বীকৃতি প্রদান করা যাচ্ছে যে ইসলাম ও ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সমাজ গঠন সংবিধান ও আইনে শরীয়াহর পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করে এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিজের প্রতি, দেশের প্রতি এবং সমগ্র মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে;

আমরা, ... (রাষ্ট্রের নাম) ... এর নাগরিকগণ নিম্নবর্ণিত মূল্যবোধ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি :

ক. একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ;

খ. শৃংখলা ও দায়িত্ব সচেতনতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা;

গ. ক্ষমা ও দয়া ভিত্তিক সুবিচার,

ঘ. ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে সমতা,

ঙ. শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতি হিসাবে 'শুরা' বা পারস্পরিক পরামর্শ ব্যবস্থা।

আমরা, (রাষ্ট্রের নাম) জনগণ, তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটের[১] মাধ্যমে এই সংবিধান গ্রহণ করলাম, উরোক্ত নীতিমালায় নিজদের আবদ্ধ করলাম এবং তদনুসারে আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম। এবং আল্লাহ্ পাক আমাদের সাক্ষী।

শাসন কর্তৃত্বের ভিত্তি ও সমাজের ভিত্তি

আর্টিকেল ১

ক. সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর এবং শরীয়াহ্ হচ্ছে চূড়ান্ত বিধান;

খ. কুরআন ও সুন্নাহ সমন্বিত শরীয়াহ্ হচ্ছে আইন ও রাজনীতির উৎস,

গ. শাসনকর্তৃত্ব একটি আমানত, জনগণ যা শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করবে।

আর্টিকেল ২

(রাষ্ট্রের নাম)... মুসলিম বিশ্বের একটি অংশ এবং (রাষ্ট্রের নাম) এর জনগণ মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ) অংশ।

আর্টিকেল ৩

রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি হবে নিম্নবর্ণিত নীতিমালাসমূহ :

ক. জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়াহ্‌র বিধান হচ্ছে চূড়ান্ত;

খ. শাসন পদ্ধতি হবে 'শুরা' বা পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক;

গ. এই বিশ্বাস যে, এই বিশ্বের সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর এবং এসব কিছু মানবজাতির জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এই ঐশী আশীর্বাদে ন্যায়সঙ্গত হিস্যা রয়েছে;

ঘ. এই বিশ্বাস যে, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহর পক্ষ হতে একটি আমানত এবং মানুষ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে এসবের আমানতদার (মুসতাখলাফ)। এই আমানতদারীর কাঠামোর মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও তার প্রাপ্তি নিহিত রয়েছে,

ঙ. মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামী বিধানের অলংঘনীয়তা এবং বিশ্বের সর্বত্র শোষিত ও নির্যাতিত মানুষকে সহায়তা প্রদান;

চ. ইসলামী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, মিডিয়া ও অন্যান্য উপায়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামী চরিত্রের রূপায়ণের সর্বোচ্চ গুরুত্ব;

ছ. সমাজের সকল সক্ষম সদস্যদের কাজের সুযোগ এবং অসমর্থ, পীড়িত ও বৃদ্ধাদের জীবিকার নিরাপত্তা বিধান,

জ. সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা সরবরাহ;

ঝ. উম্মাহর একতাবদ্ধতা ও তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা;

ঞ. ইসলামী দাওয়াত প্রদানের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক পালন করা;

দায়িত্ব ও অধিকার

আর্টিকেল ৪

ক. মানুষের জীবন, শরীর, সম্মান ও স্বাধীনতা পবিত্র ও অলংঘনীয়। একমাত্র শরীয়াহর কর্তৃত্ব ও অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রাণ বা দেহের ক্ষতি করা যাবে না;

খ. জীবদ্দশার মত মৃত্যুর পরও ব্যক্তিমানুষের শরীর ও সম্মান পবিত্র ও অলংঘনীয়।

আর্টিকেল ৫

ক. কোন ব্যক্তির দেহের উপর অত্যাচার বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করেছে মর্মে জোরপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করা যাবে না; এমন কিছু করতে বাধ্য করা যাবেনা যা ঐ ব্যক্তির জন্য বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর;

খ. অত্যাচার একটি অপরাধ এবং যে কোন সময়েই দণ্ডনীয়;

আর্টিকেল ৬

ক. প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার দাবীদার;

খ. বাসগৃহ, চিঠিপত্র ইত্যাদির গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে এবং আদালতের বৈধ আদেশ ছাড়া তা ভঙ্গ করার কারো অধিকার নেই।

আর্টিকেল ৭

প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র আয়ত্বাধীন সম্পদের মাধ্যমে এসবের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল ৮

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও বিশ্বাস পোষণের অধিকার রয়েছে। আইনের সীমারেখার মধ্যে ঐসব প্রকাশ করারও তার অধিকার রয়েছে।[২]

আর্টিকেল ৯

ক. প্রত্যেক মানুষ আইনের চোখে সমান এবং প্রত্যেকে সমভাবে আইনের নিরাপত্তা পাবে;

খ. সমান যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি সমান সুযোগ পাবার দাবীদার। ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্ণ, গোত্র, ভাষাগত ইত্যাদি কারণে কারো প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

আর্টিকেল ১০

ক. প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আইন মোতাবেক এবং কেবলমাত্র আইন মোতাবেক আচরণ করতে হবে।

খ. সকল ফৌজদারী আইন বলবৎ হবার তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং এ আইনকে বলবৎ হবার পূর্ব কোন তারিখ থেকে কার্যকারিতা প্রদান করা যাবে না।

আর্টিকেল ১১

ক. আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত এবং লিপিবদ্ধ না থাকলে কোন কাজকে অপরাধ গণ্য করা যাবে না বা তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

খ. প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের কাজের জন্য দায়ী। একজনের অপরাধের

জন্য তার পরিবারের কোন সদস্য বা অন্য কাউকে দায়ী করা যাবেনা, যদি না তাতে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা থাকে।

গ. আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ বলে গণ্য হবে।

ঘ. যথাযথ নিয়মে বিচার কার্য সম্পাদন এবং আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

আর্টিকেল ১২

ক. কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী এজেন্সী কর্তৃক অহেতুক হেনস্থা করা যাবে না।

খ. কোন ব্যক্তি যখন ব্যক্তিগত বা জন অধিকার দাবী করবে তখন তাকে কোন রূপ হেনস্তা করা যাবে না।

আর্টিকেল ১৩

ক. প্রত্যেক মুসলমানের বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের অধিকার আছে এবং শরীয়াহর নিয়ম মোতাবেক তিনি তার সন্তানদের গড়ে তুলবেন।

খ. প্রত্যেক স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার স্ত্রী ও সন্তানদের লালন পালন করবেন।

গ. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র হতে মাতৃসমাজ বিশেষ সম্মান, যত্ন ও সহায়তা প্রাপ্ত হবেন।

ঘ. প্রত্যেক শিশুর পিতামাতা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালিত হবার অধিকার রয়েছে।

ঙ. শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কত বৎসর পর্যন্ত?

আর্টিকেল ১৪

ক. নাগরিকত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

খ. প্রত্যেক মুসলমানের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের আবেদনের অধিকার থাকবে। আইন মোতাবেক এই আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।

আর্টিকেল ১৫

আইন দ্বারা কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হলে, প্রত্যেক নাগরিকের দেশের যে কোন স্থানে বসবাসের এবং দেশের ভিতরে বাহিরে গমনাগমনের অধিকার থাকবে। কোন নাগরিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না এবং দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধা দেয়া যাবে না।

আর্টিকেল ১৬

ক. ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

খ. অমুসলিম সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

গ. পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব আইন ও ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত হবে।

আর্টিকেল ১৭

বৎসরের উর্ধ্বের প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের জনগণ সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে অংশগ্রহণের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে।

আর্টিকেল ১৮

ক. শরিয়াহর কোন বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে প্রত্যেক নাগরিকের সমবেত হবার এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা অন্য ধরনের দল, সংগঠন, গ্রুপ, এসোসিয়েশন ইত্যাদি গঠনের অধিকার থাকবে।

খ. এ ধরনের দল, সংগঠন ও এসোসিয়েশনের গঠন ও কার্যাবলী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

আর্টিকেল ১৯

আইন অনুসারে কেউ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে রাষ্ট্র তা প্রদান করবে। এ ধরনের রাজনৈতিক শরণার্থীদের রাষ্ট্র প্রয়োজনে নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে এবং আবেদন করলে নিরাপদে অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি প্রদান করবে।

মজলিসে শুরা

আর্টিকেল ২০

ক. জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত একটি 'মজলিসে শুরা' থাকবে, যার সদস্য সংখ্যা হবে.... জন।

খ. মজলিসের মেয়াদকাল হবে.... বৎসর।

গ. মজলিসের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার গুণাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আর্টিকেল ২১

'মজলিসে শুরা'র কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

ক. শরিয়াহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন; প্রয়োজনে উলেমা কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ;

খ. সরকার ও মজলিসে শুরা'র সদস্যদের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ন করা;

গ. সরকারের বাজেট অনুমোদন করা এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. সরকার ও তার বিভিন্ন বিভাগের নীতিমালা পর্যালোচনা করা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনে তদন্তকার্য পরিচালনা করা;

ঙ. যুদ্ধ, শান্তি বা জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা;

চ. আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা, প্রটোকল ইত্যাদি অনুমোদন করা;

আর্টিকেল ২২

দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, হেনস্তা বা সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা যাবে না।?

ইমাম

আর্টিকেল ২৩

ক. ইমাম হবেন দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে..... বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন। 'মুজলিস আল বায়াহ' তার হাতে 'বায়াত' গ্রহণ করার তারিখ হতে তার কার্যকালের মেয়াদ শুরু হবে।

খ. আইনের নির্দেশনা মোতাবেক ইমাম জনগণ ও 'মজলিসে শুরা'র নিকট দায়ী থাকবেন।

আর্টিকেল ২৪

একজন ব্যক্তির ইমাম নির্বাচিত হবার জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন:

ক. মুসলিম প্রার্থীর বয়স.... এর কম হবে না;

খ. তিনি নিষ্কলংক চরিত্রের অধিকারী হবেন;

গ. তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন মেনে চলবেন, ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং শরীয়াহর বিধি বিধানের বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত;

ঘ. শারীরিক, মানসিক ও অনুভূতিগতভাবে তার পদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম;

ঙ. তিনি নম্র, ভদ্র এবং সুষম আচরণের অধিকারী। জ্ঞানী, সৎ, নিষ্ঠাবান।

আর্টিকেল ২৫

দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে ইমাম 'মজলিসে শুরা' সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ (মজলিসে বায়াহ), উলেমা কাউন্সিল, সুপ্রিম সাংবিধানিক কাউন্সিল, সর্বোচ্চ আদালত, ইলেকশন কমিশন, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানগণের সামনে ঘোষণা প্রদান করবেন যে, তিনি অক্ষরে অক্ষরে শরীয়াহর অনুশাসন অনুসরণ করবেন, ইসলামের বাণীকে যে কোন মূল্যে সর্ব উর্ধ্বে তুলে ধরবেন, সংবিধান সংরক্ষণ করবেন; দেশের সীমান্ত, আদর্শিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবেন, জনগণের অধিকার রক্ষা করবেন; ভয় বা প্রলোভন ব্যতিরেকে বৈষম্যহীনভাবে সবার প্রতি সুবিচার করবেন; জনগণের দুঃখ দুর্দশা অপনোদনের জন্য সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে শুনানী শ্রবণ করবেন। তাঁর এই অঙ্গীকার ঘোষণার পর, উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী তাঁদের নিজ ও জনগণের পক্ষ হতে তাঁর নিকট 'বায়াত' গ্রহণ করবেন।

আর্টিকেল ২৬

ইমাম সকল ব্যক্তির আনুগত্য প্রাপ্ত হবেন, যদি কারো মতামত ইমাম থেকে ভিন্নও হয়। তবে আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে ইমাম আনুগত্য লাভ করবেন না।

আর্টিকেল ২৭

অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় ইমাম সমঅধিকার ভোগ করবেন। তিনি সবার ন্যায় আইন মান্য করে চলবেন; এ বিষয়ে তিনি কোন প্রকার দণ্ডমুক্তি বা বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন না।

আর্টিকেল ২৮

ক. ইমাম রাষ্ট্রীয় কোন সম্পত্তি ক্রয় বা ভাড়া করবেন না অথবা তিনি নিজের কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট বিক্রি বা ভাড়া দিতে পারবেন না। তিনি দেশের ভিতরে বা বাইরে কোন ব্যবসা পরিচালনা করবেন না।

খ. সরকারী পদাধিকার বলে ইমাম, ইমামের পরিবারের সদস্যবর্গ বা সরকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত উপহার সরকারী সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

গ. ইমাম আদালতের কোন আদেশকে বাতিল করে দিতে পারবেন না; হুদুদ, কিসাস বা দিয়াহ্ এর ক্ষেত্রে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির শাস্তি হ্রাস, রদ বা বিলম্বিত করতে পারবেন না। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার ক্ষমা প্রদানের অধিকার থাকবে।

আর্টিকেল ২৯

ইমাম বা যথাযথভাবে নিযুক্ত তার প্রতিনিধি বিদেশী সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন।

আর্টিকেল ৩০

ইমাম 'মজলিসে শুরা' কর্তৃক অনুমোদিত আইনে সম্মতি প্রদান করবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করবেন। মজলিস কর্তৃক অনুমোদিত কোন আইনে তিনি ভেটো প্রয়োগ করতে পারবেন না। তবে তিনি প্রণীত আইনটি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে মজলিসে শুরার নিকট ফেরত পাঠাতে পারবেন। 'মজলিসে শুরা' পুন: আইনটি বিবেচনা করে দু' তৃতীয়াংশ ভোটে তা আবার অনুমোদন করলে, ইমাম আইনটিতে সম্মতি প্রদান করবেন।

আর্টিকেল ৩১

ইমাম উপদেষ্টা, মন্ত্রীবর্গ, রাষ্ট্রদূত এবং সশস্ত্রবাহিনী প্রধানদের নিয়োগ দান করবেন।

আর্টিকেল ৩২

ইমাম অভিশংসিত হবেন যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধান লংঘন করেন অথবা শরীয়াহ্র বিধান গুরুতরভাবে ভঙ্গ করেন। মজলিসে শুরার দু' তৃতীয়াংশ ভোটে এই অভিশংসন কার্যকর হবে। ইমাম যদি 'বায়াতের' কোন শর্ত লংঘন করেন তবে মজলিসে

বায়াহ' এর দু' তৃতীয়াংশ ভোটে প্রদত্ত 'বায়াত' বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ. অভিশংসনের রীতিনীতি পদ্ধতি এবং ইমামের অপসারণ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আর্টিকেল ৩৩

ক. ইমাম 'মজলিসে শুরা'র নিকট স্বহস্ত স্বাক্ষরে পদত্যাগ করতে পারেন।

খ. ইমামের পদ শূন্য থাকার ক্ষেত্রে, ইমাম নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ...... দিন মজলিসে শুরার স্পীকার ইমামের দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. ইমামের অক্ষমতার ক্ষেত্রে, ... দিন পর্যন্ত মজলিসে শুরার স্পীকার ইমামের দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যথায় ইমামের পদ শূন্য বলে গণ্য হবে।

বিচার বিভাগ

আর্টিকেল ৩৪

প্রত্যেক ব্যক্তির আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার থাকবে।

আর্টিকেল ৩৫

ক. বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হতে স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত থাকবে। বিচার বিভাগ বিচারকার্য পরিচালনা করবে ও জনগণের অধিকার রক্ষায় ব্রতী থাকবে।

খ. বিচারপতিগণ স্বাধীন এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতিত তাদের উপর আর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

আর্টিকেল ৩৬

ন্যায়বিচার প্রয়োগ হবে স্বাধীন ও মুক্ত এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আইন প্রতিরোধ করবে।

আর্টিকেল ৩৭

আদালতের যাবতীয় কার্যাদি জনসমুক্ষে উন্মুক্ত হবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সম্মান ইত্যাদি রক্ষার ক্ষেত্র ব্যতীত গোপনে বিচার কার্য পরিচালনা করা যাবে না।

আর্টিকেল ৩৮

ক. বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা বৈধ নয়।

খ. তবে সামরিক আইনের অধীন অপরাধের জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য সামরিক আদালত গঠন করা যাবে।

আর্টিকেল ৩৯

আদালতের রায় বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে শিথিলতা বা ব্যর্থতা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

আর্টিকেল ৪০

সংবিধানের নীতিমালা অনুযায়ী বিচার বিভাগের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা; তাদের নিয়োগ, বদলী, পদচ্যুতি ইত্যাদির নিয়মপদ্ধতি; আইন ও শাসন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আর্টিকেল ৪১

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে একটি 'হিসবাহ' বিভাগ গঠিত হবে:

ক. সৎকাজ সমুন্নত রাখা ও মন্দ কাজকে নিরোধের জন্য ইসলামী মূল্যবোধ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উজ্জীবিত করা;

খ. রাষ্ট্র ও এর অঙ্গ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির অভিযোগ তদন্ত করা;

গ. ব্যক্তিমানুষের অধিকার রক্ষা করা;

ঘ. রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা; ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিচ্যুতি ঘটলে তা সংশোধন করা;

ঙ. প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বৈধতা পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা;

আর্টিকেল ৪২

'হিসবাহ' প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে একজন 'মুহতাসীন আম' থাকবেন এবং তাঁকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রদেশ ও নিম্নস্তরের 'মুহতাসীব'গণ থাকবেন। এই কার্যালয়ের বিধি-বিধান ও কার্যপ্রণালী আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আর্টিকেল ৪৩

'মুহতাসীব'গণ স্বউদ্যোগে অথবা কারো নিকট হতে আবেদন বা তথ্য পাবার পর কার্যক্রম শুরু করবেন। তারা সরকারী বিভাগ বা এজেন্সী হতে প্রয়োজনীয় তথ্য তলব করতে পারবেন এবং চাহিদা মোতাবেক সরকারী কর্মচারীগণ ত্বরিৎ ও যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহ করবেন।

আর্টিকেল ৪৪

যদি 'মুহতাসিব আম' কোন আইন বা সরকারী বিধিবিধানকে নিপীড়নমূলক বা অসঙ্গত মনে করেন এবং জনগণের পক্ষে তা পালন কষ্টসাধ্য বলে মনে করেন অথবা আইন বা বিধিটি অসাংবিধানিক মর্মে বিবেচিত হয় তবে তিনি আইন বা বিধিটি বাতিল বা সংশোধনের জন্য বিচার বিভাগের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন।

আর্টিকেল ৪৫

কোন বিষয় যথাযথ আদালত আমলে নেয়া সত্ত্বেও, অথবা আমলে নেয়া প্রক্রিয়াধীন থাকা সত্ত্বেও একজন'মুহতাসিব' বিষয়টি আমলে নিতে পারবেন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আর্টিকেল ৪৬

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী নীতির ন্যায়পরায়ণতা, সমতা, মানবিক মর্যাদা, উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা, সুষম সম্পর্ক এবং অপচয় রোধের ভিত্তিতে সংস্থাপিত হবে। জনগণের বস্তুগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য সরকার সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত পদ্ধতিতে দেশের মানব ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদ ব্যবহার করবেন।

আর্টিকেল ৪৭

দেশের সকল প্রকার সম্পদ ও শক্তির উৎস সমূহের উন্নয়ন করা এবং তাদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখবে যাতে কোন সম্পদের মজুতদারী না হয়, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে বা অপচয় না হয়। জনগণ আইনের সীমারেখার মধ্যে বর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আর্টিকেল ৪৮

ক. সকল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের মালিকানা সমাজের। সকল সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসায়িক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়মনীতির নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

খ. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা আইনসঙ্গত ও বৈধ যদি তা বৈধ পন্থার উপায় উপার্জিত হয়ে থাকে এবং শরীয়ার অনুশাসন মোতাবেক সমন্বিত বা ব্যয়িত হয়।

গ. সমাজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন সরকারী সম্পত্তি বণ্টন করা যাবে না। জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না; প্রয়োজনে করা হলে সেক্ষেত্রে ত্বরিৎগতিতে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

আর্টিকেল ৪৯

ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা আইন দ্বারা নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা হবে।

খ. শরিয়াহর অনুশাসনের পরিপন্থী সকল প্রকার মুনাফা অর্জন বা ব্যয় নিষিদ্ধ।

গ. বৈধভাবে অর্জিত কোন মুনাফা বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

আর্টিকেল ৫০

টাকা যেহেতু কোন কিছুর মূল্য নির্ধারক এবং বিনিময়ের মাধ্যম, তাই এমন কোন রাজস্ব বা মুদ্রানীতি গ্রহণ করা যাবে না, যা টাকার অবমূল্যায়ন ঘটায় বা মূল্যমানকে ব্যাহত করে।

আর্টিকেল ৫১

বেসরকারী ব্যক্তি বা সংগঠন দ্বারা অর্জিত নয় এমন সব আয় ও সম্পত্তির মালিকানা হবে রাষ্ট্রের।

আর্টিকেল ৫২

রিবা (সুদ), একচেটিয়া ব্যবসা, মজুদদারী, মুনাফাখোরী এবং অর্থনৈতিক শোষণ এবং এ ধরনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকবে। ব্যাংক চলবে PLS এর মাধ্যমে।

আর্টিকেল ৫৩

বৈদেশিক অর্থনৈতিক আধিপত্য ছিন্ন বা প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্র সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল ৫৪

আর্থ-সামাজিক বিষয় ও শরীয়াহর জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে একটি 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল' গঠন করা হবে, যা নিম্নবর্ণিত কার্যাদী সম্পাদন করবে:

ক. সংবিধানে বিধৃত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে;

খ. সরকার ও 'মজলিসে শুরা' কে আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা, বাজেট ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিষয় অবহিত করবে;

আর্টিকেল ৫৫

'অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল' এর গঠন এবং এ সম্পর্কিত সকল নিয়মপদ্ধতি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

প্রতিরক্ষা

আর্টিকেল ৫৬

ক. জিহাদ একটি অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র দায়িত্ব।

খ. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামী রাষ্টের ভূ-খণ্ড এবং ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা অবশ্য কর্তব্য।

আর্টিকেল ৫৭

ক. রাষ্ট্র দেশের সমাজের সাথে সঙ্গতিশীল একটি সক্ষম সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলবে, যা জিহাদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করবে।

খ. রাষ্ট্র জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সক্ষম করে তুলবে।

গ. সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সেনাবাহিনীর মধ্যে জিহাদের চেতনাকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকবে।

আর্টিকেল ৫৮

ক. ইমাম হবেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

খ. 'মজলিসে শুরা'র অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি যুদ্ধ, শান্তি বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

আর্টিকেল ৫৯

যুদ্ধ ও শান্তির নীতি ও কৌশল প্রণয়নের জন্য একটি 'সুপ্রীম জিহাদ কাউন্সিল' থাকবে। কাউন্সিলের গঠন, নিয়ম ও কার্যপদ্ধতি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

সুপ্রীম সাংবিধানিক কাউন্সিল

আর্টিকেল ৬০

'সুপ্রীম সাংবিধানিক কাউন্সিল' নামে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় সংস্থা থাকবে, যা রাষ্ট্রে ইসলামী চরিত্র ও সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করবে।

আর্টিকেল ৬১

কাউন্সিলের কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

ক. শরিয়াহ্‌র সাথে কোন আইনের সংঘর্ষের বা অসামঞ্জস্যশীলতার প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কাউন্সিল এ বিষয়ে রায় প্রদান,

খ. সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান।

গ. বিচার বিভাগীয় বিরোধের নিষ্পত্তি।

ঘ. ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী গ্রহণ ও রায় প্রদান।

আর্টিকেল ৬২

ক. 'সুপ্রীম সংবিধানিক কাউন্সিল'এর গঠন সংক্রান্ত নিয়ম পদ্ধতি, এর সদস্যগণের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের শর্তাবলী, পদচ্যুতি বা অবসর গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং কাউন্সিলের পরিচালন পদ্ধতি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

খ. উল্লেখিত আইন 'মজলিসে শুরা'র দু' তৃতীয়াংশ ভোটে নির্ধারিত হবে।

উলেমা কাউন্সিল

আর্টিকেল ৬৩

'উলেমা কাউন্সিল' নামে একটি সংস্থা থাকবে। শরীয়াহ্‌র জ্ঞানে গভীরভাবে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ, খোদাভীতি ও ধর্মপরায়ণতার জন্য খ্যাত এবং সমকালীন ইস্যুতে চ্যালেঞ্জ ও বিষয়াদিতে যাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে এমন সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উক্ত কাউন্সিলের সদস্য হবেন।

আর্টিকেল- ৬৪

'উলেমা কাউন্সিল'এর কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ :

ক. তাঁরা আইন সংক্রান্ত ইজতিহাদ পরিচালনা করবেন।

খ. 'মজলিসে শুরা'র নিকট উপস্থাপিত বিভিন্ন আইনগত প্রস্তাবের উপর শরীয়ার অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন।

গ. কোনরূপ কালক্ষেপণ না করে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের সাথে জড়িত বিষয়াদিতে সত্যকে তুলে ধরে কাউন্সিল তাদের সর্বোচ্চ নৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন।

আর্টিকেল ৬৫

'উলেমা কাউন্সিল' গঠনের বিধি, এর গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়াদি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ইলেকশন কমিশন

আর্টিকেল ৬৬

... সদস্যের সমবায়ে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী 'ইলেকশন কমিশন থাকবে।

আর্টিকেল ৬৭

কমিশনের কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ :

ক. আইনের বিধান মোতাবেক ইমাম, 'মজলিসে শুরা'র সদস্য ও অন্যান্য পদের নির্বাচনের আয়োজন ও তত্ত্বাবধান পরিচালনা করবে;

খ. গণভোট সংগঠন ও তত্ত্বাবধান করবেন;

গ. আইনের বিধান মোতাবেক প্রার্থীগণ যাতে যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ করেন তা নিশ্চিত করবে;

আর্টিকেল ৬৮

ক. ইলেকশন কমিশনের সদস্যবর্গ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ হতে নিয়োজিত হবেন।

খ. ইলেকশন কমিশনের সদস্য থাকাকালীন তিনি অন্যকোন পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

আর্টিকেল ৬৯

ইলেকশন কমিশন গঠনের রীতিপদ্ধতি নির্ধারিত হবে। নির্বাচন পদ্ধতি তত্ত্বাবধান, নির্বাচন এলাকা সুনির্দিষ্টকরণ, প্রার্থিতাপদ জমা দেবার পদ্ধতি, ভোট প্রদান পদ্ধতি, ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষণ ও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ইত্যাদি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আর্টিকেল ৭০

সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারী ইলেকশন কমিশনকে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সর্ববিধ সহায়তা প্রদান করবে এবং অন্যকোন কর্তৃপক্ষের মতামত ছাড়াই সরাসরি ও দ্রুত ইলেকশন কমিশনের আদেশ মান্য করিবে।

উম্মাহর একত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আর্টিকেল ৭১

সর্ববিধ উপায়ে উম্মাহর একত্ব ও সংহতির জন্য কাজ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আর্টিকের ৭২

বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় পরাণয়তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানব জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের নীতিমালার ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালিত হবে।

আর্টিকেল ৭৩

অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সকল নীতি, কর্মসূচি ও কার্য পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্র তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে কাজ করবে।

আর্টিকেল ৭৪

উপরন্তু, ইসলামী অনুশাসনের নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :

ক. সারাবিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণ,

খ. বিশ্বের যে কোন স্থানে জনগণের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিত হলে তার রোধ ও অপসারণের জন্য সংগ্রাম করা;

গ. স্রষ্টার উপাসনালয় সমূহের পবিত্রতা রক্ষা করা,

আর্টিকেল ৭৫

ক. ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র কোন প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত হবে না।

খ. স্বধর্মের বিশ্বাসের সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত ও আদর্শিক ঐক্য রক্ষা, বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষাবলম্বন; মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে।

আর্টিকেল ৭৬

ইসলামী রাষ্ট্র দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ ও তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কতিপয় রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ বা গোষ্ঠি বা গ্রুপ গঠনের বিরোধিতা করবে।

আর্টিকেল ৭৭

রাষ্ট্র নিজ ভূখণ্ড ও অধিক্ষেত্রীয় এলাকায় বিদেশী সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করবে না; যা নিজ রাষ্ট্র বা এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী হয়।

আর্টিকেল ৭৮

রাষ্ট্র শাব্দিক অর্থে ও অন্তর্নিহিত অর্থে আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহকে সম্মান ও বাস্তবায়ন করবে।

প্রচার মাধ্যম ও প্রকাশনা

আর্টিকেল ৭৯

প্রচার মাধ্যম ও প্রকাশনা সংস্থাসমূহ তাদের মত প্রকাশের বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্য তথ্যের প্রকাশ এবং ইসলামী মূল্যবোধ ও আচরণ বিধির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। দৈনিক পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী ইত্যাদি এ সীমারেখার মধ্যে প্রকাশনার অধিকার থাকবে। যুদ্ধের সময় ব্যতিত অন্য সময়ে আদালতের আদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী বা পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া যাবে।

আর্টিকেল ৮০

সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা সংস্থা সমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ :

ক. যার দ্বারাই সম্পাদিত হোক না কেন, সকল প্রকার নির্যাতিত, অবিচার, নিপীড়ন ইত্যাদি উৎঘাটন করাও প্রতিবাদ করা;

খ. মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করা এবং কারো ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ না করা;

গ. মানহানিকর বিষয় ও গুজব সৃষ্টি করা ও রটনা হতে বিরত থাকা;

ঘ. সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা, দৃঢ়তার সাথে মিথ্যা প্রচারণা হতে বিরত থাকা বা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করা অথবা সজ্ঞানে সত্যকে লুকিয়ে রাখা বা বিকৃত করা হতে বিরত থাকা।

ঙ. সুরুচিশীল ও মর্যাদাবান ভাষা ব্যবহার করা।

চ. সমাজে সু-আচরণ ও নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধন ঘটান;

ছ. কুরুচিশীল, অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয়ের প্রচারণা হতে কঠোরভাবে বিরত থাকা;

জ. ইসলাম বিরোধী অপরাধ বা কর্মকে ক্ষমার চোখে দেখা বা উৎসাহিত করা হতে বিরত থাকা;

ঝ. কোন প্রকার দুর্নীতির অস্ত্রে পরিণত হওয়া হতে বিরত থাকা;

সাধারণ ও অন্যান্য বিধান মালা

আর্টিকেল ৮১

হিজরী সন হবে রাষ্ট্রের সরকারী বর্ষপঞ্জী এবং রাষ্ট্রভাষা হবে....। যদি আরবী সরকারী ভাষা না হয়, তবে তা হবে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা।

আর্টিকেল ৮২

ক. ইমাম বা 'মজলিসে শুরা' সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব করতে পারবে না। মজলিসে শুরার দু'-তৃতীয়াংশ ভোটে সমর্থিত হলে সংশোধনী কার্যকর হবে।

খ. কোন সংশোধনী যদি রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র বিপন্ন করে বা শরিয়ার কোন বিধান লংঘন করে, তবে সে সংশোধনী বাতিল বলে গণ্য হবে।

আর্টিকেল ৮৩

ক. এই সংবিধান কার্যকর হবার পূর্ব পর্যন্ত আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য যে সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল তাদের কার্যাবলী চালু থাকবে এবং তাদের কার্যাবলী সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নতুন বিভাগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

খ. এই সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় যে সকল আইন, বিধান, নিয়ম বলবৎ ছিল তাদের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই সকল আইন, বিধান বা নিয়ম এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বাতিল বা সংশোধিত না হয়।

গ. এই সংবিধান গ্রহণের পর এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বর্তমানে বিদ্যমান আইনসভার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনসভা প্রথম 'মজলিসে শুরা', প্রথম 'ইলেকশন কমিশন' এবং প্রথম 'সুপ্রীম সাংবিধানিক কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার বা গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল ৮৪

সংশ্লিষ্ট সকলের আবশ্যিক কর্তব্য থাকবে যে, এই সংবিধানের বিধানাবলী দ্রুত কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় যাতে এ সংবিধান গ্রহণের পর অবিলম্বে সামগ্রিকভাবে এই সংবিধান কার্যকর হয়।

আর্টিকেল ৮৫

গণভোটের ফলাফল প্রকাশের দিন হতে (যদি গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হয়) অথবা দেশের সাংবিধানিক অন্যকোন সংস্থা কর্তৃক যে দিন সংবিধান গৃহীত হয় সেদিন হতে এ সংবিধান কার্যকর হবে।

দ্রষ্টব্য :

১. অথবা পার্লামেন্ট বা অন্যকোন যথাযথ সংস্থার প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক

২. এই সংবিধান অনুযায়ী কোন আইন শরীয়াহর পরিপন্থী হতে পারবে না। যখনই আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন আইন বলতে শরীয়াহ বোঝাবে তা শরীয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত বোঝাবে।

(সূত্র : ইসলামিক কাউন্সিল, A Model of an Islamic Constitution (লন্ডন : ইসলামিক কাউন্সিল, ১৯৮৩)।

পরিশিষ্ট - গ ঃ মুসলিম বিশ্বের চিত্র

ছক 'সি' ঃ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের গেজেটিয়ার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
দেশ	এলাকা (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা (১৯৯২)	জিডিপি (মার্কিন ডলার)	জনপ্রতি আয় (মার্কিন ডলার)	সামরিক ব্যয় (মার্কিন ডলার)	সেনাবাহিনী (১৯৯১) সামরিক ব্যয়	জিডিপি'র শতকরা হারে	সরকারের ধরন	বৈদেশিক ঋণ (মার্কিন ডলার)	রাষ্ট্রধর্ম
আফগানিস্তান	৬৫২,২২৫	২১,৪৫৩,৭৪১	৩ বিলিয়ন (১৯৯১)	২০০			-	অন্তর্বর্তীকালীন (১৯৯১)	২.৩ বিলিয়ন	ইসলাম
আলবেনিয়া	২৮,৭৫০	৩,২৮৫,২২৪	২.৭ বিলিয়ন (১৯৯১)	৮২০	১.০ বিলিয়ন (১৯৯১)	৪৮,০০০	-	গণতন্ত্র	৫০০ মিলিয়ন (১৯৯১)	নেই
আলজেরিয়া	২,৩৮১,৭৪০	২৬,৬৬৬,৯২১	৫.৪ বিলিয়ন (১৯৯০)	২,১৩০	৮৬৭ মিলিয়ন (১৯৯২)	১২৫,০০০	১.৮	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	২৬.৪ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
আজারবাইজান	৮৬,৬০০	৭,৪৫০,৭৮৭	-				-	রিপাবলিক		নেই
বাহরাইন	৬৯৩,১৫	৫৫১,৫১৩	৪ বিলিয়ন (১৯৯১)	৭,৫০০	১৯৪ মিলিয়ন (১৯৯০)	১০৫,৫৮৭	৬	রাজতন্ত্র	১.১ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
বাংলাদেশ	১৪৪,০০০	১১৯,৪১১,৭১১	২৩.১ বিলিয়ন (১৯৯১)	২০০৩	৩৯ মিলিয়ন (১৯৯২)	১০৬,৫০০	১.৫	সংসদীয় গণতন্ত্র	১১.১ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
বেনিন	১১২,৬২০	৪,৯৯৭,৫৯৯	২ বিলিয়ন (১৯৯১)	৪১০	২৯ মিলিয়ন (১৯৮৮)	১২,০০০	১.৭	রিপাবলিক		নেই
বসনিয়া	৫১,২৩৩	৪,৩৬৪,০০০	১৪ বিলিয়ন (১৯৯১)				-	গণতন্ত্র	-	ইসলাম
ব্রুনাই	৫,৭৭০	২৬৯,৩১৯	৩.৫ বিলিয়ন (১৯৯০)	৮,৮০০	২৩৩.১ মিলিয়ন (১৯৮৮)	৪,২৫০	৭.১	রাজতন্ত্র	নেই	ইসলাম

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বারকিনা ফাসো	২৭৪,২০০	৯,৬৫৩,৬৭২	২.৯ বিলিয়ন (১৯৯১)	৩২০	৫৫ মিলিয়ন (১৯৮৮)	৮,৭০০	২.৭	সামরিক	৯৬২ মিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
ক্যামেরুন	৪৭৫,৪৪০	১২,৬৫৮,৪৩৯	১১.৫ বিলিয়ন (১৯৯০)	১০৪০	২১৯ মিলিয়ন (১৯৯০)	৬,৬৬০	১.৭	রাষ্ট্রপতি শাসিত	৪.৯ বিলিয়ন (১৯৮৯)	-
চাদ	১,২৮৪,০০০	৫,২৩৮,৯০৮	১ বিলিয়ন (১৯৮৯)	২০৫	৩৯ মিলিয়ন (১৯৮৮)	১৭,২০০	৪.৩	রিপাবলিক	৫৩০ মিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
কমোরস	২,১৭০	৪৯৩,৮৫৩	২৬০ মিলিয়ন (১৯৯১)	৫৪০			-	রিপাবলিক (১৯৯১)	১.৯৬ মিলিয়ন	ইসলাম
জিবুতি	২২,০০০	৩৯০,৯০৬	৩৪০ মিলিয়ন (১৯৮৯)	১০০০	২৯.৯ মিলিয়ন (১৯৮৬)	২,৭৭০	-	রিপাবলিক	৩৫৫ মিলিয়ন (১৯৯০)	-
মিশর	১,০০১,৪৫০	৫৬,৩৬৮,৯৫০	৩৯.২ বিলিয়ন (১৯৯০)	৭২০	২.৫ মিলিয়ন (১৯৯১)	৪২০,০০০	৬.৪	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	৩৮ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
ইরিত্রিয়া	৯৩,৬৭৯	২,৬১৪,৬৯৯	-				-	-	-	-
গাম্বিয়া	১১,৩০০	৯০২,০৮৯	২০৭ মিলিয়ন (১৯৯১)	২৩৫	১.০৪ মিলিয়ন (১৯৯১)	৯০০	০.৭	রিপাবলিক	৩৩৬ মিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
গিনি	২৪৫,৮৬০	৭,৭৮৩,৯২৬	৩ বিলিয়ন (১৯৯০)	৪১০	২৯ মিলিয়ন (১৯৮৮)	৯,৭০০	১.২	একদল শাসিত রিপাবলিক	৩৩৬ মিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
গিনি বিসাউ	৩৬,১২০	১,০৪৭,১৩৭	১৬২ মিলিয়ন (১৯৮৯)	১৬০	৯.৩ মিলিয়ন (১৯৮৭)	৭,২০০	৫.৬	রিপাবলিক	৪৬২ মিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
ইন্দোনেশিয়া	১,৯১৯,৪৪০	১৯৫,৬৮৩,৫৩১	১২২ বিলিয়ন (১৯৯১)	৬৩০	১.৭ বিলিয়ন (১৯৯১)	২,৭৮,০০০	২.০	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	৫৮.৫ বিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
ইরান	১,৬৪৮,০০০	৬১,১৮৩,১৩৮	৯০ বিলিয়ন (১৯৯১)	১,৫০০	১৩ বিলিয়ন (১৯৯১)	৫২৮,০০০	১৪-১৫	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	১০ বিলিয়ন (১৯৯০)	ইসলাম

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ইরাক	৪৩৬,২৪৫	১৮,৪৪৫,৮৪৭	৩৫ বিলিয়ন (১৯৯১)	১,৪০	-	৩৮২,০০০	-	একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসিত	৪৫ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
জর্ডান	৯১,৮৮০	৩,৫৫৭,৩০৪	৩.৬ বিলিয়ন (১৯৯১)	১,১০০	৪০৪ মিলিয়ন (১৯৯০)	১০১,৩০০	৯.৫	রাজতন্ত্র	৯ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
কাজাখস্থান	২,৭১৭,৩০০	১৭,১০৩,৯২৭	-	-	-		-	রিপাবলিক	-	নেই
কুয়েত	১৭,৮২০	১,৩৭৮,৬১৩	৮.৭৫ বিলিয়ন (১৯৯১)	৬,২০০	৯.১৭ বিলিয়ন (১৯৯২)	৮,২০০	২০.৪	রাজতন্ত্র	৯.২ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
কিরগিজস্থান	১৯৮,৫০০	৪,৫৬৭,৮৭৫	-	-	-		-	রিপাবলিক	-	নেই
লেবানন	১০,৪০০	৩,৪৩৯,১১৫	-	১,৪০০	২৭১ মিলিয়ন (১৯৯২)	১৮,৮০০	৮.২	রিপাবলিক	৯০০ মিলিয়ন (১৯৮৭)	নেই
লিবিয়া	১,৭৫৯,৫৪০	৪,৪৮৪,৭৯৫	২৮.৯ বিলিয়ন (১৯৯০)	৬,৮০০	১.৭ বিলিয়ন (১৯৮৯)	৮৫,০০০	-	একনায়ক রাষ্ট্রপতি শাসিত	৩.৫ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
মালয়েশিয়া	৩২৯,৭৫০	১৮,৪১০,৯২০	৪৮ বিলিয়ন (১৯৯১)	২৬৭০	২.৪ বিলিয়ন (১৯৯২)	১২৭,৯০০	৫	সংসদীয় গণতন্ত্র	২১.৩ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
মালদ্বীপ	৩০০	২৩৪,৩৭১	১৭৪ মিলিয়ন (১৯৯০)	৭৭০	১.৮ মিলিয়ন (১৯৮৪)		-	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	৭০ মিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
মালি	১,২৪০,০০০	৮,৬৪১,১৭৮	২.২ বিলিয়ন (১৯৯০)	২৬৫	৪১ মিলিয়ন (১৯৮৯)	৭,৩০০	২	রিপাবলিক	২.২ মিলিয়ন (১৯৮৯)	নেই
মৌরিতানিয়া	১,০৩০,৭০০	২,০৫৯,১৮৭	১.১ বিলিয়ন (১৯৯১)	৫৩৫	৪০ মিলিয়ন (১৯৯১)	১১,১০০	৪.২	রিপাবলিক	১.৯ বিলিয়ন (১৯৯০)	ইসলাম
মরক্কো	৭১০,৮৫০	২৬,৭০৮,৫৮৭	২৭.৩ বিলিয়ন (১৯৯১)	১,০৬০	১.১ বিলিয়ন (১৯৯২)	১৯৫,৫০০	৪.২	দ্বৈত শাসন	২০ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নাইজার	১,২৬৭,০০০	৮,০৫২,৯৪৫	২.৪ বিলিয়ন (১৯৯১)	৩০০	২৭ মিলিয়ন (১৯৮৯	৩,২০০	১.৩	সামরিক	১.৮ বিলিয়ন (১৯৯০)	সেই
নাইজেরিয়া	৯২৩,৭৭০	১২৬,২৭৪,৫৮৯	৩০ বিলিয়ন (১৯৯১)	২৫০	৩০০ মিলিয়ন (১৯৯০)	৯৪,৫০০	১	সামরিক	৩২ বিলিয়ন (১৯৯১)	নেই
ওমান	২১২,৪৬০	১,৫৮৭,৫৮১	১০.৬ বিলিয়ন (১৯৮৯)	৬,৯২৫	১.৭৩ বিলিয়ন (১৯৯২)	৩০,৪০০	১৬	রাজতন্ত্র	৩.১ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
পাকিস্তান	৮০৩,৯৪০	১২১,৬৬৪,৫৩৯	৪৫.৪ বিলিয়ন (১৯৯১)	৩৮০	২.৯ বিলিয়ন (১৯৯২)	৫৬৫,০০০	৬	সংসদীয়	২০.১ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
কাতার	১১,০০০	৪৮৪,৩৮৭	৭.৪ বিলিয়ন (১৯৯০)	১৫,০০০	-	৭,৫০০	-	রাজতন্ত্র (১৯৮৯)	১.১ বিলিয়ন	ইসলাম
সৌদিআরব	২,২৪০,০০০	১৭,০৫০,৯৩৪	১০৪ বিলিয়ন (১৯৯০)	৫,৮০০	১৪.৫ বিলিয়ন (১৯৯২)	৭৬,৫০০	১৩	রাজতন্ত্র	১৮.৯ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
সেনেগাল	১৯৬,১৯০	৮,২০৫,০৫৮	৫ বিলিয়ন (১৯৯১)	৬১৫	১০০ মিলিয়ন (১৯৯১)	৯,৭০০	২	একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসিত	২.৯ বিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
সিয়েরালিওন	৭,৭৪০	৪,৪৫৬,৭৩৭	১.৪ বিলিয়ন (১৯৯১)	৩৩০	৬ মিলিয়ন (১৯৮৮)	৩,১৫০	০.৭	সামরিক	৫.৭২ মিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
সোমালিয়া	৬৩৭,৬৬০	৭,২৩৫,২২৬	১.৭ বিলিয়ন (১৯৮৮)	২১০	-	৬৪,৫০০	-	- (১৯৮৯)	১.৯ বিলিয়ন	ইসলাম
সুদান	২,৫০৫,৮১০	২৮,৩০৫,০৪৬	১২.১ বিলিয়ন (১৯৯১)	৪৫০	৬১০ মিলিয়ন (১৯৮৯)	৭১,৫০০	৭.২	আধা সামরিক	১৪.৬ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
সিরিয়া	১৮৫,১৮০	১৩,৭৩০,৪৩৬	৩০ বিলিয়ন (১৯৯১)	২৩০০	২.৫ বিলিয়ন (১৯৮৯)	৪০৪,০০০	৮	একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসিত রিপাবলিক	১৪.৬ বিলিয়ন ৯১৯৯১)	ইসলাম
তাজিকিস্তান	১৪৩,১০০	৫,৬৮০,২৪২	-	-	-	-	-		-	নেই

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
তানজানিয়া	৯৪৫,০৯০	২৭,৭৬১,৫৫২	৬.৯ বিলিয়ন (১৯৯১)	২৬০	১১৯ মিলিয়ন (১৯৮৯)	৪৬,৮০০	২	রিপাবলিক	৫.২ বিলিয়ন (১৯৯১)	নেই
তিউনেশিয়া	১৬৩,৬১০	৮,৪৪৫,৬৫৬	১০.৯ বিলিয়ন (১৯৯১)	১,৩২০	৫২০ মিলিয়ন (১৯৯২)	৩৫,০০০	৫	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	৮.৬ বিলিয়ন (১৯৯১)	ইসলাম
তুরস্ক	৭৮০,৫৮০	৫৯,৬৪০,১৪৩	১৯৮ বিলিয়ন (১৯৯১)	৩,৪০০	৫.২ বিলিয়ন (১৯৯২)	৫৭৯,২০০	৩.৪	সীমিত রাষ্ট্রপতি শাসিত	৪৯ বিলিয়ন (১৯৯০)	নেই
তুর্কমেনিস্তান	৪৮৮,১০০	৩,৮৩৮,১০৮						রিপাবলিক		নেই
ইউ.এ.এমিরেটস	৮৩,৬০০	২,৫২৭,৩১৩	৩৩.৭ বিলিয়ন (১৯৮৯)	১৪,১০০	১.৪৭ বিলিয়ন (১৯৮৯)	৪৪,০০০	৫.৩	রাজতন্ত্র	১১.৯ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম
উজবেকিস্তান	৪৪৭,৪০০	২১,৬২৬,৭৮৪						রিপাবলিক (১৯৮৯)	১১.৯ বিলিয়ন	নেই
ইয়েমেন	৫২৭,৯৭০	১০,৩৯৪,৭৪৯	৫.৩ বিলিয়ন (১৯৯০)	৫৪৫	১.০৬ বিলিয়ন (১৯৯১)	৬৫,০০০	২০	রিপাবলিক	৫.৭৫ বিলিয়ন (১৯৮৯)	ইসলাম

তথ্যপঞ্জি

১. ইসলাম, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মুসলিম বিশ্ব

১. Secularism শব্দটি ল্যাটিন Seaculum শব্দ হতে এসেছে, যার অর্থ যুগ বা প্রজন্ম। কিন্তু খ্রিস্টান ল্যাটিনে এর অর্থ ইহজগত। Laicism শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Laos (জনগণ) এবং Laikos হতে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, Eric S. Waterhouse, *Secularism; Encyclopedia of Religion and Ethics* (Edinburgh : T&T Clark, 1954) Vol. xi পৃ: ৩৪৭-৫০।

১. Owen Chadwick, *'The secularization of the European Mind* (ক্যাম্বব্রিজ : ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫)।

৩. Irving M. Zeitlin, *'Ideology and the Development of Sociological Theory,'* (নিউজার্সী: প্রেনটিস হল ইনক, ১৯৬৮); পৃ ৩-৭।

৪. John Stuart Mill, 'On Liberty', চডইউক কর্তৃক উদ্বৃত, The Secularization of European Mind, পৃ. ২৭

৫. প্রাগুক্ত।

৬. Altaf Gauhar *'Islam and Secularism',* আলতাফ গওহর সম্পাদিত, The Challenge of Islam (লন্ডন, ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ), ১৯৭৮) পৃ: ৩০২

৭. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৭৪, ভলিউম- ৯, পৃ: ৫২৩; প্রাগুক্ত উদ্ধৃত পৃ: ৩০০।

৮. ডব্লিউ, সি, স্মিথ, *'Pakistan as an Islamic State,* (লাহোর, আশরাফ, ১৯৫৪), পৃ: ৪৯।

৯. কার্ল বেকার, *'The Heavenly City of the Eighteen Century Philosophers',* (নিউ হ্যাভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩২), পৃ: ৩১।

১০. কার্ল মার্ক্স এন্ড ফ্রেডরিক এনজেল্‌স, *'Manifesto of Communist Party'* (নিউ ইর্য়ক, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিসার্স, ১৯৪৮), পৃ: ১১

১১. Chadwick, *'The Secularization of European Mind,* পৃ: ৬৬।

১২. মার্ক এনজেল্‌স, *'On Religion'* মস্কো, প্রগরেস পাবলিসার্স, ১৯৫৭); পৃ: ৮৩

১৩. কার্ল মার্ক্স এন্ড ফ্রেডেরিক এনগেল্‌স, *Collected Works,* Vol. II (লন্ডন; লরেন্স এন্ড উইশার্ট, ১৯৭৫), পৃ: ১৭৬

১৪. Karl R. Popper *'The Open Society and Its Enemies,* Vol. II (লন্ডন : রুলেজ এন্ড কেগান পল, ১৯৬২) পৃ: ২৫৫

১৫. Alan Bullock and Oliver Stallybrass, *'The Harper Dictionary of Modern Thought* (নিউইয়র্ক, হার্পার এন্ড রো, ১৯৭৭), পৃ: ৫৪৬

১৬. PB. Gajendragadkar *'The Concept of Secularism, Secular Democracy,* (নিউ দিল্লি, সাপ্তাহিক), বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৭০; পৃ: ১।

১৭. R Grothuysen, *'Secularism';* এডউইন আর এ, সেলিগম্যান সম্পাদিত, *'Encyclopedia of Social Science',* (নিউ ইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৫৪), ভলিউম VIII, পৃ: ৬৩।

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam'* (লাহোর, আশরাফ, ১৯৭১), পৃ: ১৫৫।

২০. ওয়াটার হাউজ, *'Secularism',* পৃ: ৩৪৯।

২১. ইকবাল, *'The Reconstruction of Religious' Thought,* পৃ: ১৫৪।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. দ্রষ্টব্য, ক্রেইন ব্রিন্টন, *'The Shaping of Modern' Thought* (নিউজার্সী, প্রেনটিস-হল, ১৯৬৩)।

২৪. এস এম নকব আল আত্তাস, *'Islam, Secularism and the Philosophy of Future'* (লন্ডন, ম্যানসেল, ১৯৮৫) পৃ: ৯৫

২৫. ইহা বেলজিয়ান ইতিহাসবিদ Henri Pirenne এর থিসিস, প্রাগুক্ত উদ্ধৃত, পৃ: ৯৫

২৬. *'Questions Diplomatique et Colonials,* ১৫ মে, ১৯০১, পৃ: ৫৮৮; মারওয়ান আর বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত *'Colonial Scholarship and Muslim Revivalism in 1900', Arab Studies Quarterly,* ভলিউম- ৪, সংখ্যা ১ ও ২; ১৯৮২, পৃ: ৫

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

২৮. দ্রষ্টব্য, D.K Hingoram, *'Education in India Before and After Independence', Education Forum,* ভলিউম-১৯, নং ২, ১৯৭৭, পৃ: ২১৮-১৯।

২৯ প্রাগুক্ত।

৩০. দ্রষ্টব্য, W.A.J. Archibold, *'Outlines of Indian Constitutional History',* (লন্ডন, কার্জন প্রেস, ১৯২৪); পৃ: ৭৩।

৩১. A. Balis Fabunwa, *'History of Education in Nigeria',* (লন্ডন, এলেন এন্ড আনউইন, ১৯৭৪) পৃ: ১০৩।

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. জওহরলাল নেহেরু, *'Towards Freedom,'* (নিউইয়র্ক, জন ডে, ১৯৪১), পৃ: ২৬৪

৩৪. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী, *'Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan'* (মেরীল্যান্ড, International Institute of Islamic Thought, ১৯৮২), পৃ: ৫

৩৫. জে.এন. রোজমেন সম্পাদিত, *International Politics and Foreign Affairs'* (লন্ডন, *Collier Macmillan,* ১৯৬৯); পৃ: ২৭
৩৬. গওহর, *'Islam and Secularism'* পৃ: ৩০৩

২. ইসলামে রাজনীতি

১. ডোনাল্ড ইউজীন স্মীথ, *'Religion and Political Development,* (বোস্টন, লিটল ব্রাউন, ১৯৭০) পৃ: ৫৯
২. E.E. Schattschneider *'Two Hundred Million Americans in Search of a Government,'* (নিউইয়র্ক; হোল্ট, রাইনহার্ট এবং উইনস্টন, ১৯৬৯, পৃ: ৮
৩. বার্ণার্ড ক্রীক, *'In Defence of Politics'* (লন্ডন: পেলিকান বুকস, ১৯৬৪), পৃ: ১৬
৪. এরিস্টটল, *'The Ethics;* অনুবাদ: জে.এ.কে. থমসন (ইংল্যান্ড পেনগুইন বুকস, ১৯৫৩) পৃ: ৪৪
৫. আর্নেস্ট বার্কার *'The Politics of Aristotle'* (নিউইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৮) পৃ: ১৯৫৪-৬।
৬. Julius Gould and Willium L. Koll সম্পাদিত *'A Dictionary of Social Science'* (নিউ ইয়র্ক, ফ্রী প্রেস, ১৯৬৫) পৃ: ৪।
৭. Willium T. Bluhm, *'Theories of the Political System'* (ঈগরউড ক্লিফ্স, এন.জে প্রেনটিস হল, ১৯৭০) পৃ: ৬।
৮. Robert A. Dahl *'Modern Political Analysis,* (ঈগলউড ক্লীফস, এন.জে; প্রেনটিস হল, ১৯৭০) পৃ: ৬।
৯. ডেভিড ইস্টন, *'The Political System,'* নিউইয়র্ক,, আলফ্রেড এ, নফ, ১৯৫৩), পৃ: ১৩৪।
১০. এলান সি আইজ্যাক, *'Scope and Methods of Political Science; An Introduction to the Methodology of Political Inquiry'* (হোমউড, ইলিনয়েস, দি ডরসি প্রেস), ১৯৭৫), পৃ: ২১।
১১. হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, *'Politics: Who Gets What, When, How'* (ক্লীভল্যান্ড, ওয়ান্ড পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৫৮।
১২. এলান বুলক ও অলিভার স্টেলিব্রাস সম্পাদিত *'The Harper Dictionary of Modern Thought'* (নিউইয়র্ক, হার্পার এন্ড রো, ১৯৭৭), পৃ: ৪৯০
১৩. ব্রার্ট্রান্ড দ্য জুভিনাল, *'Power : The Natural History of Its' Growth;* অনুবাদ : জে. এফ. হান্টিংটন (লন্ডন, হাচিনসন, ১৯৪৮)
১৪. বার্নার্ড ক্রীক, *'In Defence of Politics,* পৃ: ১৬
১৫. হামিদ এনায়েত, *Modern Islamic Political Thought,* (লন্ডন, ম্যাকমিলান, ১৯৮২) পৃ: ২

১৬. আবুল আলা মওদূদী, *'Towards Understanding Islam'*, অনুবাদ, খুরশীদ আহমদ (লন্ডন, ইলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃ: ৮৮
১৭. ইউসুফ ইবনে আবদ আল বার আল কুরতুবী, *'জামি বায়ান আল ইলম ওয়া ফাডলুহ'*, (মদিনা : আল মাকতাবাহ্ আল ইলমিয়াহ্) ভলিউম- ১; পৃ: ৬২
১৮. ইবনে কুতায়বাহ, 'ইউয়ুন আল আকবার' ভলিউম-১; বার্নার্ড লুইস কর্তৃক সম্পাদিত *'Islam From the Prophet Muhammad to the Capture of Constantipole'* (লন্ডন, দি ম্যাকমিলান প্রেস লি:, ১৯৭৬), ভলিউম-১; পৃ: ১৮৪
১৯. জি.এইচ. জ্যানসেন, *'Militant Islam'* (লন্ডন, প্যান বুকস, ১৯৭৯), পৃ: ১৭
২০. স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam'* (লাহোর, শেখ মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭১), পৃ: ১৫৪
২১. Marshall Hodgson, *'The Venture of Islam Conscience and History in A World of Civilization'* (শিকাগো, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৪), ভলিউম-১।
২২. আদর্শ খিলাফত হতে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র বিবর্তনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, "খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত' (লাহোর, তারজুমান আল কুরআন, ১৯৭৫)
২৩. S.D.B. Goitein; *'Studies in Islamic Religious and Political Institutions,'* লেইডেন: ই.জে. ব্রীল, ১৯৬৮) পৃ: ২০৫-৬।
২৪. Manfred Halpern, *'The Politics and Social Change in the Middle East and North Africa'* (প্রিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩) পৃ: ১১।
২৫. ডব্লিউ. সি. স্মীথ, *'On Understanding Islam; Selected Studies'*(দি হেগ, মুটন, ১৯৮১) পৃ: ২০২।
২৬. ই.আই.জে রোজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam'* (ক্যামব্রীজ, ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮) পৃ: ১৮১
২৭. জে.জে. সন্ডারসন, *'A History of Medieval Islam'* (লন্ডন : রুলেজ এন্ড কেগান পল, ১৯৮০), পৃ: ১৭১।
২৮. জামিল এ আবু নসর, *'A History of the Maghreb,* (লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫), পৃ: ৯২-১০৩; সি.ই. বসওয়ার্থ, *'The Islamic Dynastics* (এডিনবার্গ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪), পৃ: ৪০৪-২৪।
২৯. রজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam,* পৃ: ৩৯।
৩০. *'Islamic Political Thought'* গ্রন্থে এ.কে.এম ল্যাম্বটন মুসলিম চিন্তাবিদগণকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন। Joseph Schacht এবং C.E. Bosworth সম্পাদিত *'The Legacy of Islam'* (লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪) পৃ: ৪০৪-২৪।

৩১. এইচ.এ.আর. গীব, *Constitutional Organization';* মজীদ খাদ্দুরী এবং এইচ জে লীবস্নে সম্পাদিত *Law in the Middle East : Origin and Development of Islamic Law* (ওয়াশিংটন ডিসি, The Middle East Institute, ১৯৫৬) পৃ: ১২-১৩।

৩২. ইবনে খালদুন, *'The Muqaddimah, An introduction to History;* অনুবাদ: এফ রজেনথাল, সম্পাদনা: এন.জে.দাউদ (প্রিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১) পৃ: ১৫৫।

৩৩. খুরশীদ আহমদ, *'The Nature of Islamic Resurgence';* জন. এল. এসপোসিটো সম্পাদিত *'Voice of Resurgent Islam'* (নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩) পৃ: ২১৯-২০।

'তাজদীদ' অর্থ পুনর্জীবন; কোরান ও সুন্নাহর মূলচেতনায় ফিরে যাওয়া।

৩৪. সংস্কৃতিকরণ ক্যাটাগরী আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও পশ্চিমা এই তিন ভাগে বিভক্ত। Yvonne Yazbeek Haddad ও *'Contemporary Islam and the Challenges of History'* (এলবানী State University of New York Press, ১৯৮২), পৃ: ৭-১১।

৩৫. ডাব্লিউ সি. স্মীথ *'Islam in Modern History'* (প্রিন্সটন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭), পৃ: ৬০।

৩৬. সাইয়েদ হুসেইন নসর, *'Ideals and Realities of Islam'* (বোস্টন, বেকন প্রেস, ১৯৭২)।

৩৭. ই.আই.জে. রজেনথাল, 'Islam in the Modern National State (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫) পৃ: ৮৯

৩৮. আলী আবদ আল রাযীক, *'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম'* (বৈরুত, আল হায়াত লাইব্রেরী, ১৯৬৬), পৃ: ৮৩

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ:- ১১৮

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৩

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ- ১২-১৭

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮২

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ২০১

৪৪. এনায়েত, *'Modern Islamic Political Thought'*, পৃ: ৬৮।

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. রজেনথাল, *'Islam in Modern National State'*, পৃ: ১০০।

৪৭. Malcolm Kerr, Islamic Reform অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬), পৃ: ২০৮

৪৮. হাদ্দাদ, *'Contemporary Islam and the Challenge of History'* পৃ: ১১। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যদের নব্য আদর্শবাদী বলে অভিহিত করেছেন। এতে যুক্ত করেছেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও জামাতে ইসলামের সদস্যদের। ইসমাইল আর আল ফারুকী, সাইয়েদ হুসাইন নসর, খুরশীদ আহমদ, নওয়াব হায়দার নকবীও এই শ্রেণীভুক্ত।

৪৯. ফজলুর রহমান, *'Roots of Islamic Neo-Fundamentalism'*; ফিলিপ এইচ. স্টোডার্ড, ডেভিস সি কাহেল এবং মার্গারেট সুলিভান সম্পাদিত *'Change and the Muslim World'* (সাইরাকিউজ; সাইরাকিউজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১) পৃ: ৩৫

৫০. মুহাম্মদ ইকবাল, *'Presidential Address'*. এস.এ.ওয়াহিদ সম্পাদিত *'Thoughts and Reflections of Iqbal'* (লাহোর আশরাফ, ১৯৬৪). পৃ. ১৬৭

৫১. প্রাগুক্ত; পৃ: ১৫৪

৫২. এনায়েত, *'Modern Islamic Political' Thought*, পৃ: ৩

৫৩. রজেনথাল, *Political Thought in Medieval Islam*, পৃ: ৩৯

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ ইসলামী প্রয়োগ প্রণালী

১. এস.জে. এলডার্সভেলড, 'Research in Political Behaviour'; এস. সিডনী সম্পাদিত *'Introductory Reading in Political Behavior'* (শিকাগো, র‍্যান্ড ম্যাকনেলী এন্ড কোং, ১৯৬১); R.A. Dahl 'The Behaviourial Approach in Political Science Epitaph for a Monument to a Successful Protest', American Political Science Review 55 (ডিসেম্বর, ১৯৬১); ডেভিড ইস্টন, The Current Meaning of Behaviouralism', জে. সি. চার্লসওয়ার্থ সম্পাদিত 'Contemporary Political Analysis (নিউইয়র্ক: ফ্রী প্রেস, ১৯৬৭); অষ্টিন রেনী সম্পাদিত *Essays on the Behaviourial Study of Politics* (অবতারণা, ইলিনয়েস, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েস প্রেস, ১৯৬২)।

২. Neil Reimer, *'The Revival of Democratic Theory'* (নিউইয়র্ক: এপলিটন সেঞ্চুরি-ক্রফটস, ১৯৬১), পৃ: ১

৩. ডেভিট ইস্টন, 'The Decline of Modern Political Theory'; James A Gould এবং Vincents V. Thursby ও ভিনসেন্ট ভি. মার্সবী সম্পাদিত *'Contemporary Political Thought'* (নিউইয়র্ক; হোল্ট, রেইনহার্ট ও উইনসটন, ১৯৬৯), পৃ: ৭৬৬।

৪. প্রাগুক্ত

৫. Dahl, *'The Behaviourial Approach in Political Science'* পৃ:৭৬৬।

৬. যারা রাজনীতিতে পূর্বে ব্যবহারিক পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন তারাও পরে বিষয়টি উপলব্ধি করেন। Michael Haas এবং Henry S. kariel সম্পাদিত *'Approaches to Political Science'* (ক্যালিফোর্নিয়া, স্যান্ডলার, ১৯৭০)।

৭. এস.এইচ.নসর, *'Islam and Plight of Modern Man* (লন্ডন : লংম্যান, ১৯৭৫), 'Science and Civilization in Islam (ক্যামব্রীজ মাস, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮)।

৮. এ.এইচ.এ, নদভী, Religion and Civilization' লখনৌ, Academy of Islamic Research, ১৯৭০) পৃ: ৬২-৭০।

৯. মুসলিম দর্শনে তাদের অবদানের জন্য দেখুন এম.এম. শরীফ সম্পাদিত, A History of Muslim Philosophy (ওয়েসব্যাডেন: অটো হ্যাসারোউইটজ, ১৯৬৩)।

১০. এরউইন আই.জে. রজেনথাল, Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline' (ক্যামব্রিজ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২), পৃ: ১৬

১১. আল মাতুরিদি, এম এম শরীফ সম্পাদিত, *'A History of Muslim Philosophy,* পৃ: ২৬৩

১২. Robert Griffault, The Making of Humanity'। মোহাম্মদ ইকবালের, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam'* এ উদ্ধৃত (লাহোর মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭১) পৃ: ১২৯-৩০

১৩. মার্শাল বি. ক্লিনার্ড *'The Sociologists Quest for Respectability',* The Sociological Quaterly 7 (১৯৬৬), পৃ: ৩৯৯-৪১২

১৪. Irwin Deutscher, *'Words and Deeds Social Science and Social Policy' Social Problems* ১৩ (১৯৬৬), পৃ: ২৪১

১৫. এ. ইউসুফ আলী, *The Holy Qur'an : Text, Translation, Commentary* (লেইসেসটার, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৫), পৃ: ১৬০৩

১৬. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন বার্নার্ড ক্রিক, In Defence of Politics (লন্ডন : পেলিকান বুকস, ১৯৬৪); পৃ: ১৬

১৭. ইউসুফ ইবনে আবদ আল বারিয়াল কুরতুবী, *'জামী বায়ান আল ইলম ওয়া ফাদলিহ'* মেদিনা; আল মাকতাবাহ আল-ইলমিয়া) পৃ: ৬২

১৮. আলী ইবনে মোহাম্মদ আল মাওয়ার্দী, *'আল আহকাম আল- সুলতানিয়াহ'* (কায়রো: ইছা আল বাবী আল হালাবী, ১৯৬০); পৃ: ৫

১৯. রজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam'* পৃ: ১৪

২০. কমরুদ্দিন খান, *'The Political Thought of Ibn Taymiyyah* (লাহোর ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩) পৃ: ২৯

২১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *The Islamic Law and Constitution'* অনুবাদ: খুরশীদ আহমদ (লাহোর: ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ১৯৬৭), পৃ: ২৪৮

২২. এম. ইকবাল *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam'* পৃ: ১৫৫

২৩. ইসমাইল রাজী আল ফারুকি, *'Tawhid: Its Implications for Thought and Life'* (হার্নডন, International Institute of Islamic Thought, ১৯৮২) পৃ: ১৫৩

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. ডেভিড ইস্টন, *'The New Revolution in Political Science'*, The American Political Science Review, ৬৩ (ডিসেম্বর ১৯৬৯) পৃ: ১০৫১-৬১

২৬. খ্রীস্টীয়ান বে, *'Politics and Pseudopolitics A critical Evalution of some Behavioral Literature'*, হেইনজ ইউলাউ সম্পাদিত Behaviouralism in Political Science (নিউইয়র্ক: এমারর্টন প্রেস, ১৯৬৯), পৃ: ১১৭

২৭. এস. এম নকীব আল আত্তাস, *Islam and Secularism* (কুয়ালালামপুর, মুসলিম ইয়থ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া, ১৯৭৮), পৃ: ১২৭-১২৮।

২৮. জিয়া উদ্দিন সরদার সম্পাদিত *'The Touch of Midas* (ম্যানচেস্টার, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪)

২৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *'Towards Understanding Islam'*, অনুবাদ খুরশীদ আহমদ (লন্ডন : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০) পৃ: ৮৮

৩০. এফ. রোজেনথাল, Knowledge Triumphant' (লেইডেন; ই.জে. ব্রীল, ১৯৭০)। এই গ্রন্থটি ইসলামী প্রেক্ষিতে লিখিত হয়েছে এবং এ'তে ইসলামী জ্ঞানের বিষয়ে প্রভূত তথ্য রয়েছে; মুসলিম পণ্ডিতদের ৮৭টি সংজ্ঞার তালিকা রয়েছে।

৩১. আল গাজ্জালী, *'The Book of knowledge'* অনুবাদ : নাবিহ্ এ. ফারিস (লাহোর : আশরাফ, ১৯৬৩)।

৩২. সাইয়েদ কুতুব, 'This Religion of Islam' (গ্যারী, ইন্ডিয়ানা International Islamic Federation of Student Organisations) পৃ: ৬৫।

৩৩. মহসিন মাহদী, *Ibn Khaldun's Philosophy of History'* (শিকাগো, দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৬৪); ফ্রানজ রোজেনথাল সম্পাদিত *'The Muqaddimah* (প্রিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭)।

৪. শরীয়াহ্ ঃ ইসলামী আইন ব্যবস্থা

১. খুররম মুরাদ, *'Shariah The Way to God'* (লেইসেসটার, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১) পৃ: ৩

২. আয়ারডেল জেনকিন্স, *'Social Order and Limits of Law : A Theoretical Essay'* (পিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮০) পৃ: ৩৫

৩. আনোয়ার আহমেদ কাদরী, *'Islamic Jurisprudence in the Modern World'.* (দিল্লী, তাজ কোম্পানী, ১৯৮৬), পৃ: ৩২।

৪. আবদ আল-করিম জাইদান, 'আল-মাদখাল-লি-দিরাসাত আল শরীয়াহ আল ইসলামিয়া, (বৈরুত, মুয়াসাসাহ রিসালাহ, ১৯৮৫) পৃ: ৬২-৯।

৫. হাম্মুদাহ্ আবদ আল আলী, *'The Family Structure in Islam'*, (লেগোস, ইসলামিক পাবলিকেসন্স ব্যুরো, ১৯৮২) পৃ: ১৪।

৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *'Tafhim al Quran'* (লাহোর: ইদারাহ তারজুমান আল কুরান, ১৯৭৪); ভলিউম- ৪, পৃ: ৪৮৬-৭।

৭. মাহমুদ সালতুত, *'al-Islam wa al-Alaqat al-Duwaliyah fi al-Salam wa al Harb'* (কায়রো, আল জামিয়াহ আল আজহার, ১৯৫১) পৃ: ৫

৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *'The Islamic Law and Constitution'* অনুবাদ ও সম্পাদনা: খুরশীদ আহমদ (লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেসন্স লি: ১৯৬৭) পৃ. ৫৩

৯. আল কুরতুবী, *'al-Jamili-Ahkam al Quran'* (বৈরুত: Dar Jhya al-Turath al Arabi, ১৯৫৯) ভলিউম ১৬, পৃ. ১৬৩-৪

১০. মওদুদী, *'The Islamic Law and Constitution* পৃ. ৫৩

১১. আল কুরতুবী, *'al-Jami li-Ahkam al- Quran'* ভলিউম- ২, পার্ট- ৪, পৃ. ৪৩; আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আল তাবারী *'Jami al-Bayan fi Tafsir-al-Quran* (বৈরুত, দার আল মারিয়াহ, ১৯৭২) ভলিউম- ৩-৪, পার্ট- ৩; পৃ: ১৪১-২।

১২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *'Four Basic Quranic Terms';* অনুবাদ: আবু আসাদ (লাহোর, ইসলামী পাবলিকেসন্স, ১৯৮২) পৃ: ৯৩-১০৩।

১৩. ফজলুর রহমান, 'Islam' (শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৯) পৃ. ১১৭। শরীয়াহ শব্দটি বিভিন্ন আকারে কুরআনে পাঁচ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, যথা, ৫:৪৮; ৭:১৬৩; ৪২:১৩; ৪২:২১ এবং ৪৫:১৮, দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬৩ বার, ইসলাম শব্দটি ইহার কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয়েছে ৫ বার।

১৪. এইচ. এ. আর গীব ও জে. ক্রোমারস সম্পাদিত *'Shorter Encyclopaedia of Islam'* (ইথাকা, নিউইয়র্ক, কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩), পৃ: ৫২৪।

১৫. আবদ আল ওয়াহহাব আল খাল্লাফ *'Islam Usul al-Fiqh* (কুয়েত, Dar-al-Kuwaitiyyah, ১৯৭৮) পৃ. ৩৪-৩৫

১৬. সাঈদ রামাদান, *'Islamic Law : Its Scope and Equity* (কুয়ালালামপুর, মুসলিম ইয়থ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া, ১৯৭৮) পৃ. ৪৩

১৭. জি.এইচ. জ্যানসেন, 'Militant Ilm' (নিউইয়র্ক, হারপার এন্ড রো, (১৯৭৯), পৃ. ২৯

১৮. A. Dol, *"Shariah : The Islamic Law* (লন্ডন : তা হা পাবলিসার্স, ১৯৮৪), পৃ.৭

১৯. জালাল আল দ্বীন আবদ আল রাহমান সায়ূতী *'al-Itqan fi Ulum al Quran'* (কায়রো আল হালাবী প্রেস, ১৯৫১) ভলিউম- ১; পৃ: ৩৯-৪৪

২০. মুহাম্মদ রশীদ রিদা, *'al-wahy al-Muhammadi* (কায়রো, Matba'a al-Manar, ১৯৩১) পৃ: ২৫৫

২১. Zaydan. al-*Madkhal li-Dirasat al-Shariah al- Islamiah'* পৃ. ১০৮-১৮

২২. ইবনে কাইয়িম আল জওজিয়াহকে উদ্ধৃত করেছেন ইসমাইল আর আল-ফারুকী *'The Great Asian Religions An Anthology'* (নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৫৯) পৃ: ৩৩৭-৮

২৩. মওদূদী, *'Islamic Law and Constitution'* পৃ: ১৯১

২৪. মুহাম্মদ ইকবাল, 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam' (লাহোর : আশরাফ, ১৯৭১); পৃ. ১৪৮

২৫. খুররম মুরাদ, *'Shariah : The Way to God'* পৃ: ১১

২৬. আবদুল হামিদ আবু সুলায়মান *'The Islamic Theory of International Relations : New Directions for Islamic Methodology and Thought'* (জার্নডন, 'International Institute of Islamic Thought, ১৯৮৭), পৃ. ৭৫। ইমাম ইবনে আল মুনযীর ৭৫৬টি বিষয় সনাক্ত করেছেন যেখানে 'ইজমা' রয়েছে। দ্রষ্টব্য, ইমাম ইবনে আল মুনযীর, *'al-ijma'* (বৈরুত, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, ১৯৮৫)।

২৭. ইকবাল, *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam'* পৃ. ১৪৮

২৮. সায়ীদ রামাদান, *'Islamic Law: Its Scope and Equity'* পৃ. ৮৭

২৯. ইকবার, *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam',* পৃ. ১৪৯-৫২

৩০. ইসমাইল আর. আল ফারুকী, *'Historical Atlas of the Religions of the World* (নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৭৪), পৃ. ২৬

৩১. মওদূদী, *Islamic Law and Constitution,* পৃ. ৮০-৮১

৩২. ইকবাল, 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam, পৃ. ১৪৯

৩৩. প্রাগুক্ত পৃ: ১৭৩-৪

৩৪. ইব্রাহিম সুলায়মান, 'Islamic Law and law Reform in Nigeria' (৭-১০ এপ্রিল, ১৯৮১ নাইজেরিয়ার আহমাদু বেল্লো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন শিক্ষকদের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধ)।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪-১৯।

৩৬. কুরআনের 'মারুফাত' শব্দটি 'আদল', 'ইহসান' ও 'ইতা যী আল কুরবা (নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দান করা) এর সহিত জড়িত। 'মুনকার' শব্দটি 'ফাহেসা' (নিন্দনীয় কাজ) এর সহিত জড়িত।

৩৭. খাল্লাফ, Ilm Usul al-Fiqh', পৃ: ৮৪।

৩৮. এস. পারভেজ মনজুর, *'Quest for the Shariah's Past and Future',* Inquiry : Magazine of Events and Ideas, ৩(১), জানুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ. ৩৫।

৩৯. মোনা আবুল ফদল, 'Community, Justice, Jihad Elements of the Muslim Historical Consciousness', American Journal of Islamic Social Sciences, ৪(১), ১৯৮৭, পৃ. ১৭।

৪০. মওদূদী, *'Islamic law and Constitution',* পৃ: ৫৬।

৪১. আনোয়ার আহমাদ কাদরী, *'Islamic Jurisprudence in the Modern World,* পৃ: ৮১-২।

৫. উম্মাহ্ ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

১. কুরআনে সম্প্রদায় বুঝাতে 'শাব' ও 'কওম' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে 'শা'ব' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা'ও বহুবচন 'শুয়াব' রূপে। 'কওম' শব্দটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, কতিপয় লোকের দল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. R. M. MacIver 'Community : A Sociological study (লন্ডন, ১৯৩৬), পৃ: ২২-২৩; ৭৩

৩ ম্যাবেল এ. ইলিয়ট ও ফ্রানসিস ই. মেরিল 'Social Disorganisation' (নিউইয়র্ক, দি ফ্রি প্রেস, ১৯৬০), পৃ. ৪৫৭

৪. উম্মাহ্ শব্দটি কুরআনে ৬৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে, ৫৩ বার মক্কী আয়াতে, বাকী মদীনার আয়াতে। মোহাম্মদ ফুয়াদ আবদ আল বাকী, 'al-Mu'jam al-Mufharas li-Alfaz al-Quran al-Karim' (তুরস্ক, আল-মাকতাবাহ্ আল ইসলামিয়া, ১৯৮৪), পৃ. ৮০

৫. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ্, *'The First Written Constitution in the world'* (লাহোর : আশরাফ, ১৯৭৫)

৬. S.D.B *Goitein, 'Studies in Islamic History and Institution'* (লেইডেন; ই. জে. ব্রীল, ১৯৬৮) পৃ. ১২৮

৭. আর্টিকেল ১ এবং ২ দ্রষ্টব্য, হামিদুল্লাহ *'The First Written Constitution in the World'* পৃ. ৫৫

৮. আর্টিকেল ১৫, দ্রষ্টব্য প্রাগুক্ত পৃ. ৫৮

৯. আর্টিকেল ২০ (খ), দ্রষ্টব্য প্রাগুক্ত পৃ: ৫৯

১০. ডব্লিউ মন্টোগোমারী ওয়াট, *'Muhammad at Medina* (অক্সফোর্ড, ক্লেরেনডন প্রেস, ১৯৫৬); পৃ: ২২৩, ২২৬

১১. ই. আই. জে রজেনথাল *'Political Thought in Medieval Islam An Introductory Outline* (লন্ডন, ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮); পৃ. ২৫

১২. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী, 'Tawhid: Its Implications for Thought and Culture' (হারনডন, International Institute of Islamic Thought, 1982) পৃ. ১২০-২১

১৩. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আল তারাবী *'Jami al Bayan fi Tafsir al-Quran'* (বৈরুত, দার-আল মারিফাহ, ১৯৭২) ভলিউম: ৯-১০; পার্ট- ১০, পৃ. ১২৩

১৪. আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী, *'Al-Jami li Ahkam al-Quran'* (বৈরুত, Dar Ihya al-Turath al Arabi, (১৯৫৯) ভলিউম- ৪, পার্ট- ৮, পৃ: ২০৩

১৫. প্রাগুক্ত, ভলিউম- ৮; পার্ট ১৬; পৃ: ৩২২-৩

১৬. আবু মুসা'র সূত্রে আল বোখারী ও মুসলিম শরীফের এই হাদীসটি মোহাম্মদ আসাদ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে *'The Principles of State and Government in Islam'* (জিব্রালটার, দারআল আন্দালুস, ১৯৮০) পৃ. ৩১

১৭. প্রাগুক্ত গ্রন্থে জারীর ইবনে আবদ আল্লাহ'র সূত্রে বোখারী মুসলিম শরীফের হাদীস, পৃ: ৮৯

১৮. প্রাগুক্ত গ্রন্থে আবদ আল্লাহ ইবনে উমর এর সূত্রে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস, পৃ: ৩১

১৯. আল-ফারুকী, *'Tawhid'*, পৃ. ১৭২।
উম্মাহ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য ভালোভাবে বুঝা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে উম্মাহ'র রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং দু'টি বিষয়ের অভিন্ন ভূখণ্ডগত সীমারেখা না'ও থাকতে পারে।

২০. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, 'Witness Unto Mankind; The Purpose and Duty of the Muslim Ummah, অনুবাদ ও সম্পাদনা খুররম মুরাদ (লেইসেসটার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬) পৃ: ২৭।

২১. প্রাগুক্ত পৃ: ২৯।

২২. প্রাগুক্ত পৃ: ৩১-২।

২৩. আল তাবারী, *'Jami al-Bayan fi Tafsir al-Quran'* ভলিউম-২, পার্ট-১; পৃ: ৬

২৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *'The Islamic Law and Constitution'*, অনুবাদ ও সম্পাদনা : খুরশীদ আহমদ (লাহোর, ইসলামিক পাবলিকেসন্স, ১৯৭৫) পৃ: ১৫১

২৫. এ. ইউসুফ আলী *'The Holy Quran Text, Translation and Commentary* (লেইসেসটার, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৫) : পৃ: ১৫১

২৬. কমরুদ্দীন খান, *'The Plitical Thought of Ibn Taymiyyah* (লাহোর ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩), পৃ. ১২৩-৪

২৭. মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের পূর্বে- দু'বার শপথ বা 'বায়াহ-আল আকাবাহ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমবার রাসূলুল্লাহ (সা) ১২ জন লোকের সাথে মিলিত হয়েছিলেন যারা তৌহিদ' বিশ্বাসে শপথ গ্রহণ করে। এক বৎসর পরে দ্বিতীয় 'বায়াত' অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী উপস্থিত ছিলেন। এই শপথ ছিল তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন, নৈতিকতা মেনে চলা, রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুগত থাকা, উভয় পক্ষের পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা এবং সত্যের প্রকাশে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ। উল্লেখ্য, এই দু'টি বায়াতের' পূর্বে ৬ জন লোকের সাথে আর একটি 'বায়াত' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য আবদ আল মালিক ইবনে হিসাম *'Sirat Sayyid al-Anam Muhammad'*, (বৈরুত, আল খায়াত, ১৯৬৭), পৃ: ৬৩-৬৪

২৮. জাকারিয়া বশীর, *'Hijra : Story and Significance'* (লেইসেসটার, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩), পৃ. ১০১-১০৩

২৯. হেনরী সীগম্যান, *'The State and the Individual in Sunni Islam,'* মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ভলিউম- ৫৪ (জানুয়ারী, ১৯৬৪)।

৩০. মোহাম্মদ হোসেইন হায়কল, *'The life of Mohammad;* অনুবাদ : ইসমাইল রাজী আল ফারুকী (কুয়ালালামপুর, ইসলামিক বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩), পৃ. ৪৮৬-৭

৩১. Albert, Hourani, 'Arabic Thought in Liberal Age (লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০)। পৃ. ৫
৩২. সাইয়েদ আমীর আলী, 'A Short History of The Saracens (লন্ডন, ১৯৩৪); পৃ. ৪০৩
৩৩. কমরুদ্দিন খান, 'The Political Thought of Ibn Taymiyah, পৃ: ১৩০
৩৪. ই.আই.জে রজেনথাগাল 'Studia Semitica, (ক্যাম্ব্রীজ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১), ভলিউম II পৃ. ২০৯
৩৫. আল ফারুকী, *'Tawhid'*, পৃ. ১৪৩
৩৬. M.G.S Hodgson, *'The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization,* (শিকাগো, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৪) ভলিউম- ১, পৃ: ৭৫-৮
৩৭. হামিদ এনায়েত, *'Modern Islamic Political Thought',* (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৯২), ছ. ১১২; আরো দ্রষ্টব্য আবদুল্লাহ আল আহসান, *'Ummah or Nation : Indentity Crisis in contemporary Muslim Society'* (লেইস্সেসটার : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২)
৩৮. Carlton I. Hayes *'The Historical Evolution of Nationalism',* (লন্ডন, ম্যাকমিলান, ১৯৩১), পৃ: ৩৭; বয়েড সি শেফার, 'Nationalism Myth and Reality (নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৫৫।, ১; হ্যানস কোহন, 'Nationalism : Its Meaning and History (প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫); পৃ: ৩৪
৩৯. জওহর লাল নেহেরু, *'Toward Freedom'* (নিউইয়র্ক, জন ডে, ১৯৪১)।
৪০. Carlton J. Hoyes, *'Nationalism A Religion* (নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৬০)।
৪১. Shamloo সম্পাদিত *'Speeches and Statements of Iqbal'* (লাহোর মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৪৮), পৃ. ২২৪
৪২. হামিদ এনায়েত, *'Modern Islamic Political Thought'* পৃ. ১১৬
৪৩. মোহাম্মদ আসাদ কর্তৃক আবু দাউদ-কে উদ্ধৃত, *'The Principles of State and Government in Islam'* পৃ: ৩২
৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজীদ আল কাজউইনী ইবনে মাজাহ, *'Sunan ibn Majah,'* মোহাম্মদ ফুয়াদ আবদ আল-বাকী কর্তৃক গবেষণাকৃত (বৈরুত দারুল ফিকর ওয়াল নসর)
৪৫. আল ফারুকী, 'Tawhid', পৃ: ২২।
৪৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, 'Process of Islamic Revolution (দিল্লী, মাকতান জামাতে ইসলামী, ১৯৭০) পৃ. ২২
৪৭. হামিদ এনায়েত, 'Modern Islamic Political Thought' পৃ: ১১৫

৪৮. আবদ আল-রাহমান আল-বাজ্জাজ, *'Min Wahy al-Urubah'* (কায়রো); পৃ: ১৯৯; প্রাগুক্তে উদ্ধৃত : ১১৩

৪৯. সাতি আল হুসরী, *'Ma Hiya al-Quwmiyah',* (বৈরুত: Dar al-ilm lib Malayin, ১৯৬৩, পৃ: ১৯৫; আরো দ্রষ্টব্য বাসাম তিবী, 'Arab Nationalism : A Critical Enquiry (নিউইয়র্ক, সেইন্ট মার্টিন প্রেস, ১৯৮১)

৫০. ইসমাইল আর আল ফারুকী 'Islam as Culture and Civilization'; মালেক আজ্জাম সম্পাদিত 'Islam and contemporary Society (লন্ডন) লংম্যান, ১৯৮২) পৃ: ১৪৩-৬

৫১. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৬

৫২. হামিদ এনায়েত, Modern Islamic Political Thought, পৃ: ১১৭-২০.

৬. খিলাফত ঃ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

১. এই পুস্তকে 'Political Order, 'Political System' এবং 'Polity' শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দসমূহের অর্থ অভিন্ন, যার অর্থ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত- ও সরকারভিত্তিক একটি সমাজ। এই শব্দসমূহ 'রাষ্ট্র' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যেখানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভৌগোলিক ও অন্যান্য তাৎপর্যগত অর্থ রয়েছে।

২. ই.আই.জি রজেনথাল, 'Political Thought in Medieval Islam An Introductory Outline' (ক্যামব্রিজ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮), পৃ. ২৪

৩. এরিস্টটল, *'The Politics';* অনুবাদ জে.এ.সিনক্লেয়ার (ইংল্যান্ড, পেনগুইন বুকস, ১৯৯২) পৃ: ২৮

৪. এখানে মুসলিম চিন্তানায়ক ইবনে খালদুনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য আবদেল ওয়াহাব আল এফেন্দী *'Who Needs an Islamic State.?'* (লন্ডন, গ্রেসীল, ১৯৯১) পৃ: ৫

৫. টি হবস, *'Leviathan'*; সম্পদনা: সি.বি ম্যাকফারসন (হারমন্ডসওয়ার্থ, ইংল্যান্ড, পেনগুইন বুকস, ১৯৬৮) পৃ. ১৬১

৬. রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সসীয় ধারণা সম্পর্কে দেখুন, ফ্রেডারিক এনজেলস 'Origin of the Family, Private Property and the State' (মস্কো, প্রগ্রেস পাবলিসার্স, ১৯৬৯); কার্ল মার্ক্স, 'The 18th Brumaire (মস্কো, প্রগ্রেস পাবলিসার্স, ১৯৬৯)।

৭. ম্যাক্স ওয়েবার 'Politics as a Vocation', এইচ.এইচ. গার্থ ও সি. রাইট মিল্‌স সম্পাদিত From Max Weber' (লন্ডন, রুলেজ এন্ড কেগান পল, ১৯৭০); পৃ: ৭৮।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. Robert Dahl, 'Who Governs?: Democracy and Power in an American City' (নিউ হেভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬১)।

১১. 'দুলাই' শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (৫৯:৭)। 'ঘূর্ণায়মান বৃত্ত' পারিভাষিক অর্থে, এতে বুঝান হয়েছে সম্পদ শুধুমাত্র ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিৎ নয়। রাষ্ট্র অর্থে

শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্তত্বের পরিবর্তনের ক্ষেত্র ছাড়া। আহমেদ দেভুটুগলু দেখিয়েছেন যে, ধাতুরূপ 'দওল' হতে 'দাওলাহ' শব্দটি তিনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম: ইহা রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তন বুঝিয়েছেন, দ্বিতীয়ত: চলমান রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং সর্বশেষে জাতিরাষ্ট্র।

দ্রষ্টব্য Ahmet Davutoglu, 'Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauung on Political Theory (ম্যারিল্যন্ড, ইউনিভার্সিটি প্রেস অব আমেরিকা, ১৯৯৪) পৃ: ১৯০।

১২. আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে জারীর আল তাবারী, *'Tarikh al Tabari';* সম্পাদনা এম.জে. দি. গোয়েজী (লইডেন: ই.জে. ব্রিল, ১৯৯১); ভলিউম ১.১ পৃ. ৮৫-১১৫

১৩. হামিদ এনায়েত, *'Modern Islamic Political Thought'* (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮১, পৃ. ৬৯

১৪. মজিদ খাদ্দুরী, *'The Nature of the Islamic State'*, ইসলামিক কালচার, ভলিউম-২১, ১৯৪৭, পৃ. ৩২৭

১৫. এই ধারণাগুলি মনযুর উদ্দিন আহমেদ প্রণীত *'Islamic Political System in the Modern Age: Theory and Practice'* গ্রন্থে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে (করাচী : সাদ, ১৯৮৩), পৃ: ২৭-৪৩

১৬. আবদুলহামিদ আবু সুলায়মান *'Crisis in the Muslim Mind';* অনুবাদ : ইউসুফ তালাল ডিলরেনযো (জারনডন, International Institute of Islamic Thought, ১৯৯৩), পৃ: ৮৯

১৭. মোহাম্মদ আসাদ, 'The Principles of State and Government in Islam' (জিব্রালটার, দার আল আন্দালুস, ১৯৮০) পৃ: ৩৩

১৮. কুরআনে 'শুরা' শব্দটি ৩ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে (২:২৩৩; ৩:১৫৯; ৪২:৩৮)।

ধাতুরূপ 'শাওয়ারা' বা 'শউইর' অর্থ- আলাপ করা, পরামর্শ দেয়া এবং এভাবে 'শুরা'র অর্থ আলাপ আলোচনা। আল তাবারী ও আল কুরতুবী উভয়েই একমত পোষণ করেছেন যে, আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ এবং 'যে সব বিষয়ে কোন ঐশী প্রত্যাদেশ নেই, সে সব ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার করা অপরিহার্য। দ্রষ্টব্য আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতবী, 'Al Jami li-Ahkam al-Quran' (বৈরুত, Dar Ihya al-Turath al Arabi, 1958) ভলিউম- ২; পার্ট-৪, পৃ: ২৪৯ এবং আল-তাবারী 'Tafsir', ভলিউম; ৩-৪, পৃ. ১০০

উল্লেখ্য নবী করিম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময় 'শুরা' প্রচলিত ছিল এবং এই সময়কালকেই আদর্শ সময়কাল হিসাবে ধরতে হবে। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে 'শুরা' তার মৌলিক রূপ হারিয়ে ফেলে। তবে বর্তমানে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তবে এর তেমন কোন প্রয়োগ হচ্ছে না।

১৯. আবদুলহামিদ আবু সোলায়মান, 'Islamization of Knowledge with Special Reference to Political Science', American Journal of Islamic Social Science, ভলিউম- ২, সংখ্যা-২; ১৯৮৫, পৃ: ২৮৫

২০. Ahmet Davutoglu, 'Alternative Paradigms' পৃ. ১৩২

২১. মোহাম্মদ ইকবাল, *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (লাহোর : মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭১), পৃ: ১৫৫।

২২. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *'The First Written Constitution in the World'* (লাহোর, আশরাফ, ১৯৭৫)।

২৩. রাসূলুল্লাহ (সা) ২৫ বার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন, যার মধ্যে ৯ বার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। দ্রষ্টব্য মাওলানা গওহর রহমান, *'Islami Siyasat'* (লাহোর: আল মানার বুক সেন্টার, ১৯৮২), পৃ: ১৮৯-৩।

২৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন আল তাবারী, 'Tarikh a-Rasul wa al-Muluk' (কায়রো: দার আল মারিফ আল ইসলামিয়া, ১৯৬২), ভলিউম ৩-৫; সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *'The Islamic Law and Constitution'* সম্পাদনা খুরশীদ আহমদ (লাহোর, ইসলামী পাবলিকেসন্স, ১৯৬৭), পৃ. ২৪৯-৫২।

২৫. ইবিস ইউসুফ সম্পাদিত, 'Nusus al-Fikr al-Siyasi al Islami' গ্রন্থে আল-বাকিলানী ও আল তৌহিদ-কে উদ্ধৃত করা হয়েছে (বৈরুত, হায়াত প্রেস, ১৯৬৬ পৃ: ৫৬। আরো দ্রষ্টব্য তাকী আল দ্বীন ইবনে তাইমিয়া, 'al-Siyasah al-Shariyah fi Islah al Ra'y wa ra'iyah (মিশর, দারুল কিতাব আল আরাবী)।

২৭. দু'টি ক্ষেত্রে (উসামা'র অভিযান এবং রিদ্দা বা ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) আবু বকর পরামর্শদাতাদের সর্বসম্মত মতকে অগ্রাহ্য করেছিলেন (মওদূদী, *The Islamic Law and Constitution,* পৃ. ২৪৬)। উসামা'র অভিযানের ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা হলো যেখানে কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেখানে পরামর্শ বা আলাপ আলোচনার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে অভিযান শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; আবু বকর শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ'র নির্দেশ মোতাবেক উসামার অভিযানে যাত্রা করার আদেশ বাস্তবায়ন করেছিলেন। আবু বকরের নিজের ভাষায় 'রাসূলুল্লাহ যে পতাকাকে তুলে ধরেছিলেন, তা গুটিয়ে নেবার' অধিকার তাঁর নেই, এবং আল্লাহর রাসূল যাকে দিয়েছিলেন তাঁকে (উসামা) পদচ্যুত করার ক্ষমতাও তার নেই। (ড: মজিদ আলী খান, *'The Pious Caliphs';* লন্ডন: দিওয়ান প্রেস, পৃ: ৩২-৩)। জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আবু বকর 'শুরা'র পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেননি। তিনি ওমরসহ শুরার সদস্যদের আসনে বলিষ্ঠভাবে এ বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে তাদের হৃদয় জয় করে নেন। (মোহাম্মদ এস.এল-আওয়া, *'On the Political System of the Islamic State'*, ইন্ডিয়ানা, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেসন্স, ১৯৮০, পৃ. ৫)।

২৮. এস. ওয়াকার আহমাদ হোসাইনী, 'Principles of Environmental Engineering Systems Planning in Islami Culture (পি,এই,চডি থিসিস, ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৭১) পৃ: ১৩৮।

২৯. আবদুলহামিদ আবু সোলায়মান, *'The Ummah and Its Civilizational Crisis'* । আই.আর আল ফারুকী ও এ.ও. নাসিফ সম্পাদিত *'Social and Natural Sciences'* গ্রন্থে উদ্ধৃত (জেদ্দা; কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, ১৯৮১) পৃ. ১০৩।

৩০. ইবনে খালদুন, *'The Muqaddimah An Introduction to History;* সম্পাদনা: এন.জে.দাউদ (প্রিন্সটন, পিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১) পৃ: ১৬৬

৩১. জালাল আল দ্বীন আবদ আল-রাহমান ইবনে আবু বকর আল সায়ূতী *'Tarikh al-Khulafa* (বৈরুত, দার আল তাকাফাহ) পৃ. ২২৪।

৩২. John L. Esposito, *'Islam and Politics'* (নিউইর্য়ক: Syrcunse University Press, ১৯৯১), পৃ. ১৪-১৫

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-২৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৩৫. Marshall G.S. Hodgson *'The Venture of Islam'* (শিকাগো, ইউনিভার্সিটি শিকাগো প্রেস, ১৯৭৪), ভলিউম- ৩; পৃ. ১৪-১৫

৩৬. I Metin Kunt 'The Later Muslim Empires'; Marjorie Kelly সম্পাদিত, 'Islam : The Religions and Political life of a World Community' (নিউইয়র্ক, প্রেগার, ১৯৮৪) পৃ: ১২৭।

৩৭. অটোম্যান খিলাফতের ভাঙ্গনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন এলান.আর.টেলর, 'The Islamic Question in Middle East Politics' (বোল্ডার, ওয়েস্টভিউ প্রেস, ১৯৮৮), পৃ. ২৩-২৫। আরো দ্রষ্টব্য হামিদ এনায়েত, *'Modern Islamic Political Thought'* (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮২), পৃ. ৫২-৫

৩৮. এনায়েত, *'Modern Islamic Political Thought'* পৃ. ৫৫

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪

৪০. আবদ আল-কাদির আল বাগদাদী, *al-Farqbayn al-Firaq* (বৈরুত: দার আর ফিকর, ১৯৭৩); আবু হাসান আলী ইবনে মোহাম্মদ আল-মাওয়ার্দী, *'al-Ahkam al-Sultaniyah'* (কায়রো, হালাবী, ১৯৭৩)

৪১. দেখুন ইবনে তাইমিয়া, *'Al-Siyasah al-Shariah'*

৪২. উম্মাহ এর বিস্তৃত বিবরণের জন্য অধ্যায়- ৫ দ্রষ্টব্য।

৪৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বের সীমাবদ্ধতার উপর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যায়- ৭

৪৪. আল-মাওয়ার্দী, *'al-Ahkam al-Sultaniyah'* পৃ. ৬। আরো দ্রষ্টব্য ই.আ জে রজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam'* পৃ. ২৮

৪৫. লিওনার্ড রাইন্ডার, *'Al-Ghazalis Theory of Government'* দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ভলিউম- ৪৫, সংখ্যা ৩ (১৯৫৫), পৃ. ২৩৬

৪৬. রজেনথাল, *'Political Thought in Medievel Islam'*, পৃ. ২৯, ৪০, ২৩৬

৪৭. কমরুদ্দিন খান, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah'* (ইসলামাবাদ, ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশান, ১৯৮৩), পৃ. ১৮৪

৪৮. আবুল আলা মওদূদী, *'Unity of the Muslim World'* (লাহোর: ইসলামী পাবলিকেসন্স, ১৯৬৭)

৪৯. আবদুলহামিদ আবু সুলায়মান, 'Crisis in the Muslim Mind' পৃ. ১৩৯

৫০. সি.রাইডার স্মীথ, *'Theory', in Encyclopedia of Religion and ethics* (নিউইয়র্ক, চালর্স স্ক্রীবনার, ১৯২৪); টি, ডব্লিউ আরনল্ড, *'The Proceeding of Islam'* (লন্ডন, কনস্ট্যাবল, ১৯৩৫)

৫১. আসাদ, *'The Principles of State and Government in Islam'* পৃ. ২১

৫২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *'The Proceess of Islamic Revolution'* (দিল্লী: মারকাজী মাকতাবাহ জামাতে ইসলামী, হিন্দ, (১৯৭০) পৃ. ৯

৫৩. আসাদ, *The Principles of State and Government in Islam'*, পৃ. ১

৫৪. সাইয়েদ কতুব, 'Ma'rakat al-Islam wa-al-Rasmaliyah' (বৈরুত: দার আল শুরুক, ১৯৭৫) পৃ. ৬৬; Yvonne Y. Haddad ' Sayyed Qutb: Ideologues of Islamic Revival; John L. Esposito সম্পাদিত 'Voices of Resurgent Islam' (নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩), পৃ. ৭১

৫৫. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার লিখিত সংবিধানের ধারণাটির উৎসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রণীত মদীনার লিখিত সংবিধান। পরবর্তী মুসলিম শাসকবৃন্দ আর লিখিত সংবিধান প্রবর্তন করেননি; তারা ফরমান, প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। সমকালীন পণ্ডিতবর্গ যথা রশীদ রিদা, মওদূদী প্রমুখ লিখিত সংবিধানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ হাশিম কামালী 'Characteristics of the Islamic state' ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম- ৩২, সংখ্যা- ১, ১৯৯৩, পৃ. ২৬-২৭

৫৬. মওদূদী, 'The Islamic Law and Constitution' পৃ. ২১৭-২১৯

৫৭. জাস্টিস জাভেদ ইকবাল, *'The Concept of State in Islam';* মুমতাজ আহমেদ সম্পাদিত *'State in Islam', Politics and Islam* (ইন্ডিয়ানা পলিস, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেসন্স, ১৯৮৬) পৃ. ৪৭

৫৮. আসাদ, *'The Principles of State and Government in Islam'* পৃ. ৫২

৫৯. আবদুল রহমান আবদুল কাদির কুর্দী, *'The Islamic State: A Study based on the Islamic Holy Constitution'* লন্ডন, ম্যানমেল, ১৯৮৪) পৃ. ৯০

৬০. মওদূদী, *The Islamic Law and Constitution* পৃ. ৩৩৪; আরো দ্রষ্টব্য *'Nizam-e-Hukumat Ke Bare Me Ansari Kamishan Ki Report'* (ইসলামাবাদ, প্রিন্টিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তান প্রেস, ১৯৮৪), পৃ ১৬

৬১. আসাদ, *The Principles of State and Government in Islam'* পৃ. ৪০
৬২. সাইয়েদ কুতুব, *'Marakat al-Islam wa al-R'asmaliyah'* পৃ. ৭৩-৪
৬৩. গডফ্রে এইচ. জ্যানসেন, 'Militant Islam' (নিউইয়র্ক; হারপার এন্ড রো, ১৯৭৯), পৃ. ১৭৩
৬৪. হাসান আল তুরাবী *'The Islamic State,* সম্পাদনায় জন এল. এসপোসিটো 'Voices of Resurgent Islam' (নিউইয়র্ক, হারপার এন্ড রো, ১৯৭৯) পৃ. ১৭৩
৬৫. মোহাম্মদ ইকবাল, *'The Reconstruction of Religious Thought in Islam'* পৃ. ২৪৩।
৬৬. দ্রষ্টব্য কুর্দী, *'The Islamic State'* পৃ. ৯৯-৯।
৬৭. মওদূদী, *'The Islamic Law and Constitution'* পৃ. ২৩০।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।
৬৯. হাসান আল তুরাবী, *'The Islamic State'* পৃ. ২৪৮-৯
৭০. দ্রষ্টব্য কুর্দী, *'The Islamic state,* পৃ. ৮৫-৭
৭১. কামাল এ. ফারুকী, *'The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice'* (করাচী, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭১) পৃ. ৭২-৩
৭২. হাসান আল তুরাবী, *'The Islamic state'* পৃ. ২৪৯
৭৩. কুর্দী, *'The Islamic state,'* পৃ. ৮৬-৭
৭৪. মওদূদী, *The Islamic Law and Constitution'* পৃ. ২২৮
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৮, *Ansari Commission Ki Report,* পৃ. ৫১
৭৬. আসাদ, *The Principles of State and Government in Islam'* পৃ. ২৩
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭
৭৮. মওদূদী, *'The Islamic Law and Constitution* পৃ. ২৪১
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-৪০
৮০. Ansari Kamishan Ki Report, পৃ. ১২-১৫
৮১. হাসান আল তুরাবী *'The Islamic State'* পৃ. ২৪৮
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

৭. মুহাসাবাহ্ ঃ ইসলামে জবাবদিহিতা

১. হ্যারল্ড জে. লাস্কী, 'The American Democracy : A Commentary and an Interpretation' (নিউইয়র্ক, দি ভাইকিং প্রেস, ১৯৪৩), পৃ. ৮৯
২. R.B McCallum সম্পাদিত, 'On Liberty and Considerations on Representative Government (অক্সফোর্ড, বাসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৪৮) পৃ. ১৭২
৩. Raoul Berger, Impeachment The Constitutional Problems (ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩), পৃ. ৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, ১১৮

৫. কুরআন দু'বার 'উলু আল আমর' এর উল্লেখ রয়েছে (৪:৫৯; এবং ৪:৮৩)। ইবনে মনজুরের মতে শব্দটি দ্বারা প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ ও জ্ঞানী লোকদের বুঝিয়েছেন। দ্রষ্টব্য ইবনে মনজুর, 'Lisan al-Arab (কায়রো, ১৯৬৫), আল আরব, ভলিউম- ৪, পৃ. ৩১। আল তাবারী, আল কুরতুবী, ইবনে কাহির প্রমুখ একমত পোষণ করেন যে এই শব্দটি দ্বারা শাসক, আইনশাস্ত্রবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে বুঝান হয়েছে। তবে আল কুরতুবী 'আল-উমারা' শব্দ দ্বারা শাসকবর্গ এবং 'আল-উলামা' শব্দ দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে উলামা'দের সাথে আলোচনা করা এবং প্রদত্ত পরামর্শ মান্য করা বাধ্যতামূলক। দ্রষ্টব্য আবদ আল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল কুরতুবী, *'al-Jami-li-Ahkam al-Quran'* (বৈরুত: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, ১৯৫৯) ভলিউম-৩, পার্ট-৫, পৃ: ২৬০।

৬. আবু আল-কাশিম মাহমুদ ইবনে উমর জামাখসারী, *'al-Kashshaf'* (বৈরুত; দার আল-মারিফাত) ভলিউম-১, পৃ: ২৯০।

৭. সহীহ মুসলিম, অনুবাদ: আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, (বৈরুত, দার আল আরাবী, ১৯৭১), ভলিউম- III, সংখ্যাঃ ৪৫৩৩, পৃ: ১০২২।

৮. 'Mishkat al-Masabih' উদ্ধৃত করেছেন মওদুদী, *'Islami Law and Constitution'* অনুবাদ ও সম্পাদনা : খুরশীদ আহমদ (লাহোর: ইসলামী পাবলিকেসন্স, ১৯৬৭; পৃ. ২৫৭; মওদূদী উদ্ধৃত আরেকটি হাদীস হচ্ছে, 'যারা আল্লাহকে অমান্য করে তাদের প্রতি কোন আনুগত্য নেই', প্রাগুক্ত।

৯. সহীহ মুসলিম, ভলিউম III, নং ৪৬৩৪, পৃ. ১০২২

১০. মোহাম্মদ আসাদ, *'The Principles of State and Government in Islam'* (জিব্রালটার, দার আল-আন্দালুস, ১৯৮১), পৃ. ৮১-২

১১. আবুল আলা মওদূদী, *'Political Thought in Early Islam.'* এম এম. শরীফ সম্পাদিত *'A History of Muslim Philosophy'* (ওয়েসবেভেন, অটো হারামোউইটজ, ১৯৬৩), ভলিউম- ১ পৃ. ৬৫৯

১২. আবু মোহাম্মদ আবদ আল মালিক ইবনে হিশাম 'al-Sirah al-Nabawiyah'; সম্পাদনায়: এম.আল সাক্কা, আল- আহইয়ারী ও হাফিজ সালাবী (কায়রো: মুস্তাফা আল বাবী আল হালাবী, হিজরী ১৩৭৫/১৯৫৫ খ্রী:, ভলিউমII, পৃ. ৬৬১

১৩. ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আবু ইউসুফ, 'Kitab al-Kharaj' (কায়রো, সালফিয়া প্রেস, হিজরী ১৩৫২) পৃ. ১৪

১৪. মোহাম্মদ ইবনে সাদ, *'Al-Tabaqat al-Kurba'* (বৈরুত, দার আল তাবাহ, ১৯৫৭); ভলিউম- II, পৃ. ৬৬ এবং ভলিউম- III, পৃ. ৬৮

১৫. কমরুদ্দিন খান, 'আল মাওয়ার্দী'; সংকলিত এম এম শরীফ সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ *'A History of Muslim Philosophy'*, পৃ. ৭২৯.

১৬. ই.আই.জে রজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline* (ক্যামব্রীজ, ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮), পৃ. ৩৮-৪৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৫১; আরো দ্রষ্টব্য এইচ.এ.আর. গীব *'Constitutional Organization';* মজিদ খাদ্দুরী ও এইচ.জে লেইবেসনী সম্পাদিত *'Law in the Middle East'* (ওয়াশিংটন ডি.সি, The Middle East Institute, ১৯৫৫) ভলিউম- ১; পৃ: ৪৫
১৮. হামিদ এনায়েত, Modern Islamic Political Thought' (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮২) পৃ. ১১; রজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam'* পৃ. ২৭
১৯. আল গাজ্জালী, *'al-Iqtisad fi al i'itiqad',* যা রুবেন লেভী কর্তৃক উদ্ধৃত 'The Social Structure of Islam' ক্যামব্রিজ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭) পৃ. ২৯১
২০. গীব, *'Constitutional Organization',* পৃ. ১৯
২১. মওদুদী, 'আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফ', উদ্ধৃত এম. এস. শরীফ সম্পাদিত *'A History of Muslim Philosophy,* ভলিউম ১, পৃ. ৬৮৮
২২. আবু ইউসুফ, *'Kitab al-Kharaj,'* ভূমিকা
২৩. আলবার্ট হাওরানী কর্তৃক ইবনে জামাহ উদ্ধৃত *'Arabic Thought in the Liberal Age,* 1798-1939' (লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ১৫
২৪. রজেনথাল, 'Political Thought in Medieval Islam', পৃ. ১৫৩
২৫. তাকী আল দ্বীন ইবনে তাইমিয়া, *'Al-Siyasah al-Shariyah fi islah al-ra'y wa al-ra'iyah* (মিশর, দারুল কিতাব আল আরাবী) পৃ. ৮-৯
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
২৭. এইচ. এ. আ. গীব, 'Al- Mawardi's theory of the Khilafa' ইসলামিক কালচার, ভলিউম-২ (জুলাই, ১৯৩৭), পৃ. ২৯৪।
২৮. সাইয়েদ কুতুব, *'Ma'rakat al-Islam Wa al-Ra'smaliyah* (বৈরুত, দার আল শুরুক, ১৯৭৫) পৃ. ৭৩
২৯. মওদূদী, *The Islamic Law and Constitution'* পৃ. ২৫২
৩০. পণ্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্য বিরাজ করে যে প্রধান নির্বাহী শাসনকর্তা হবেন একজন রক্ষম ও অভিজ্ঞ পুরুষ। সম্প্রতি কয়েকজন মুসলিম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় জনগুরুত্ব পদে মহিলাদের নির্বাচনের উপযোগিতার বিষয়ে প্রাণবন্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।
৩১. রজেনথাল, *'Political Thought in Medieval Islam,'* পৃ. ১৫৩
৩২. সমগ্র গ্রন্থে Caliphate, Political order, Political System সমঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি State বা Islamic State শব্দ ব্যবহার এড়িয়ে গেছি। এ প্রসঙ্গে আল ফারুকীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :
'যখন আমরা 'খিলাফত' শব্দটি ব্যবহার করি তখন আমরা তৎদ্বারা 'রাষ্ট্র' বুঝাই। পাশ্চাত্য অর্থে 'রাষ্ট্র' এবং উম্মাহ' শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে বিশাল যে ব্যবধান রয়েছে তা আমাদের

মনে রাখতে হবে। উম্মাহর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব বলতে খিলাফত বুঝায়। উম্মাহর' সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।' ইসমাইল রাজী আল ফারুকী, *'Tawhid Its Implications for Thought and Life'* (হারনডন, International Institute of Islamic Thought, ১৯৮২), পৃ. ১৭২

৩৩. ড: এস.এ কিউ. হুসাইনী, 'Arab Administration' (লাহোর, আশরাফ, ১৯৭০), পৃ. ৩৭

৩৪. ডব্লিউ সি. স্মীথ *'The Concept of Shariah' 'Among some Mutakallimun'* । গীব প্রণীত ও জর্জ মাকদীসি সম্পাদিত, Arabic and Islamic Studies' (ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫), পৃ. ৫৮১

৩৫. আল বাকিলানী, 'Al-Radd'; ইবিস ইউসুফ সম্পাদিত 'Nusus al-Fikr al-Siyasi al Islami (বৈরুত, হায়াত প্রেস, ১৯৬৬), পৃ. ৫৬

৩৬. জামিলুদ্দিন আহমেদ, 'Iqbal's Concept of Islamic Polity', পাকিস্তান পাবলিকেসন্স), পৃ. ২১

৩৭. আহমাদ হাসান, *'The Political Role of Ijma* ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৮, নং-২ (১৯৬৯), পৃ. ১৩৮

৩৮. আবদুল রহমান আবদুল কাদির কুর্দী, *'The Islamic State : A Study Based on the Islamic Holy Constitution'* (লন্ডন, ম্যানসেল, ১৯৮৪), পৃ: ৮৬, ৮৯।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪০. আলী এ. মানসুর, *'Nuzum al-Hukm wa al-Idarah fi Shariat al Islamiyah wa al-qawanin al-wadiyah'* (বৈরুত, Dar al-Fath li al-Taba'ah wa al-Nashr, হিজরী ১৩৯১/১৯৭১খ্রী:), পৃ. ৩৭৯।

৪১. আহমেদ ইবনে মোহাম্মদ মিসকাওয়াহ, 'Tajarib al-Umam', সম্পাদনা এইচ.এফ. এমিড্রজ (বাগদাদ, আল মুথান্না লাইব্রেরী, ১৯৪১), ভলিউম-২, পৃ. ২৯০-১।

৪২. দ্রষ্টব্য *'Constitution of the Islamic Republic of Iran'* (তেহরান, Ministry of Islami Guidance, ১৯৮৫)।

৪৩. হামিদ এনায়েত, Modern Islamic Political Thought,' পৃ. ৫

৪৪. দ্রষ্টব্য লিওনার্দ বাইন্ডার, 'The Proofs of Islam: Religion and Politics in Iran', in Arabic and Islamic Studies in Honour of Hamilton A.R Gibb (লন্ডন; ই.জে.ব্রীল, ১৯৬৫), পৃ. ১২১

৪৫. Marshall G. Hodgson, 'The Venture of Islam: Conscience and History in a world Civilisation', (শিকাগো, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৪) ভলিউম-১, পৃ. ২৩৮

৪৬. মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী, *'Islam me Mushawarah Ki Ahmiyat'* (লাহোর, ইদারাহ ইসলামিয়াত, ১৯৭৬) পৃ. ১২৮-৩০

৪৭. মওদুদী, *'The Islamic Law and Constitution'* পৃ. ২৩৫

৪৮. মুহাম্মদ রশিদ রিদা, *'al-Khilafah Al-Imamah al-Uzma* (কায়রো, আল জাহ্‌রা আল ইসলাম আল আরাবী, ১৯৮৮) পৃ. ১১-১৩; ১২৪-৫

৪৯. জালাল আল দ্বীন আবদ আল রাহ্‌মান আল সায়ূতী 'Tarikh al-Khulafa' (মিশর, দার আল-মাকতাবাহ, ১৯৬৯) পৃ. ৪৩৬; স্যার উইলিয়াম মুর, *'The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall* (নিউইয়র্ক, এ এম এস প্রেস, ১৯৭৫) পৃ. ৫৮৫

৫০. কায়ারী তিজ্জানী 'The Force of Religion in the Conduct of Political Affairs and Interpersonal Relations in Borno and Sokoti', in Studies in the History of Sokoto Caliphate; The Sokoto Seminar Papers (জারিয়া, আহমাদু বেল্লো ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯) পৃ. ২৭১

৫১. প্রাগুক্ত।

৫২. রিদা, Al-Khilafah wa Al-Imamah al-Uzma), পৃ. ২১

৫৩. মওদূদী, The Islamic Law and Constitution পৃ. ২৫৫

৫৪. ফজলুর রহমান, 'Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistan Miliea ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৬; সংখ্যা-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭) পৃ. ২১৩

৫৫. 'Nizam-e-Hukumat Ke Bare Ansari Kamishan Ki Report (ইসলামাবাদ, প্রিন্টিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তান, ৪ আগস্ট, ১৯৮৩) পৃ. ১৮-২০; ৭৩-৫।

৫৬. ইসলামিক কাউন্সিল, 'A Model of An Islamic Constitution (লন্ডন, ইসলামিক কাউন্সিল, ১৯৮৩), ভূমিকা, পৃ. IV.

৮. নাহ্‌দাহ ঃ ইসলামী আন্দোলন

১. খুরশীদ আহমদ *'The Nature of Islamic Resurgence';* জন এল. এসপোসিটো সম্পাদিত 'Voices of Resurgent Islam' (নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩), পৃ. ২২২

২. এল বাইন্ডার কর্তৃক 'Fundamentalism' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে 'The Ideological Revolution in the Middle East' (নিউইয়র্ক, উইলী, ১৯৬৪)

৩. Geoge Marsden, 'Fundamentalism and American Culture' (অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২) পৃ. ১১৭

৪. উইলিয়াম শেফার্ড, 'Fundamentalism: Christian and Islamic', Religion, ভলিউম ১৭ (১৯৮৭) পৃ. ৩৫৬

৫. দ্রষ্টব্য হামিদ এনায়েত, *Modern Islamic Political Thought* (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮২); ফজলুর রহমান, *'Roots of Islamic Neo-Fundamentalism',* ফিলিপ এইচ স্টোডার্ড ও ডেভিড সি. ক্যাথেল সম্পাদিত 'Change and the Islamic Worldl; ব্রুস বি লরেন্স, 'Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against Modern Age. (সান ফ্রান্সিসকো, ১৯৮৯)।

৬. ব্রুস বি লরেন্স, 'Muslim Fundamentalist Movements Reflections Towards a new Approach'; বারবারা ফ্রেয়ার সম্পাদিত, 'The Islamic Impulse (লন্ডন, ক্রুস হেম, ১৯৮৭), পৃ. ৩১, ৩২

৭. John O. Voll, 'Fundamentalism in the Sunni Arab World : Egypt and the Sudan'; Martin E. Marty এবং R. Scott Appleby সম্পাদিত 'Fundamentalism Observed' (শিকাগো, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ৩৪৭

৮. ইসমাইল আল ফারুকী, 'Islamic Renaissance in Contemporary Society' আল ইত্তেহাদ, ১৫ (৪), অক্টোবর, ১৯৭৮), পৃ. ১৫

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১০. আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতের জন্য দেখুন, ডেনিয়েল লার্নার 'The Passing of Traditional Society: Modernising the Middle East (গ্লেনকো, ফ্রি প্রেস, ১৯৫৮); Manfred Halpern, 'The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa' (প্রিন্সটন, পিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩); Karl Deutsch, 'Social Mobilization and Political Development', American Political Science Review, এল.ভি (৩) সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। পরবর্তী ধারণার জন্য দ্রষ্টব্য ফুয়াদ আজামী, 'The Arab Predicament : Arab Political Thought and Practice Since 1967 (নিউইয়র্ক, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১; মাইকেল কার্টিস সম্পাদিত 'Religion and Politics in the Middle East' (বোল্ডার, ওয়েস্টভিউ প্রেস, ১৯৮১)।

১১. খোমেনী, *'Islam and Revolution : Writings and Declarations of Imam Khomeini'* সম্পাদনা : হামিদ আলগার (বার্কলী, মিজান প্রেস, ১৯৮১), পৃ. ৩২৭

১২. আবদুল রশীদ মোতেন, *'Pure and Practical Ideology The Thought of Mawlana Mawdudi',* ইসলামিক কোয়ার্টালী, ১৮ (১৯৮৪)' পৃ. ২১৮

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. জন এল. এসপোসিটো, *'Islam and Politics'* (নিউইয়র্ক, Syracuse University Press, ১৯৮৪) পৃ. ১০২-৩

১৫. বি.জি. মার্টিন, 'Muslim Brotherhoods in Nineteenth Century Africa (ক্যামব্রিজ; ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৬), পৃ. ২৮। আরো দ্রষ্টব্য এ. রশিদ মোতেন, 'Political Dynamism of Islam in Nigeria' ইসলামিক স্টাডিজ, ২৬ (২), ১৯৮৭

১৬. জন ও. ভল 'The Sudanese Mahdi; Frontier Fundamentalist' ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব মিডল ইস্ট স্টাডিজ, ১০ (১৯৭৯), পৃ. ১৫৯

১৭. হামিদ আলগার, 'The Roots of the Islamic Revolution' (লন্ডন: দি অপেন প্রেস, ১৯৮৩), পৃ. ৯

১৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, 'Hadrat Mawlana Mohammad Ilyas awr Unki Dini Da'wat' (লখনো, তানভীর প্রেস, ১৯৬০); এম.এ. হক 'The Faith Movement of Mawlana Muhammad Ilyas (লন্ডন, জর্জ এলেন এন্ড আনউইন, ১৯৭২)

১৯. গডফ্রে জ্যানসেন, 'Islam in Asia Towards an Islamic Society', The Economist, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, পৃ. ৫৪

২০. নদভী, 'Hadrat Mawlana Ilyas পৃ. ২৬৯

২১. মুহাম্মদ আইয়ুব কাদরী, 'Tablighi Jama'at Ka Tarikhi Ja'izah' (করাচী, Maktaba Muawiyah, 1971) পৃ. ৯২-৬

২২. মাওলানা ওয়াদিহ উদ্দিন খান, 'Din Kya Hai? (দিল্লী, মাকতাবাহ আল রিসালাহ) পৃ. ২৬

২৩. মাওলানা ওয়াহিদ উদ্দিন খান, 'Aqliat-e-Islam, (দিল্লী মাকতাবাহ আল রিসালাহ); পৃ. ৪-৫

২৪. রজেনথাল, *Islam in the Modern National State* (ক্যামব্রীজ, ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫), পৃ. ২৪৭

২৫. এ. এ. মওদূদী, 'তাফহিমুল কুরআন, (লাহোর: ইদারা তারজুমানুল কুরআন, ১৯৭৩), ভলিউম-১, পৃ. ৩৩

২৬. মরিয়ম জামিলাহ, *'Islam in Theory and Practice'* (লাহোর, মোহাম্মদ ইউসুফ খান), পৃ. ৩৩৪

২৭. ইরান সম্পর্কে সার্বিকভাবে জানার জন্য দেখুন, Nikkie Keddie, Roots of Revolution : An Interpretive History of Modern Iran' (নিউ হ্যাভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১)

২৮. ইমাম খোমেনী, *'Islam and Revolution....*, পৃ. ১৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৩. Nikki R. Keddie, *'Iranian Revolution and Islamic Republic'* যুক্তরাষ্ট্র, উইড্রো উইলসন সেন্টার, ১৯৮২), পৃ. ১৩

৩৪. খোমেনী, *'Islam and Revolution...* পৃ. ৩২৭

লেখক পরিচিতি

আবদুল রশিদ মতিন
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তার উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থসমূহ-

- INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
- ISLAM AND REVOLUTION : Contribution of Syed Maududi
- FRONTIERS AND MECHANICS OF ISLAMIC ECONOMICS
  (co-editor with R. I. Molia, S. Gusau and A. A. Gwandu)
- NATURE AND METHODOLOGY OF ISLAMIC ECONOMICS
  (co-editor with M. O. K. Bajulaiye-Shasi)
- ISLAM IN AFRICA : Proceedings of the Islam in Africa Conference
  (co-editor with Nura Alkali, Adamu Adamu, Awwal Yaduda and Haruna Salihi)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট